Kiron Sta
9.3.78
/

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান

(A TEXT BOOK ON ABNORMAL PSYCHOLOGY)

অরুণ ঘোষ ঃ

এম-এ (শিক্ষা ও দর্শন) ঃ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত । বি-এড্ (বিশ্বভারতী)

অধ্যাপক ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ ঃ কলিকাতা - ১৯

পরিবেশক

এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্স ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

এ-জি পাব্লিকেশানস্
১৬বি, ফার্ন রোড, কলি-১৯'র
পক্ষে মলি ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ জুলাই—১৯৬৮

দাম : ৯৲ টাকা

পিয়ারলেস প্রেস,
২০এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি-১২
থেকে রোহিণীকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

পুরোভাষ

বর্তমান বইখানি বাংলাভাষায় এ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি বা অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যগ্রন্থ। তবে এটিকে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের একটি সম্পূর্ণ বই বলে বর্ণনা করা ভুল হবে। কেননা মানব আচরণের অস্বাভাবিকতা বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার দিক দিয়ে সীমাহীন এবং তার পূর্ণবিবরণ এই বইটির স্বল্প পরিসরে অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয়।

সাধারণ জিজ্ঞাসু এবং পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনের দিকে প্রধানত দৃষ্টি রেখেই বর্তমান সংস্করণটি পরিকল্পিত হয়েছে। অস্বাভাবিকতার সমগ্র সাগরটি মথিত করে তার সম্পূর্ণ তথ্যভাণ্ডটি পরিবেশন করতে হলে আর একটি সম-অবয়বের সংস্করণের সংযোজন আবশ্যক। ভবিষ্যতে সে ইচ্ছা পূর্ণ করার পরিকল্পনা রইল।

১৬-এ ফার্ন রোড,
কলিকাতা-১৯, জুলাই, ১৯৬৮

অরুণ ঘোষ

অধ্যাপক অরুণ ঘোষ প্রণীত

বি-টি'র আরও কয়েকটি বই

বি-টি'র প্রথম পত্র ॥

শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ॥

বি-টির দ্বিতীয় পত্র ॥

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ॥

বি-টির বিশেষ পত্র ॥

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ॥

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান ॥

বি-টির তৃতীয় পত্র ॥

সাধারণপদ্ধতি, বিদ্যালয় সংগঠন

ও স্বাস্থ্যশিক্ষা (যন্ত্রস্থ)

সূচীপত্র

এক

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology)

আধুনিক ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়। কথাটা মনোবিজ্ঞান হলেও মন বস্তুটির বিজ্ঞানভিত্তিক কোন বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় বলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তির আচরণকেই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করেছেন। মানব আচরণের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এর সীমাহীন বৈচিত্র্য। দেশ জাতি কাল ভেদে মানব আচরণ যে কত বিভিন্ন রূপ নিতে পারে তার কোন পরিসীমা নেই। অতএব বলা বাহুল্য মনোবিজ্ঞানের কর্ম পরিধি ও গবেষণার বিস্তৃতি এক প্রকার সীমাহীন বললেই চলে।

অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃতি

সাধারণভাবে মানব আচরণকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে থাকি—স্বাভাবিক আচরণ ও অস্বাভাবিক আচরণ। লৌকিক ব্যাখ্যায় 'সাধারণ' মানুষ যে সব আচরণ করে থাকে সেগুলি হল স্বাভাবিক (normal) আচরণ। আর যে সব আচরণ মানুষের আচরণ থেকে বেশ দর্শনীয় ভাবে পৃথক সেগুলি হল 'অস্বাভাবিক' (abnormal) আচরণ। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে অস্বাভাবিক আচরণের কোন সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি এখানে দেওয়া যাচ্ছেনা। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্বাভাবিক আচরণের একটি মান বা মাপকাঠি ঠিক করে নিয়ে থাকি এবং সেই মান বা মাপকাঠির সংগে তুলনা করে যে আচরণগুলিকে পৃথক বা অন্যরকম মনে করি সেগুলিকেই আমরা অস্বাভাবিক আচরণ নাম দিয়ে থাকি। অতএব অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান হল সেই মনোবিজ্ঞান যা ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে ও তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

অস্বাভাবিক আচরণের কোন নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া নানা কারণে একপ্রকার অসম্ভব বললেই চলে। প্রথমত, স্বাভাবিক আচরণের কোন পরিসংখ্যানমূলক মান পাওয়া যায় না। এমন কোন সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মাপকাঠি নেই

যার সাহায্যে আমরা কোন আচরণকে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক বলে বর্ণনা করতে পারি। দ্বিতীয়ত, কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে যে আচরণটিকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হবে সেই আচরণটিই আবার অন্য একটি পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হবে। এখানে আচরণটির স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা আচরণটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে না নির্ভর করছে পরিস্থিতির উপর। যেমন গান গাওয়াটা বা জোরে হাসাটা অস্বাভাবিক আচরণ নয়। কিন্তু যদি কেউ কোন গাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে বা শোক সভায় হঠাৎ গান গেয়ে বা জোরে হেসে উঠে তাহলে সেটি অস্বাভাবিক আচরণ বলে বিবেচিত হবে। তৃতীয়ত, আমরা যেগুলিকে স্বাভাবিক আচরণ বলে থাকি সেগুলি প্রকৃতি বা মাত্রার দিক দিয়ে মধ্যধর্মী। এই কারণে অস্বাভাবিক আচরণ মাত্রেই হয় খুব ভাল আচরণ নয় খুব খারাপ আচরণকেই বুঝিয়ে থাকে। অতিরিক্ত আক্রমণধর্মী বা অতিরিক্ত যৌনপ্রবণ হওয়া যেমন অস্বাভাবিক আচরণ, তেমনি অতিরিক্ত বশ্যতামনোভাবসম্পন্ন বা একেবারে যৌন-অনুভূতিহীন হওয়াও তেমনি অস্বাভাবিক আচরণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। চতুর্থত, বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার মানও বিভিন্ন। এই মানের পার্থক্যের কারণ নানা প্রকার হতে পারে। তার মধ্যে বংশধারামূলক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবই প্রধানত উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এমন অনেক আচরণ আছে যেগুলি ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর না হলেও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। সেগুলিকেও আমরা অনেক সময় অস্বাভাবিক আচরণ বলে বর্ণনা করে থাকি। কিন্তু নিছক প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে এই আচরণগুলি অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে নাও পড়তে পারে। কোন সমাজের রীতি নীতি মেনে না চললে সামাজিক সংগঠনের ক্ষতি হয় বলে এ ধরনের আচরণকে আমরা অস্বাভাবিক আচরণ বলে বর্ণনা করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের আচরণ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর নাও হতে পারে এবং তার ফলে তার ক্ষেত্রে সেটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণই বলা চলে। যেমন আত্মীয় বিয়োগ ঘটলে শোক পালন করাটা সব সমাজেই রীতির অন্তর্গত। আর কেউ যদি তা না করে তবে তার আচরণ অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ ধরনের আচরণ করে তার ক্ষেত্রে এই আচরণটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সংগতও হতে পারে। আচরণের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা নির্ণয়ে সামাজিক মাপকাঠির এই ব্যাপক প্রয়োগের জন্য প্রকৃত অস্বাভাবিকতার সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে।

অস্বাভাবিক আচরণের সংজ্ঞাদানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অস্বাভাবিক আচরণ বলতে প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধরনের আচরণকে বোঝায় সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে অস্বাভাবিক আচরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা এই ধরনের কয়েকটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের আলোচনা করব।

১। শারীরিক বা দেহজ দৃষ্টিকোণ
(Organic or Physiogenic Point of View)

শারীরিক বা দেহজ মতবাদের ব্যাখ্যায় অস্বাভাবিক আচরণ শারীরিক ব্যাধি, দৈহিক আঘাত বা কোন স্নায়ুগত বা গ্রন্থিগত বা অঙ্গগত অসুস্থতা থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে সিফিলিস রোগের আক্রমণ ঘটলে একরকম অস্বাভাবিক মনোবিকারের সৃষ্টি হতে পারে। সে সময় ব্যক্তির স্বাভাবিক আচরণধারা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। এই ব্যাধিটির নাম প্যারেসিস (Paresis)। দ্বিতীয়ত, অধিক বয়স হলে ব্যক্তির মধ্যে শারীরিক ও মানসিক অবনতি দেখা দেয় এবং তখন ব্যক্তির আচরণ নানাদিক দিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই অবস্থার নাম সিনাইল ডিমেনসিয়া (Senile dementia)। চিকিৎসকেরা মনে করেন যে অতিরিক্ত বয়সে স্নায়ুমণ্ডলীতে মস্তিষ্কের সংগঠনে কার্যকারিতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক আচরণ ধারা সম্পন্ন করা ব্যক্তির পক্ষে আর সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, গ্রন্থিগত অসুস্থতার জন্য একধরনের নিষ্ক্রিয় বিষণ্নতা (Involution melancholia) ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। বর্ষীয়সী মহিলারা রজোবন্ধের সময় প্রায়ই এই অস্বাভাবিক মনোবিকারে ভুগে থাকেন। চতুর্থত, মস্তিকের আঘাত বা শল্যচিকিৎসার সময় ব্যক্তির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিস্মৃতি (amnesia) দেখা দিতে পারে।

২। আচরণগত বা মনোজ দৃষ্টিকোণ
(Functional or Psychogenic Point of View)

যাঁরা আচরণগত বা মনোজাত মতবাদের সমর্থক তাঁদের ব্যাখ্যায় অস্বাভাবিক আচরণ ব্যক্তির আচরণগত বা মনোগত সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। এই সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য নানা কারণ থেকে দেখা দিয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে বলা চলে যে অতীতের অস্বাভাবিক এবং আঘাতাত্মক

অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তির মানসিক, প্রক্ষোভমূলক এবং সামাজিক সংগঠনে যে পরিবর্তন বা বিকৃতি দেখা দেয় তার জন্যই ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধান করতে পারে না। ফলে তার মধ্যে নানা অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ফোবিয়া, হিষ্টিরিয়া, বহুসত্তাসম্পন্নতা প্রভৃতি ব্যাধির উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন ভীতিকর পরিস্থিতির সঙ্গে তীব্রমাত্রায় অনুবর্তন ঘটলে ব্যক্তির মধ্যে একটি গভীর ভীতিমূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়ে যায়। একে ফোবিয়া (Phobia) বলে। যেমন, কোনও ব্যক্তির বন্ধ ঘরে ঢুকলে ভয় করে। কারও বা রক্ত দেখলে সাংঘাতিক ভয় হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ সব ব্যক্তির অতীত জীবনে কোনও সময় বন্ধ ঘর বা রক্ত দেখার সঙ্গে একটি তীব্র ভয়ের অভিজ্ঞতা জড়িয়ে ছিল এবং তার ফলে যখনই তারা সে বন্ধ ঘর বা রক্তের সংস্পর্শে আসে তখনই তাদের সেই অতীতের ভীতিকর মনোভাব জেগে ওঠে। হিষ্টিরিয়াও এই ধরনের মনোজাত ব্যাধি। শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করলে বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সে সন্তোষজনকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারবে কিংবা বর্তমানের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পারবে এই ধরনের একটা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অস্বাভাবিক আচরণ করে। বহুসত্তাসম্পন্নতাও একটি মানসিক অসুস্থতা থেকে জাত অস্বাভাবিক অবস্থা। একাধিক মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক শক্তির সুষ্ঠু সমন্বয়ন থেকে স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তির মধ্যে এই বিভিন্ন ও বহুমুখী শক্তিগুলির সুসমন্বয়ন ঘটে না সে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বহুধাবিভক্ত হয়ে ওঠে।

৩। মনঃসমীক্ষণমূলক বা ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ
(Psycho-analytic or Freudian Point of View)

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে অস্বাভাবিকতার একটি নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অবশ্য উপরে বর্ণিত আচরণগত বা মনোজাত মতবাদেরই পর্যায়েতেই পড়ে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা এতই নতুন ও পৃথক যে এটিকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা বলে বর্ণনা করা উচিত।

ফ্রয়েডের মতে মানবমনের মধ্যে ইদম্ (Id) ও অধিসত্তা (Super-ego) নামে যে দুটি মানসিক শক্তি বাস করে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যখন অতি তীব্র হয়ে ওঠে তখনই ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। ফ্রয়েড মানবমনের মৌলিক শক্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা, অহম্ (Ego), ইদম্

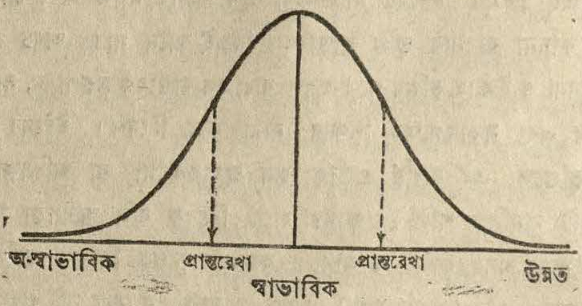
(Id) এবং অধিসত্তা (Super-ego)। বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তির যে সত্তাটি যোগাযোগ বজায় রেখে চলে সেটি হল অহম্। সচেতন মনের ইচ্ছা, অনুভূতি এবং চিন্তার প্রতীক হল এই অহম্। মনের অচেতন অংশের নাম ইদম্। শারীরিক, প্রবৃত্তিগত, স্বার্থপর কামনা, আবেগ এবং অসামাজিক বাসনার প্রতিমূর্তি এই ইদম্। ইদমের নীতি হল সুখভোগের নীতি এবং সে কেবল মাত্র তার কামনা বাসনার তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই জানে না। অথচ এই সব কামনা বাসনা ও ইচ্ছার তৃপ্তির পথে প্রবল বাধা হল বাস্তবের অনুশাসন, সামাজিক বিধিনিষেধ এবং সভ্যজগতের শিক্ষার নানাপ্রকার নির্দেশ। ইদমের কামনা বাসনার তৃপ্তিতে এই বাধার প্রতীক হল সুপার-ইগো বা অধিসত্তা নামে আর একটি মানসিক শক্তি। আমরা যাকে বিবেক বলি অধিসত্তা অনেকটা তাই। ইদমের অসমাজোচিত ও অনুচিত কামনার তৃপ্তির বিরুদ্ধে অধিসত্তা সব সময়েই অহম্‌কে সাবধান করে যায়। ফলে অহম্‌কে সব সময় দুটি প্রবল চাপের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয়। এক, ইদমের কামনাতৃপ্তির চাপ, আর দুই, অধিসত্তার নীতিমূলক নির্দেশের চাপ। এর পরও অহমকে আর একটি তৃতীয় চাপ সহ্য করতে হয়। সেটি হল বাস্তব জগতে বহুবিধ অনুশাসন ও বিধিনিষেধের চাপ। ফলে মনের মধ্যে সর্বদাই বিভিন্নমুখী শক্তির প্রবল সংঘর্ষ চলেছে। এই অধিসত্তা আর ইদমের সংঘর্ষ যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন অহমের পক্ষে তাদের মধ্যে সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং তখনই ব্যক্তি তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে এবং নানাপ্রকার অস্বাভাবিক আচরণসম্পন্ন করে। অনেক সময় ইদম্ এবং অধিসত্তার মধ্যেও প্রবল সংঘর্ষ দেখা দেয়। অধিসত্তার মধ্যে এমন কতকগুলি বহু প্রাচীন এবং অচেতনে নিহিত আচরণপ্রথা আছে যা নিয়ে অহমের সঙ্গে তার প্রায়ই বিবাদ দেখা দেয়। এই বিবাদ যখন উৎকট হয়ে ওঠে তখনই ব্যক্তি তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে।

৪। পরিসংখ্যানমূলক দৃষ্টিকোণ (Statistical Point of View)

আবার পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার সীমারেখা নির্ণয় করা যেতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধির বণ্টনকে চিত্রের আকারে নিয়ে গেলে পরের পাতার ছবিটি পাওয়া যায়। এতে দেখা যাচ্ছে যে সমগ্র জনসংখ্যার মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ চিত্রটির মধ্যবর্তী অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে। এদেরই পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে স্বাভাবিক মানুষ বলা হয়। আর বাকী এক-তৃতীয়াংশের

অর্ধেক পড়েছে বামসীমান্তে, এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ ডানসীমান্তে। এই দুই দলই অস্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে পড়ে।

এই ধরনের বন্টনকে 'স্বাভাবিক বন্টন' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে যে ওজন, উচ্চতা এমন কি বুদ্ধি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক বন্টনের ধারণাটি



[পরিসংখ্যানের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আচরণের বন্টন]

বেশ নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী। কিন্তু ব্যক্তিসত্তার জটিল বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে নানা গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় এবং এই স্বাভাবিক বন্টনের ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যহয় না। সেইজন্য তত্ত্বের দিক দিয়ে অস্বাভাবিকতার নির্ণয়ে পরিসংখ্যানমূলক ব্যাখ্যাটি সমর্থনযোগ্য হলেও বাস্তবে সব সময়ে এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য হয় না।

৫। কৃষ্টিমূলক দৃষ্টিকোণ (Cultural Point of View)

প্রত্যেক মানুষই বিশেষ একটি সামাজিক কৃষ্টিমূলক পরিবেশে বাস করে। এই সামাজিক কৃষ্টিমূলক পরিবেশের দিক দিয়ে কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক বলে বর্ণনা করার প্রথাটিও প্রচলিত আছে। যে কোনও সমাজেই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত আচরণের মান আছে। এই বিভিন্ন মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলাটা ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য। এই আচরণের মানগুলি থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজ সহ্য করলেও, কোন অতিরিক্ত-মাত্রার ব্যতিক্রম সমাজ সহ্য করতে রাজী নয় এবং যে ব্যক্তি তা করে, তাকে সাধারণত অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ বলে ধরে নেওয়া হয়। অতীতের ইতিহাস খুললে দেখা যাবে যে পৃথিবীর সব দেশেই সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি

যে না মেনে চলেছে তাকেই সমাজ অস্বাভাবিক মানুষ বলে দলছাড়া করে দিয়েছে।

এই সামাজিক বা কৃষ্টিমূলক দিক দিয়ে স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার নির্ণয়ের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি থাকা সম্ভব। তার দুটি বড় কারণ আছে। প্রথমত, আজকের বিশ্বে প্রত্যেক সমাজেই প্রতিনিয়ত কৃষ্টিমূলক ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটে চলেছে। সেজন্য যে প্রথা বা মনোভাব একটি সমাজে অস্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়, অপর সমাজে সেটিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলেই মনে করা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এক শতাব্দী আগে বা পূর্বপুরুষদের সমাজে যে আচরণটিকে অস্বাভাবিক বলে মনে করা হত, আজকের সমাজে সেটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নির্দোষ বলে গৃহীত হতে পারে। প্রত্যেক সমাজেই এই দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তবে কোনও সমাজে এই পরিবর্তন ঘটছে মন্থর গতিতে, আবার কোথাও ঘটছে বিদ্যুৎগতিতে।

অতএব সামাজিক কৃষ্টিমূলক দিক দিয়ে স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতার কোন স্থায়ী মান নির্ণয়ন কোনও বর্তমান সমাজেই সম্ভবপর নয়।

স্বাভাবিকতার মাপকাঠি (Criteria of Normality)

অস্বাভাবিক আচরণের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদের কারণ যে খুবই স্বাভাবিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান জগতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিমূলক মানের এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে যে ব্যক্তির মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক সংগঠনের উপর প্রতিনিয়ত গভীর চাপ পড়ছে এবং তার ফলে আচরণের প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকতার গণ্ডী পার হয়ে যায়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে বর্তমান জগতে প্রত্যেক মানুষকেই এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দিন কাটাতে হচ্ছে যে যেগুলিকে আমরা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে এতদিন অভিহিত করে এসেছি সে ধরনের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সঙ্গতিবিধান করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। অতএব অস্বাভাবিক আচরণের সংজ্ঞা সব কাল ও দেশের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত হতে পারে না। তবে আমরা স্বাভাবিক আচরণ নির্ণয়ের কোন্ মাপকাঠি ধরব? কোন্ ধরনের আচরণকে আমরা স্বাভাবিক আচরণ বলে বর্ণনা করব? সব দিক বিচার করে সুস্থ ও স্বাভাবিক আচরণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—

১। ব্যক্তির মধ্যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বোধ থাকবে। নিজেকে সে দল পরিত্যক্ত বলে মনে করবে না এবং কোনরূপ হীনমন্যতাতেও ভুগবে না।

২। ব্যক্তি নিজেকে যথাযথ পরিমাপ করতে সক্ষম হবে। তার দুর্বলতা ও অক্ষমতাগুলিকে সে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে।

৩। তার ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্যগুলিবাস্তবধর্মী হবে। অবাস্তব লক্ষ্য বা চাহিদার পোষণ করে সে নিজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে না।

৪। সে বাস্তবের সঙ্গে কার্যকরী সংযোগ বজায় রাখতে সমর্থ হবে। কোনও মানসিক ব্যর্থতা বা দ্বন্দ্বের জন্য বাস্তব থেকে সে যেন নিজেকে অপসারিত করে না রাখে।

৫। ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সমন্বয়ন ঘটবে এবং তার মধ্যে সুসমঞ্জসতা থাকবে।

৬। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সামর্থ্য থাকবে।

৭। প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ পরিমিত ও সুসঙ্গত হবে।

৮। ব্যক্তির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকবে।

৯। দল বা সমাজের চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা থাকবে এবং সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণে নিজের ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে পারবে।

১০। তার যৌন কামনা পর্যাপ্ত হবে, অতিরিক্ত হবে না, আবার অত্যল্পও হবে না। সেই সঙ্গে তার সমাজ অনুমোদিত পন্থায় যৌনতৃপ্তি লাভের সামর্থ্য থাকবে।

স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তার প্রধান লক্ষণ হবে সুষ্ঠু আভ্যন্তরীণ ও বাহিক সঙ্গতিবিধান। আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিবিধান বলতে বোঝায় যে ব্যক্তির নিজের লক্ষ্য ও চাহিদার সঙ্গে তার সামর্থ্যের সুসামঞ্জস্য বজায় থাকবে। অর্থাৎ তার চাহিদা তার সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে যাবে না। তেমনই বাহিক সঙ্গতিবিধান বলতে বোঝাবে যে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পেরেছে। সে তার সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে এবং সমাজের দাবী এবং তার ব্যক্তিগত দাবীর মধ্যে সুসমন্বয়ন আনতে পেরেছে। এ ছাড়াও সমাজে সম্মানজনকভাবে বাস করার উপযোগী বৃত্তিশিক্ষা তাকে আহরণ করতে হবে। অপরকে সে ভালবাসার সুযোগ পাবে এবং অপরের ভালবাসাও সে পাবে। সে যেন নিজেকে অপরের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বলে মনে না করে।

স্বাভাবিকতার একটা উল্লেখযোগ্য উপাদান হল যে ব্যক্তি তার প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে এবং তার যথাযথ বিকাশের পথে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেইসঙ্গে আবার সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তার যেন কিছুটা অবদান থাকে।

দুই

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও কর্মপরিধি

(Nature and Scope of Abnormal Psychology)

সামাজিক মানের দিক দিয়েই হোক, আর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার মানের দিক দিয়ে হোক, মানব আচরণের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার বিভাজনটি সব সমাজেই যে গৃহীত হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে এও মেনে নেওয়া হয়েছে যে অস্বাভাবিক আচরণ সমাজে সুষ্ঠু জীবনযাপনের বিশেষভাবে পরিপন্থী। অতএব অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃতি ও কারণ নির্ণয় এবং তার যথাযথ চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ও একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শাস্ত্রের যে প্রয়োজন একথাও সর্বজনস্বীকৃত সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রাচীনকালে অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ থেকে সুরু করে এমন কি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ধারণা পোষণ করতেন এবং যে সব ব্যক্তিরা এই ধরনের আচরণ করত তাদের যথাযথ চিকিৎসা দূরের কথা, সামাজিক জীবনেও তাদের প্রতি সুবিচার করা হত না। তার ফলে ঐ সব ভাগ্যহত ব্যক্তিদের যেমন দুঃখদুর্দশার সীমা থাকত না তেমনই তাদের প্রভাবে সমাজজীবনও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হত। পরবর্তীকালে অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে যখন মানুষ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করল তখন থেকে অস্বাভাবিক আচরণের বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান ও চিকিৎসা করার জন্য সব দেশেই প্রচেষ্টা দেখা দিল। এই প্রচেষ্টা থেকেই কালক্রমে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়।

প্রথম যুগে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে কোনরূপ অস্তিত্ব ছিল না। এমন কি বহুদিনই অস্বাভাবিক আচরণের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানকে মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য করা হত না। সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যারই একটি অঙ্গরূপে অস্বাভাবিক ব্যক্তিদের চিকিৎসা চালান হত। কিন্তু শীঘ্রই বহু চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানী বুঝলেন যে অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টির জন্য ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতা অনেকখানি দায়ী। উনবিংশ শতাব্দী থেকে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানকে ধীরে ধীরে একটি স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। প্যারিসের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চারকো (Charcot) প্রমাণ করেন যে হিষ্টিরিয়া

মনের ব্যাধি। তার পর দেখা দিলেন ক্রুয়ার এবং পরে তাঁর সহকর্মীরূপে প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী-চিকিৎসক ফ্রয়েড। এঁরা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে অধিকাংশ অস্বাভাবিক আচরণের মূলে আছে মানসিক বিকৃতি এবং ঐ অস্বাভাবিক আচরণ দূর করতে হলে সর্বাগ্রে মানসিক বিকৃতির চিকিৎসা করতে হবে। ফ্রয়েড ব্যক্তির মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতার চিকিৎসা করে তাদের অস্বাভাবিকতা দূর করে তাঁর তত্ত্বটি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এই সময় থেকেই পূর্ণাঙ্গ অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের জন্ম হল বলা চলে।

তার পরে বহু প্রতিভাবান মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও গবেষকদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের অঙ্গ পরিপুষ্ট হতে থাকে। নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য স্তূপীকৃত হয় এবং বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা ও মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়। আজ অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের অবদানে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানটি ফুলেফলে পরিপূর্ণ মহীরুহের মত পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে।

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান বলতে বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের সেই বিশেষ শাখাকে বোঝায় যার কাজ হল অস্বাভাবিক আচরণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা, তার কারণ নির্ণয় করা এবং সব শেষে তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষেধক ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধক ব্যবস্থাবলী আবিষ্কার করাও অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের কাজের অন্তর্গত হবে। কিভাবে মানসিক বিকৃতি এড়ান যায় তার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান দিয়ে থাকে। অতি সাম্প্রতিককালে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়ার জন্য অবশ্য মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নামে একটি নতুন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। মনোবিকৃতি যাতে না দেখা দেয়, বা দেখা দিলেও যাতে তা গুরুতর আকৃতি ধারণ না করে, সে সম্বন্ধে সুনির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একযোগে কাজ করে থাকে।

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্র

সাধারণ মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হল অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান। প্রকৃতির দিক দিয়ে দুয়ে কোনও পার্থক্য নেই। বরং অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানকে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষধর্মী ও অতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত রূপ বলেই বর্ণনা করা উচিত। মানব মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, প্রক্ষোভ, প্রবৃত্তি, চাহিদা,

বৃদ্ধিপ্রক্রিয়া প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সব মৌলিক তত্ত্ব সাধারণ মনোবিজ্ঞানে পাওয়া যায় সেগুলিকে ভিত্তি করে চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীরা অস্বাভাবিক আচরণ-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং সেই সব পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারাই আধুনিক অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের কলেবর গঠিত হয়েছে। সাধারণ মনোবিজ্ঞান যে সব মানসিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রকৃতি, বিকাশ ও পরিণতি বর্ণনা করে থাকে সেগুলিরই বিকৃত রূপ, বিপথ-গামিতা ও অবনতি অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার বিষয়বস্তু। এ দিক দিয়ে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের তুলনায় অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি একান্তই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

তবে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যত অধিকসংখ্যায় মানসিক বিকৃতির ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করা যাবে এবং যত নতুন নতুন তথ্য ও উদাহরণ হাতে এসে পৌঁছবে তত দ্রুত ও নির্ভুলভাবে মনোবিকারের অদ্ভুত রাজ্যের রহস্যভেদ করা সম্ভব হয়ে উঠবে। এইজন্য ক্ষেত্র-পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, গবেষণা প্রভৃতি অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের প্রধান ও অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি বিভিন্ন প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণের পর্যবেক্ষণেই প্রধানত সীমাবদ্ধ। যে সব আচরণ স্বাভাবিক আচরণ থেকে বৈষম্য-সম্পন্ন সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ কি এবং সেগুলি স্বাভাবিক আচরণের মান থেকে কতটা ভ্রষ্ট তা নির্ণয় করাই অস্বাভাবিক আচরণের প্রথম কাজ।

মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis)

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের দ্বিতীয় কাজ হল সেই সব বিভিন্ন প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণের কারণ নির্ণয় করা। এর জন্য অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানকে প্রথমে ব্যক্তির জন্ম থেকে পরিণত জীবন পর্যন্ত শরীরতত্ত্বমূলক, মানসিক, প্রক্ষোভ-মূলক প্রভৃতি বহুমুখী ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াগুলি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এই বৃদ্ধিপ্রক্রিয়াগুলির অস্বাভাবিকতা ও বিকৃতি থেকেই অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব এগুলির বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণ অস্বাভাবিক আচরণের কর্মপরিধির অন্তর্গত। এইসঙ্গে মানসিক সংগঠনের স্বরূপ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যবেক্ষণও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার কোনরূপ ত্রুটি থেকেই মানসিক সংগঠনের মধ্যে বিকৃতি দেখা

দেয় এবং তাই থেকেই বিভিন্ন অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানব মনের সংগঠন এবং তার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন শক্তি সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ নামক মনোবিজ্ঞানের নতুন শাখাটি থেকে। ফ্রয়েডের গবেষণা থেকে মানব মনের মৌলিক শক্তিগুলি সম্পর্কে পাওয়া নানা তথ্য অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানকে মনোবিকারের কারণ নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করেছে। বিশেষ করে ফ্রয়েডের অচেতন মনের পরিকল্পনাটি অস্বাভাবিক আচরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচুর নতুন তথ্য উপস্থাপিত করেছে। তাছাড়া ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) পদ্ধতিটি অসুস্থ মনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব উদ্ঘাটনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যদিও সকল মনশ্চিকিৎসকই অস্বাভাবিকতার চিকিৎসায় ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতির যে ব্যবহার করেন তা নয়, কিন্তু ফ্রয়েডীয় মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি যে মানসিক বিকৃতির চিকিৎসায় আধুনিক পদ্ধতিতত্ত্বের পথপ্রদর্শক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এর পরের স্তরে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের কাজ হল যে কারণের জন্য ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতা বা মানসিক ব্যাধি দেখা দিয়েছে তা দূর করা। অর্থাৎ এক কথায় অস্বাভাবিকতার চিকিৎসা করা। নানা গবেষণা ও পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ব্যাধির বিভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে।

মনঃসমীক্ষণ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ শাস্ত্রের সঙ্গে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

শরীরতত্ত্ব (Physiology)

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শরীরতত্ত্বের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। দেহযন্ত্রের নানা রকম বিকৃতি থেকে ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। মস্তিষ্কের সংগঠন, গ্রন্থির ক্রিয়া ইত্যাদির অস্বাভাবিকতা মানসিক বিকৃতির সৃষ্টি করে থাকে। সেইজন্য অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণা শরীরতত্ত্বমূলক বিভিন্ন তথ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

জননতত্ত্ব (Genetics)

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে যে মাতৃকোষ ও পিতৃকোষ নামে যে দুটি কোষের সম্মেলনে শিশু জন্মে থাকে সেই কোষ দুটির অভ্যন্তরে যে জিনগুলি থাকে সেই জিনের অস্বাভাবিকতা বা বিকৃতি থেকে নানারকম মানসিক

বিকৃতি দেখা দেয়। সেইজন্য বর্তমানে জননতত্ত্বের গবেষণা অস্বাভাবিক মনোবিকারের গবেষণার একটি বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্নায়ুতত্ত্ব (Neurology)

মানসিক অস্বাভাবিকতার সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের বিকৃতি বা ত্রুটি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গুরুমস্তিষ্ক বা লঘুমস্তিষ্ক ঘটিত কোনরূপ ত্রুটির জন্য ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আজকাল স্নায়ুতন্ত্রের পর শল্যচিকিৎসা সম্পন্ন করার নতুন একটি বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। তার নাম স্নায়ুশল্য-বিজ্ঞান (Neurosurgery)। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মানসিক বিকৃতির চিকিৎসায় মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার একটি কার্যকরী পদ্ধতিরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology)

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক দিকরূপে চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞানকে বর্ণনা করা যায় এই মনোবিজ্ঞানের কাজ হল মানসিক অস্বাভাবিকতার চিকিৎসা করা। রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নানারূপ অভীক্ষার প্রয়োগ, চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন, সুপরিচালনা-দান, মনোবিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কার্যাবলী এই মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

মনশ্চিকিৎসা (Psychiatry)

এই শাস্ত্রটিও অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের আর একটি প্রয়োগমূলক রূপ। এর প্রধান কাজ হল মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করা, প্রতিষেধক ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া এবং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Mental Hygiene)

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্ররূপে গড়ে উঠেছে অতি সাম্প্রতিককালে। এর প্রধান কাজ হল সব রকম মানসিক অসুস্থতার প্রতিষেধক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা এবং যাতে মানসিক ব্যাধির কার্যকরী চিকিৎসা হয় তার আয়োজন করা।

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি
(Scope of Abnormal Psychology)

যেদিন থেকে অস্বাভাবিক আচরণের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা সুরু হয়েছে সেদিন থেকেই এর গুরুত্ব ও ব্যাপকতার যথার্থ চিত্রটি বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়েছে। ভারতের মত দেশে কোনরূপ নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান রাখা হয় না বলে এখানে সত্যকারের মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যার

কোনও আভাষ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য উন্নত দেশগুলির পরিসংখ্যান বিচার করলে আমরা মানসিক ব্যাধির ব্যাপকতা ও গুরুত্বের প্রকৃত রূপটি জানতে পারব। আমেরিকায় প্রতিদিন প্রায় ৭০০ ব্যক্তি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য হয় কোন মানসিক চিকিৎসাগারে ভর্তি হচ্ছে কিংবা কোনও মনশ্চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছে। সেখানে প্রায় ৮০০,০০০ হাসপাতালের শয্যা মানসিক রোগীরা অধিকার করে আছে। এছাড়াও ১২০,০০ রোগী মানসিক রোগের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা গ্রহণ করছে এবং আরও ১০০,০০০র বেশী ব্যক্তি রোগ-মুক্তির পর সযত্ন পর্যবেক্ষণে দিন কাটাচ্ছে। এ ত গেল প্রকৃত চিত্রটির একটি দিক মাত্র। এছাড়াও ৯৫০,০০০ সংখ্যক হচ্ছে অতিরিক্ত মদ্যাসক্ত ব্যক্তি, ৪,০০০,০০০ সংখ্যক হচ্ছে যারা নানারকম মাদক পানীয়ে অভ্যস্ত এবং ৫০,০০০ সংখ্যক হল বিভিন্ন নেশাকর বস্তুতে আসক্ত ব্যক্তি। এর উপরেও আছে বেশ মোটামুটি সংখ্যায় মনোবিকৃতিসম্পন্ন ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি। প্রতি বৎসর আমেরিকায় কিশোর অপরাধের বিচারালয়ে ২৬৫,০০০ ছেলেমেয়েকে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। বিবাহবিচ্ছেদ একধরনের সঙ্গতিবিধানের অভাবের দৃষ্টান্ত। আমেরিকায় তার সংখ্যা হল প্রতি চারটি বিবাহে একটি। আত্মহত্যাও হল ব্যক্তিসত্তামূলক সমস্যার চরম পরিণতি। তার সংখ্যা হল বছরে ১৭,০০০। উপরের পরিসংখ্যানগুলি থেকে আমেরিকার অস্বাভাবিক আচরণের ভয়াবহ ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। আমেরিকায় মানসিক অস্বাভাবিকতার যে চিত্রটি পাওয়া গেল ভারত বা অন্য কোনও বড় দেশের ক্ষেত্রেও তার স্বরূপ খুব একটা তফাৎ হবে না। কারণ সাধারণত মানুষ যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকে সেই পরিবেশের প্রকৃতির দিক দিয়া ভারত, আমেরিকা বা রাশিয়ার মধ্যে খুব একটা বৈষম্য থাকে না। বরং দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক কলহ, গৃহবিবাদ, সমষ্টিগত বসতি-পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে ভারতের সামাজিক পরিবেশ অনেক বেশী সমস্যাসঙ্কুল। সেই কারণে ভারতে মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা আমেরিকা প্রভৃতির তুলনায় অনেক বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। যদি বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিসংখ্যান নেওয়া হত তাহলে ভারতে মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা যে যথার্থই ভয়াবহ রূপে দেখা যেত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন :

1. **Discuss the nature and scope of Abnormal Psychology.**

তিন

অস্বাভাবিক আচরণের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Abnormal Behaviours)

অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রথম সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেন এমিল ক্রেপেলিন (Emile Kraepelin)। প্রাচীন মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে বিভিন্ন মানসিক ব্যাধিগুলির লক্ষণের মধ্যে বেশ মিল আছে এবং এই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তিনি মানসিক ব্যাধিগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তাঁর এই শ্রেণীবিভাগের উপর নির্ভর করেই মানসিক ব্যাধির আধুনিক শ্রেণীবিভাগ তৈরী হয়েছে।

মানসিক ব্যাধির বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রথম শ্রেণীবিন্যাস হয় ১৯১৭ সালে, করেন আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এ্যাসোসিয়েসন (American Psychiatric Association)। ১৯৩৪ সালে এই শ্রেণীবিভাগের সংস্কারসাধন করা হয়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগেও প্রচুর ত্রুটি দেখা যায় এবং অনেক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পর ১৯৫২ সালে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এ্যাসোসিয়েসন মানসিক ব্যাধির একটি সুসংহত তালিকা প্রকাশ করেন। এটি বর্তমানে APA শ্রেণীবিভাগ নামে পরিচিত।

এই শ্রেণীবিভাগে মানসিক ব্যাধিগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম যে সব মানসিক ব্যাধি প্রধানত মস্তিষ্কের কোনরূপ ক্ষতি থেকে হয়েছে অর্থাৎ যেগুলি দেহজাত (Organogenic)। দ্বিতীয়, যে সব মানসিক ব্যাধি প্রধানত সঙ্গতিবিধানের অসুবিধা থেকে দেখা দিয়েছে এবং যেখানে মস্তিষ্কের ক্ষতি পাওয়া যায় না বা থাকলেও তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, অর্থাৎ যেগুলি মনোজাত (Psychogenic)। এই দুধরনের অস্বাভাবিকতাকে আবার বিভিন্ন উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অস্বাভাবিক আচরণের এই APA-শ্রেণীবিভাগটি বর্তমানে অধিকাংশ চিকিৎসাগারে গৃহীত হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগের প্রধান প্রধান বিভাগ ও অনুবিভাগগুলি নীচে দেওয়া হল।

(ক) মনোজাত অস্বাভাবিকতা
Psychogenic Abnormalities)

যে সব অস্বাভাবিক অবস্থার মূলে কোনও বাহ্যিক শারীরিক কারণ বা মস্তিষ্কগত কোন অসুস্থতা পাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। এগুলিকে আবার কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

১। অস্থায়ী পরিস্থিতিজাত ব্যক্তিসত্তার অসঙ্গতি
(Transient Situational Personality Disorders)

অতিশয় বা অস্বাভাবিক মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এমন পরিবেশে পড়ে অনেক ব্যক্তির মধ্যে সাময়িকভাবে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন, জ্বলন্ত বাড়ীর মধ্যে আটকে পড়ে, কিংবা নিজের স্বামী বা ছেলেকে চোখের সামনে নিহত হতে দেখে, আধুনিক যুগের বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখে, কিংবা এই ধরনের মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে এমন কোনও অভিজ্ঞতা লাভ করে ব্যক্তির মধ্যে প্রচণ্ড ভয় বা দুঃখ জাগতে পারে এবং তা থেকে তার মধ্যে নানা অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। সাধারণ মানসিক ব্যাধি (Neurosis) বা মনোবিকারের (Psychosis) সঙ্গে এই ধরনের অস্বাভাবিকতার পার্থক্য হল যে এই ধরনের মানসিক অসুস্থতা কোন বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে এবং ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তার ফলে এ ধরনের অস্বাভাবিকতা খুব শীঘ্রই সেরে উঠতে পারে।

২। মানসিক ব্যাধি (Psychoneurotic Disorders)

প্রকৃত মানসিক ব্যাধি বা নিউরসিস অনেক প্রকারের হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে সব শ্রেণীর মধ্যেই যে বিশেষ লক্ষণটি দেখা যায় সেটি হল দুশ্চিন্তা। এই দুশ্চিন্তা কখনও সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় মনকে পীড়িত করতে পারে, আবার কখনও অচেতন মনে নিহিত থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে আবার কখনও অবদমন প্রভৃতি প্রতিরোধ কৌশলের পেছনে আত্মগোপন করতে পারে। এই মানসিক অসুস্থতার জন্য ব্যক্তির মানসিক শান্তি যেমন একদিকে ব্যাহত হতে পারে, তেমনই আবার তার কর্মক্ষমতাকেও ক্ষুণ্ণ করে তোলে। কিন্তু মোটামুটিভাবে তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠন একেবারে ভেঙে পড়ে না।

৩। শারীর-মানসিক স্বয়ংক্রিয় ও দেহযন্ত্রমূলক অসুস্থতা (Psychophysiologic Autonomic and Visceral Disorders)

প্রক্ষোভবাহী স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী (Autonomic Nervous System) এবং দেহাভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গগত কতকগুলি অসুস্থতা এই পর্যায়ে পড়ে। যেমন, প্রচণ্ড মাথাব্যথা, অতিরিক্ত উত্তেজনা, চর্মরোগ, অন্ত্রগত ক্ষত প্রভৃতি অসুস্থতাগুলি সাধারণত স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী ও দেহযন্ত্রগত কারণ থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে বলে এগুলিকে স্বয়ংক্রিয় ও দেহাভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গগত অসুস্থতা বলা হয়। এগুলির উৎস দেহ ও মন উভয়েতেই নিহিত থাকে বলে এগুলিকে শারীর-মানসিক অসুস্থতা বলে বর্ণনা করা হয়।

৪। আচরণগত মনোবিকার (Functionl Psychoses)

এই পর্যায়ে পড়ে অতি গুরুতর প্রকৃতির মনোবিকার এবং ব্যক্তিসত্তামূলক অসঙ্গতির ক্ষেত্রগুলি। এই শ্রেণীর রোগীরা প্রায়ই বাস্তবের সঙ্গে স্বাভাবিক সংযোগ হারিয়ে ফেলে। এই পর্যায়ভুক্ত রোগগুলির নাম হল সিজোফ্রেনিয়া, প্যারানোইয়া প্রভৃতি। সাধারণভাবে এই সব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

৫। ব্যক্তিসত্তামূলক অসঙ্গতি (Personality Disorders)

সাধারণত ব্যক্তির বিকাশমূলক প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি বা দোষ থেকে ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশে কোন স্থায়ী অপূর্ণতা বা অসঙ্গতি থেকে যায়। হঠাৎ কোন বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির চাপে এই ধরনের ব্যক্তিসত্তামূলক অসঙ্গতি ঘটে না। সাধারণ মনোব্যাধির মত এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনও দুশ্চিন্তা বা মানসিক সংকট অনুভব করে না। একটি স্থায়ী প্রকৃতির অসামাজিক বা অবাঞ্ছিত আচরণধারাই এই ধরনের অসুস্থতার প্রধান লক্ষণ। ব্যক্তিসত্তামূলক অসঙ্গতি নানা অবাঞ্ছিত আচরণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে, যেমন দুর্বল ব্যক্তিসত্তা, সমাজবিরোধী আচরণ, যৌনমূলক অস্বাভাবিকতা, অতিরিক্ত মদ্যপান, নেশায় আসক্তি প্রভৃতি আচরণবৈষম্য এই পর্যায়ের অসুস্থতার শ্রেণীভুক্ত।

খ। মস্তিষ্কগত ব্যাধিজাত অসুস্থতা
(Abnormalities due to Brain Damage)

এই পর্যায়ে পড়ে সেই সব মানসিক অস্বাভাবিকতা যেগুলির কারণরূপে মস্তিষ্কের কোনও বিশেষ ব্যাধি বা ত্রুটিকে স্পষ্টতই নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়। এই শ্রেণীভুক্ত অসুস্থতাগুলিকে আবার দুশ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১। গুরুতর মস্তিষ্কের অসুস্থতা (Acute Brain Disorders)

তীব্র জ্বর, ভিটামিনের অভাব, অতিরিক্ত থাইরয়েডের রস নিঃসরণ কিংবা অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত মত্ততা প্রভৃতি কারণ থেকে মস্তিষ্কের টিস্থ বা তন্তুগুলির কর্মক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং তা থেকে নানা প্রকার অস্বাভাবিক আচরণ ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে। মস্তিষ্কের ব্যাধি বা কর্মক্ষমতার ক্ষুণ্ণতার জন্য অলীকবীক্ষণ, বিভ্রান্তি বা অন্যান্য অস্বাভাবিক আচরণ ব্যক্তি সম্পন্ন করে থাকে। এই লক্ষণগুলি সাময়িক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং রোগী যথাসময়ে সেরে ওঠে।

২। স্থায়ীপ্রকৃতির মস্তিষ্কের অসুস্থতা
(Chronic Brain Disorders)

মস্তিষ্কের টিউমার, মাথায় আঘাত বা অন্যান্য গুরুতর প্রকৃতির মস্তিষ্কের ব্যাধি থেকে স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কের তন্তুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে এবং তা থেকে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি, স্মৃতি, সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়া, প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে উঠতে পারে।

গ। মানসিক ব্যাহতি বা ক্ষীণবুদ্ধিতা
(Mental Retardation or Mental Deficiency)

মানসিক ব্যাহতি বা সাধারণ মানের চেয়ে কম বুদ্ধি থাকাটাও APA-শ্রেণীবিভাগে অস্বাভাবিকতার একটি বিশেষ শ্রেণীরূপে গণ্য করা হয়েছে। ক্ষীণবুদ্ধিতা মস্তিষ্কের কোন সুনির্দিষ্ট ত্রুটি ছাড়াই হতে পারে এবং কোনও রূপ মস্তিষ্কের রোগ থেকেও জন্মাতে পারে। ক্ষীণবুদ্ধিতা নানা মাত্রার হতে পারে, অল্প, মাঝামাঝি এবং খুব বেশী। সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে কম বুদ্ধি থাকলে ব্যক্তির পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয় না এবং তার ফলে তার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়।

অবশ্য অস্বাভাবিক আচরণের যে শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হল সেটি যে সব সময়ে

সর্বত্র প্রযোজ্য হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ব্যক্তির আচরণ অসংখ্য প্রকারের হতে পারে এবং অস্বাভাবিক আচরণও যে বিশেষ একটি ধারা বা ছক বেঁধে এগোবে তার কোনও অর্থ নেই। বিশেষ কোন রোগীকে নিউরটিক বলা হবে, না, সাইকোটিক বলা হবে, ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ পর্যায়ে ফেলা হবে, না, সিজোফ্রেনিয়ার শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে—এ সব নিয়ে মনশ্চিকিৎসকদের মধ্যে প্রায়ই মতবিরোধ দেখা দেয়। অনেক সময় আবার একই রোগীর মধ্যে উভয় প্রকার রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে রোগীর আচরণের নিখুঁত বিশ্লেষণ করে তাকে বিশেষ একটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ

1. What is mental disorder ? Describe the different types of mental disorders.

চার

ইতিহাসে অস্বাভাবিক আচরণ

সব দেশের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যেই অস্বাভাবিক আচরণের নানা উল্লেখযোগ্য কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। তখনকার দিনে এই ধরনের আচরণের সুচিকিৎসার কথা দূরে থাক সেগুলির যথার্থ ব্যাখ্যাও মানুষের জানা ছিল না। ফলে নানা কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা, অন্ধ বিশ্বাস ও বিকৃত ব্যাখ্যা এই ধরনের আচরণগুলি ঘিরে সাধারণের মনে গড়ে উঠেছিল। বহু ক্ষেত্রেই এগুলিকে শয়তান বা অপদেবতার প্রভাব থেকে সঞ্জাত ঘটনা বলে মনে করা হত এবং অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, দেবতার তুষ্টির আয়োজন এবং অমানুষিক চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা এগুলি দূর করার চেষ্টা করা হত।

প্রাচীন যুগ

বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে অনেক বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণের কাহিনী পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতকে ইহুদীদের প্রসিদ্ধ রাজা সল (Saul) ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ নামক মনোবিকারে প্রায়ই ভুগতেন। যখন তাঁর মধ্যে ম্যানিক বা উত্তেজনার পর্যায় দেখা দিত তখন তিনি উন্মুক্তস্থানে তাঁর পোষাক সম্পূর্ণ খুলে ফেলতেন। আর একবার উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি তাঁর পুত্র জোনাথনকে হত্যা করতে গেছলেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্যের রাজা ক্যাম্‌বিসেস (Cambyses) অতিশয় মদ্যাসক্ত ছিলেন। যখন তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন তখন তিনি এত ভীষণভাবে রেগে উঠতেন যে তখন তিনি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্তের মত আচরণ করতেন। আবেসিনীয়াবাসীরা পারস্যবাসীদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করায় তিনি এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের কোনও ব্যবস্থা না করেই তিনি আবেসিনীয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। ফিরে এসে দেখেন যে তাঁর প্রজারা অ্যাপিসের উৎসবে আনন্দ করছে। তিনি ধরে নিলেন যে তাঁর ব্যর্থতায় তারা আনন্দ করছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সকলকে হত্যা করতে আদেশ দিলেন। আর একবার মদ্যপান করা সত্ত্বেও যে তাঁর লক্ষভ্রষ্ট হয় না এটা

প্রমাণ করার জন্য তিনি তাঁর এক বন্ধুপুত্রকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়েন এবং ছেলেটিকে হত্যা করেন।

গ্রীক পুরাণেও অনেক মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন প্রসিদ্ধ বীর হারকিউলিস মাঝে মাঝে দেহকম্পন ব্যাধিতে আক্রান্ত হতেন এবং সে সময় তাঁর মনে আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগত। ইউরিপিডিসের বর্ণনায় পাওয়া যে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় হারকিউলিসের চোখ ক্রমাগত ঘুরত, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোত, জ্ঞান অস্পষ্ট হয়ে উঠত, তিনি ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠতেন এবং যাকে তাকে আক্রমণ করতেন। তারপরেই তিনি পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতেন এবং সবশেষে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়তেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে তাঁর ইতিপূর্বে কি হয়েছিল কিছুই তাঁর মনে থাকত না। এই ধরনের আক্রমণের সময়েই তিনি তাঁর নিজের দুই ছেলেকে, দুই ভাইয়ের ছেলে, তাঁর সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং তাঁর শিক্ষককে হত্যা করেন। অ্যাজাক্স নামে আর একজন গ্রীক বীর শত্রুসৈন্য আক্রমণ করছেন এই ভেবে একটি ভেড়ার পালকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি এতই অনুতপ্ত হন যে নিজের তরওয়ালের আঘাতে আত্মহত্যা করেন।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস খুললেও অনেক অস্বাভাবিক আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর অনেক চরিত্রও অল্পবিস্তর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ছিল বলে দেখা যায়। রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের প্রত্যাখ্যানে এত বেশী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে বশিষ্ঠের শতপুত্র হত্যার আদেশ দেন। ঋষি দুর্বাসা যখন রেগে যেতেন তখন তিনি এমনই কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে উঠতেন যে যাকে যা মনে আসত তাই অভিশাপ দিতেন। আবার রাগ পড়ে গেলে তিনি স্বাভাবিক কোমলমনা মানুষ হয়ে উঠতেন। রাবণের আচরণের মধ্যেও অস্বাভাবিকতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সামান্য কারণে সীতাকে বন্দী করে রেখে তাঁর বিরাট পরিবারের ধ্বংস টেনে আনেন।

দুর্যোধন এমনিতে যথেষ্ট উদারহৃদয় হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর আচরণ যথেষ্ট অস্বাভাবিক ছিল। বহু লোককে বহু রাজ্য তিনি দান করেছিলেন কিন্তু পাণ্ডবদের তিনি পাঁচটি গ্রাম দিতে অস্বীকার করে আত্মধ্বংসী যুদ্ধ ডেকে আনেন। যুধিষ্ঠির এত প্রশংসিত-চরিত্র হলেও তিনি আত্মসংযমহীন দ্যূতাসক্ত (gambler) ছিলেন। জুয়াখেলার সময় তিনি এমনই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন

যে তাঁর নিজের ভাইদের এমন কি তাঁর স্ত্রীকেও পণরূপে বাজি ধরতে ইতস্তত করেন নি। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অস্বাভাবিকভাবে আত্মসংযমহীন ছিলেন। তাছাড়া ভীমের দুঃশাসনের রক্ত পান, যযাতির অতিযৌনভোগাসক্তির জন্য পুত্রের যৌবন গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনাও অস্বাভাবিক আচরণের পর্যায়ে পড়ে।

মধ্যযুগ

মধ্যযুগে সব দেশের ইতিহাসেই অস্বাভাবিক আচরণের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এর একটা বড় কারণ হল যে এই সময়কার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রচুর ঘনিষ্ঠ বিবরণ আমাদের হাতে এসে পৌছতে পেরেছে। দিগ্‌বিজয়ী তৈমুরলঙ্গ মানুষের মাথার খুলি নিয়ে পিরামিড তৈরী করতে ভালবাসতেন। এই ধরনের তাঁর একটি স্থাপত্যকীর্তিতে নাকি চল্লিশ হাজার মানুষের মাথার খুলি ছিল। ভারতে মুসলিম রাজত্বের সময়ে কয়েকজনের অস্বাভাবিক আচরণ একপ্রকার ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। তুগলগ বংশীয় সুলতান মহম্মদ বিন তুগলগ একজন শিক্ষিত ও প্রতিভাসম্পন্ন সুলতান হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন খেয়াল তাঁর মাথায় চাপত এবং অদ্ভুত আজগুবী সব হুকুম করে বসতেন। একবার তিনি রাতারাতি রাজধানী দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে সরিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন, ভেবেও দেখলেন না যে হাজার হাজার লোকের পক্ষে মালপত্র ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করে অত দূরের নতুন সহরে যাওয়া সম্ভব। তাঁর এই অস্বাভাবিক আচরণের ফলে বহু সহস্র লোকের চরম দুর্দশা ও প্রাণহানি ঘটে।

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগেও বহু অস্বাভাবিক আচরণসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ নামক মানসিক বিকারে ভুগতেন। ম্যানিক বা অতি-উত্তেজনার পর্যায়ে তিনি খুব দ্রুত এক প্রসঙ্গ থেকে আর এক প্রসঙ্গে চলে যেতেন এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতেন। খাবার সময় এত তাড়াতাড়ি খেতেন যে ভোজসভার অন্যান্য ব্যক্তিদের হয় খাদ্যবস্তু গোগ্রাসে গিলতে হত, নয় অভুক্ত অবস্থায় খাবার ফেলে টেবিল ছাড়তে হত। তাছাড়া এই সময়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপর নীচে দৌড়তেন, এত দ্রুত ঘোড়া ছোটাতেন যে ঘোড়া দম বন্ধ হয়ে মারা যেত, অশ্লীল ভাষায় ব্যবহার করতেন ইত্যাদি।

ফরাসী দার্শনিক জিন জাকুইস রুশো জীবনের শেষের দিকে প্যারানোইয়া নামে মনোবিকারের রুগী হয়ে ওঠেন। তিনি সর্বদা গুপ্ত শত্রুদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন এবং মনে করতেন যে প্রুসিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাজা ও পুরোহিতরা তাঁর বিরুদ্ধে একটি সাংঘাতিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই শত্রুরা তাঁর সমস্ত আভ্যন্তরীণ গোলমাল সৃষ্টি করার জন্য দায়ী, কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় কৌশল হল যে তারা উপকার ও প্রশংসার দ্বারা তাঁকে অভিভূত করে ফেলতে চায়। এমন কি তারা তরিতরকারীওয়ালাদের পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে যাতে তারা সস্তায় ভাল তরিতরকারী তাঁকে বিক্রী করে। রুশোর মতে এর উদ্দেশ্য হল এর দ্বারা তারা রুশোর হীনতা এবং তাদের উদারতা প্রমাণিত করতে চায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রুশো তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়েকেই অনাথ ছেলেমেয়েদের হাসপাতালে ফেলে এসেছিলেন। একবার রুশো লণ্ডনে পৌঁছে এমন ভয় পেয়ে গেছলেন যে হোটেলে মালপত্র ফেলে পালিয়ে গেছলেন। লণ্ডন থেকে ফ্রান্সে ফেরার পর তাঁর বিশ্বাস হল যে তাঁর শত্রুরা আরও গুরুতরভাবে তাঁর নির্যাতন সুরু করেছে। কফিওয়ালা, বাড়ীওয়ালা, নাপিত এমন কি জুতো-পালিশওয়ালারা পর্যন্ত তাঁর-সঙ্গে শত্রুতা সুরু করল। শেষে একান্ত বিব্রত হয়ে তিনি তাঁকে জেলে রাখার জন্য আবেদন জানালেন, কিন্তু তাও তাঁর শত্রুদের ষড়যন্ত্রে সফল হল না। হতাশ হয়ে তখন তিনি ভগবানের কাছে চিঠি লিখতে সুরু করলেন এবং যাতে চিঠিগুলি ভগবানের কাছে পৌঁছয় সেজন্য প্যারিসের নটরদাম গির্জার বেদীতে সেগুলি রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু বেদীর রেলিঙ বন্ধ দেখে তাঁর সন্দেহ হল যে ভগবানও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু করেছেন।

বহু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিত্রকর এবং সঙ্গীতকারের মধ্যেও অস্বাভাবিক আচরণের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। সঙ্গীতকার মোজার্ট যখন রিকুইম নামক সঙ্গীতটি প্রস্তুত করেছিলেন তখন তাঁর বিভ্রান্তি হত যে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। বিটোভেন অত্যন্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও প্রায়ই তাঁর বাসস্থান বদলাতেন এবং তার ফলে তাঁকে অনেক সময় একসঙ্গে তিনটি বা চারটি বাসস্থানের ভাড়া দিতে হত।

আর একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার রবার্ট সুম্যান শেষ বয়সে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি নাকি অদৃশ্য কণ্ঠের সঙ্গীত ও স্বর শুনতে পেতেন এবং সেই অলৌকিক সঙ্গীত ও স্বর থেকেই তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচনা করতেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর ভ্যান গগ এপিলেপসিতে

ভুগতেন এবং একবার রোগ থেকে সেরে ওঠার পর তিনি তাঁর একটি কান কেটে একজন বারবণিতার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দার্শনিক সোপেনহয়ার, লেখক সোপিন এবং দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল সাময়িকভাবে মানসিক অবসন্নতায় ভুগতেন। রাবেলা, টাসো, স্যামুয়েল বাটলার, বার্নস এবং বায়রন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা অতিরিক্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। কোলেরিজ ও এডগার অ্যালেন পো অহিফেনে আসক্ত ছিলেন। কোলেরিজের লেখা 'কুবলা খান' এবং পো'র লেখা "ফল অফ দি হাউস অফ আশার" পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এ দুটি রচনাই অহিফেনের প্রভাবগ্রস্ত অবস্থায় লেখা।

আরও সাম্প্রতিককালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কুখ্যাত অধিনায়কদের অনেকেই অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে পরিগণিত হতে পারে। তার মধ্যে রণোন্মত্ত হিটলারের নাম সবচেয়ে আগে উল্লেখযোগ্য। মুসোলিনী, গোয়েরিং, গোয়েবল্‌স্‌ প্রভৃতি রণনায়কদের অনেক আচরণই অস্বাভাবিক আচরণের পর্যায়ে পড়ে।

সাহিত্যে অস্বাভাবিকতার উদাহরণ

বাস্তব জীবনে মানুষের অস্বাভাবিক আচরণ চিরকালই সাহিত্যিক কবি নাট্যকারদের কৌতূহল জাগিয়ে এসেছে। তার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সব দেশের উপন্যাস ও নাট্যরচনায় অস্বাভাবিক আচরণ একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে এসেছে। রামায়ণের 'রাবণ' ও মহাভারতের 'দুর্যোধন' উভয় চরিত্রকেই অস্বাভাবিক ও মানসিক বিকারগ্রস্ত রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। সেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকে বহু অস্বাভাবিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ওথেলোর মধ্যে বিকারগ্রস্ত দুর্দমনীয় হিংসার একটি অপরূপ চিত্র দেখা যায়। লেডি ম্যাকবেথও একটি অস্বাভাবিক চরিত্র। রাজা ডানকানের হত্যার পর তাঁর মধ্যে যে তীব্র অপরাধবোধ দেখা দেয় তা তাঁকে বিকারগ্রস্ত করে তোলে। তাঁর সেই অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় তাঁর সুপ্ত অবস্থায় চলা, কথা বলা, হাত ধোওয়া ইত্যাদি আচরণের মধ্যে দিয়ে। হাত ধোওয়াটা প্রতীকমূলক আচরণ। লেডি ম্যাকবেথ যেন হাত ধোওয়ার মধ্যে দিয়ে মনের অপরাধবোধকে ধুয়ে ফেলতে চান। কিন্তু অনেকবার হাত ধোওয়া সত্ত্বেও তাঁর সেই অপরাধবোধ গেল না, লেডি ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, "এখনও হাতে রক্তের গন্ধ। আরবের সমস্ত সুগন্ধি দিয়েও এই ছোট হাতটা থেকে গন্ধ দূর করা যাবে না। হায় হায় হায়।"

কার্ভান্টের সৃষ্ট ডন কুইক্সটের চরিত্রটিও একটি অস্বাভাবিক চরিত্র। বইতে

বীরত্বের নানা কাহিনী পড়ে ডন কুইক্সটের মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে নিজেকে মনে করে একজন 'নাইট', আর বেরিয়ে পড়ে দুঃখী ও অত্যাচারিতদের উৎপীড়ন ও অবিচার থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে। সে পথে উইণ্ডমিলগুলিকে দৈত্য মনে করে আক্রমণ করে, সরাইখানাকে মনে করে দুর্গ, আর দু'দল ভেড়ার পালকে যুদ্ধরত দু'দল সৈন্য মনে করে দুর্বল দলের উদ্ধারে এগিয়ে যায়। এ সবই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় হালুসিনেসান (hallucinatlon) বা অলীকবীক্ষণ নামে একপ্রকার অস্বাভাবিক আচরণ।

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের সোফোক্লিসের লেখা ইডিপাস রেকস এবং ইলেক্ট্রা নামে নাটক দুটিতে মানবমনের ইন্‌সেষ্ট বা নিষিদ্ধরতির আকাঙ্ক্ষাকে প্রথম চিত্রিত করেন। ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যায় ইডিপাস ও ইলেক্ট্রা কথা দুটি সোফোক্লিসের নাটক থেকেই গ্রহণ করেন। সোফোক্লিস তাঁর ওরেস্টেস নাটকে তীব্র অপরাধ ও গ্লানিবোধ থেকে যে মানুষের মধ্যে প্রলাপ-ভাষণ ও অলীকবীক্ষণের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর অস্বাভাবিক আচরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যে কোন দৈনিক পত্রিকা খুললেই আত্মহত্যা, খুন, ডাকাতি, যৌন অপরাধ প্রভৃতি নানা প্রকারের অস্বাভাবিক আচরণের খবর আমাদের চোখে পড়ে। গত শতাব্দীর তুলনায় মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণের দৃষ্টান্ত যে অনেক বেড়ে গেছে এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কারণ নেই। আমরা যে আগের চেয়ে অস্বাভাবিক আচরণের কাহিনী বেশী করে ভালবাসতে স্থরু করেছি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল আধুনিক কালের রোমহর্ষক গল্প উপন্যাসের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। সাহিত্য, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই ধরনের উত্তেজক কাহিনীর পরিবেশন বর্তমান যুগের একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজবিরোধী অপরাধ, যৌনমূলক বিকার, আত্মহত্যা, স্নায়বিক বিপর্যয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল আগের চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেছে। বর্তমান কালের সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কৃষ্টিগত সংগঠনের মধ্যে যে অস্বাভাবিক বিবর্তন দেখা দিয়েছে সেই বিবর্তনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সহজ ও সুষ্ঠু সংগতিবিধানের অক্ষমতাই এই মনোভাবের জন্য দায়ী। আজকের মানুষকে ভাল করে বুঝতে হলে এবং তার আচরণের অন্তর্নিহিত অর্থটি জানতে হলে অস্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

এই জন্যই আধুনিক জীবন-যাত্রার অনেক ঘটনারই প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে হলে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা অপরিহার্য।

ছোটখাট অস্বাভাবিক আচরণের দৃষ্টান্ত আমাদের আশে-পাশে নিয়ত প্রচুর দেখা যায়। এগুলিকে আমরা সত্যকারের অস্বাভাবিক আচরণ বলে ধরি না এবং যারা এ ধরনের আচরণ করেন তাদেরও আমরা অস্বাভাবিক ব্যক্তি বলে মনে করি না। কেননা এইসব আচরণ মোটামুটিভাবে আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে। এইসব আচরণকে আমরা সাধারণত খামখেয়ালী আচরণ বলেই অভিহিত করে থাকি এবং যারা এ ধরনের আচরণ করেন তাঁদের আমরা খেয়ালী, একসেনট্রিক ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকি।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বের লোকেদের মধ্যে থেকে অল্পমাত্রায় অস্বাভাবিক আচরণের অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, গুরুতর দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সব সময়েই মাথাব্যথার অভিযোগ করেন, অথচ ডাক্তার হাজার পরীক্ষা করেও তার মধ্যে কোনও শারীরিক অসুস্থতা খুঁজে পান না। অতিরিক্তমাত্রায় আত্মসচেতন যুবক যখনই অপরের মনোযোগের পাত্র হয়ে ওঠে তখনই সে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রটি কিছুতেই পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না এবং কলেজের কাজে সাফল্য দেখাতে পারে না। মধ্যবয়স্ক প্রেমিক নারী-শিকারের মধ্যে দিয়ে নিজের মানসিক তৃপ্তি খুঁজে পান। এ ধরনের আচরণগুলি স্বল্পমাত্রায় অস্বাভাবিক এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষ মনোযোগ না দিলে এগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু এর চেয়ে গুরুতর প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণগুলি স্পষ্টতই উল্লেখযোগ্য এবং আত্মীয়বন্ধু প্রতিবেশীদের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। যেমন, নতুন চাকরিতে প্রায়ই তাকে বাইরে যেতে হবে বলে এবং তার ফলে মা'কে ছেড়ে থাকতে হবে বলে একজন ২৫ বৎসরের অবিবাহিত যুবক চাকরিতে পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করলো।

প্রশ্ন :

1. Give a historical account of abnormal behaviour in different periods.

পাঁচ

অস্বাভাবিক আচরণ সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্বাস ও ধারণা

অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং কেনই বা ব্যক্তি এই ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে থাকে তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই নানা অন্ধ বিশ্বাস ও ভুল ধারণা জনসাধারণের মনে সৃষ্টি হয়ে এসেছে। অতীতে মানব আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এতই অনগ্রসর ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও ভুল ধারণা সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই ধরনের প্রাচীন কতকগুলি প্রচলিত ভুল ধারণার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

অপদেবতা বা শয়তানের প্রভাব

প্রাচীনকালে সব দেশেই অপদেবতা বা শয়তানের প্রভাব থেকেই অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি হত বলে মনে করা হত। অবশ্য যতদিন না মানব অভিজ্ঞতার রাজ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল ততদিন সমস্ত দুর্বোধ্য ঘটনার পেছনে অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপ আছে বলে সাধারণ মানুষ মনে করত। ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হত যে অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদের উপর অপদেবতা বা শয়তানের কুদৃষ্টি পড়েছে এবং সেই জন্যই তারা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক আচরণ করছে। এই বিশ্বাসের ফলে মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা ত ছিলই না, তাদের উপর অমানুষিক অবহেলা, নির্যাতন ও অত্যাচার চলত। অনেক দেশে এই হতভাগ্য ব্যক্তিদের কারাগারে বন্দী করে রাখা হত, কোনও কোনও দেশে মনোবিকারগ্রস্ত নারীদের ডাইনির দ্বারা প্রভাবিত মনে করে পুড়িয়ে মারা হত। প্রায় সব দেশেই অস্বাভাবিকতা বা মনোবিকারের চিকিৎসার জন্য অলৌকিক শক্তির সাহায্য নেওয়া হত। ঝাড়, ফুঁক, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, অপদেবতার তুষ্টিসাধন ইত্যাদি পন্থায় মনোবিকারের চিকিৎসা করা হত।

চীনদেশীয়, মিশরীয়, হিব্রু এবং গ্রীক সাহিত্যে মনোবিকারের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সর্বত্রই ব্যক্তির উপর অপদেবতা বা শয়তান ভর করার জন্যই ব্যক্তি ঐ ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সময় সময় সৎ দেবতা বা ঈশ্বরও ব্যক্তির উপর ভর করে থাকেন এবং সেক্ষেত্রে ব্যক্তি ধর্মসম্বন্ধীয় বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কথাবার্তা বলে থাকে। এই সব ব্যক্তিদের অবশ্য বিকারগ্রস্ত বলে মনে করা হত না। জনসাধারণ বরং তাদের দেবতার বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি বলে মনে করত এবং ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা ও প্রশংসার চোখে তাদের দেখত।

কিন্তু অধিকাংশ মনোবিকারের ক্ষেত্রে অপদেবতা বা কোন দুষ্ট অপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবেই ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে বলে মনে করা হত। সময় সময় কোন দেবতার কোপে বা ঈশ্বরের অভিশাপে ব্যক্তির মধ্যে মনোবিকার সৃষ্টি হত বলে মনে করা হত। মোসেস বাইবেলের একজায়গায় জনসাধারণদের ভয় দেখাচ্ছেন যে 'ঈশ্বর তোমাদের উন্মত্ততার দ্বারা শাস্তি দেবেন।' ঈশ্বর যদি কারও উপর ক্রুদ্ধ হন তাহলে ঈশ্বর তাকে ত্যাগ করবেন এবং সে তখন অপদেবতাদের হাতে গিয়ে পড়বে। সল ঈশ্বরের অবাধ্য হলে ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেন এবং অপদেবতারা তখন তাঁর শরীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। যীশুখৃষ্টের কাহিনীতে দেখা যায় যে তিনি একবার এক ব্যক্তিকে দুষ্ট দেবতার প্রভাব থেকে মুক্ত করেন।

প্রায় খৃষ্টপূর্ব ২৬০০ সালে চীনদেশে মানসিক অসুস্থতায় চিকিৎসায় বিশ্বাস-ভিত্তিক চিকিৎসা, পরিবেশ পরিবর্তন প্রভৃতি পদ্ধতির অনুসরণ করা হত। খৃষ্টপূর্ব ১১৪০ সালে চীনে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ইতিহাস পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সালে ভারতীয় চিকিৎসকদের লেখায় বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির উল্লেখ দেখা যায় এবং মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহৃদয় আচরণ সম্পন্ন করার নির্দেশ পাওয়া যায়।

মিশর ও ব্যাবিলনের খৃষ্টপূর্ব ৫০০ শতাব্দীর পুরোন পুঁথিপত্রে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আচরণগুলিকে অপদেবতার প্রভাবজাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মাথার খুলি কাটা (trephining) এবং পুরোহিত ও ঐন্দ্রজালিকদের তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ তখন চিকিৎসার প্রধান পদ্ধতিরূপে ব্যবহৃত হত। বাইবেলে পাওয়া যায় যে হিব্রুরা মানসিক ব্যাধিকে ঈশ্বরের শাস্তি বলে মনে করত এবং তাঁর ক্ষমা পাওয়ার চেষ্টা করাই চিকিৎসার প্রধান পদ্ধতি বলে বিবেচিত হত।

খৃষ্টপূর্ব ৫০০ শতাব্দীর পূর্বে গ্রীসে পুরোহিত চিকিৎসকরা বিশ্বাস করতেন যে অশরীরী দেবতার প্রভাবেই মানসিক ব্যাধি হয় এবং মন্ত্রপাঠ, বলিদান প্রভৃতির মাধ্যমে দেবতার পরিতৃপ্তিই ছিল চিকিৎসার সর্বপ্রধান পদ্ধতি। প্রসিদ্ধ গ্রীক

দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ পিথাগোরাসই প্রথম মানসিক ব্যাধির স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি মস্তিষ্ককে বুদ্ধির কেন্দ্র বলে বর্ণনা করলেন এবং মস্তিষ্কের অসুস্থতা থেকেই যে মানসিক ব্যাধি জন্মায় তাই জানালেন।

মনোবিকার যখন অমঙ্গলকর অপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব থেকেই সৃষ্ট তখন তার চিকিৎসাও যে আসুরিক প্রকৃতির হবে তাতে কোনও বিস্ময় নেই। প্রাচীন-কালে মনোবিকারের প্রধান চিকিৎসা ছিল অপদেবতার প্রভাব থেকে মুক্তিদানের আয়োজন, তাকে আমরা ভূত তাড়ান বা ভূত বিতাড়ন (exorcism) নাম দিয়ে থাকি। সব দেশেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ঘাড় থেকে ভূত নামাবার নানারকম পন্থা ও প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। তবে সব দেশেই ব্যবহৃত পন্থাগুলির মধ্যেই বেশ কিছুটা মিল আছে। প্রার্থনা, মন্ত্রপাঠ, উচ্চ চীৎকার এবং নানারকম উৎকট স্বাদসম্পন্ন পানীয়ের ব্যবহার প্রভৃতি সবদেশেই প্রচলিত ছিল। গুরুতর আক্রমণের ক্ষেত্রে চাবুকমারা, ঝাঁটা দিয়ে আঘাত করা, না খাইয়ে রাখা এবং আরও কষ্টদায়ক পন্থার সাহায্য নেওয়া হত। এই সব পন্থার পেছনে এই বিশ্বাস ছিল যে দেহের উপর যত বেশী নির্যাতন করা হবে ততই অপদেবতাটি ঐ দেহ ছেড়ে চলে যেতে চাইবে। প্রাচীন কালে সব দেশেই এই সব আসুরিক চিকিৎসা করার জন্য বিশেষজ্ঞ বা বিশেষভাবে পারদর্শী ব্যক্তি থাকত। তারা প্রধানত পুরোহিত গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত হত। আমাদের দেশে ভূত তাড়াবার জন্য ওঝা নামে এক শ্রেণীর বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ডাকা হত। এই ওঝারা চিকিৎসা বিদ্যা ও অলৌকিকশক্তির ব্যবহারে পারদর্শী ছিল।

মনোবিকারের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিকিৎসা পদ্ধতির বিবর্তন

সভ্যতার অগ্রগতি এবং মানব আচরণ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই আসুরিক চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিল। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক গ্রীক চিকিৎসক হিপপোক্রেটস্ (Hippocrates : 460-357 খৃঃ পূঃ) মনোবিকারের প্রসারে দেবতা বা দানবের কোনরূপ হস্তক্ষেপ আছে বলে স্বীকার করলেন না। তিনি বললেন যে কোন দেবতার দ্বারা কখনও মানবদেহ দূষিত হয় বলে আমি মনে করি না। তাঁর পূর্বসূরী পিথাগোরাসের মতের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি জানালেন যে মস্তিষ্কই সমস্ত চিন্তামূলক কাজের কেন্দ্রস্বরূপ এবং সেই মস্তিষ্কের বিকৃতি বা অসুস্থতা থেকেই মানসিক বিকার দেখা দিয়ে থাকে। কেবল তাই নয়, মস্তিষ্কের আঘাত থেকে ইন্দ্রিয়মূলক ও দেহসঞ্চালনের ত্রুটি দেখা দিতে পারে বলেও তিনি মনে করতেন। এমন কি

স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে রোগীর ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেতে পারে এ আভাষও পিথাগোরাস প্রথম দেন।

হিপপোক্রেটেস্ সমস্ত মানসিক ব্যাধিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন ম্যানিয়া, মেলানকলিয়া এবং ফ্রেনিটিস। এই তিন ধরনের ব্যাধিরই তিনি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। হিপপোক্রেটেস্ মানসিক রোগের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন এবং রোগীর ব্যক্তিসত্তাকে ভাল করে বুঝতে হলে তার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করারও নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য রোগীর খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের কথাও বলেছেন। বলাবাহুল্য হিপপোক্রেটেস্ মানসিক রোগের চিকিৎসার প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু সে সময় শরীরতত্ব ও মনোবিজ্ঞান এ দুটি শাস্ত্রই এতই পশ্চাদপদ ছিল যে সত্যকারের কার্যকরী কোন পন্থা তাঁর পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। তবে একথা সত্য যে সে সময়ের প্রচলিত আসুরিক চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে যে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক অগ্রসর ছিল এবং আধুনিক মনশ্চিকিৎসার প্রথম ভিত্তি যে তিনিই স্থাপিত করে গেছেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

হিপপোক্রেটেসের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato : 429-347 খৃঃ পূঃ)। যে সব মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি গুরুতর অপরাধ সম্পন্ন করত, তাঁদের সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখার কথা প্রথম প্লেটোই বলেন। তিনি বলেন যে এই সব ব্যক্তি তাদের কাজের জন্য সত্যই দায়ী নয় এবং সেজন্য অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের মত তাদের শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। উন্মত্ত অবস্থায় কেউ কোনও অপরাধ করলে তার কাছ থেকে কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাকে অন্য শাস্তি থেকে রেহাই দিতে হবে। মনোবিকারগ্রস্ত রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যে সমাজেরই তাও প্লেটো স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। মনোবিকারের রোগীদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব তার আত্মীয়স্বজনদের এবং তারা যদি তাঁর প্রতি অবহেলা করে তাহলে তাদের জরিমানা দিতে হবে। তাঁর মতে আচরণমাত্রেই ব্যক্তির শরীরতত্ত্বমূলক চাহিদা বা স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগাদা থেকে জন্মায়। অতএব প্লেটোর মতে মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জানতে হলে তার প্রকৃত উৎসটা কি তা আগে জানতে হবে। তাছাড়া ব্যক্তির স্বপ্ন এবং দিবাকল্পনা যে তার অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তিরই বিশেষ রূপ এবং যখন চিন্তা বা বিচারবুদ্ধির

মাধ্যমে ঐ বাসনার তৃপ্তি ঘটেনা তখন ব্যক্তি স্বপ্ন ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই গুরুত্বপূর্ণ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বটির অপরিণত সূচনা প্লেটোর লেখায় পাওয়া যায়।

প্লেটোর অনুগামী ও শিষ্য দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (Aristotle : 384-322 খৃঃ পূঃ) লেখাতে মনোবিকারের প্রকৃতি ও চিকিৎসা নিয়ে প্রচুর আলোচনা পাওয়া যায়। ব্যর্থতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপ মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনা থেকে যে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে এই তথ্যের তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন। তবে মানসিক ব্যাধির কারণ রূপে তিনি দৈহিক কারণের উপর বিশেষ জোর দিয়ে গেছেন। তাঁর নানা আলোচনা থেকে দেখা যায় যে তিনি হিপপোক্রেটেসের পিত্তক্রুদ্ধতার তত্ত্বকেই বিশেষ সমর্থন করে গেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে পিত্তের অত্যধিক উষ্ণতা থেকে প্রেমমূলক ইচ্ছা, অতিরিক্ত বাচালতা এমন কি সময় সময় আত্মহত্যার ইচ্ছাও জেগে থাকে। মানসিক ব্যাধির কারণ রূপে দৈহিক ঘটনার উপর এই জোর দেওয়ার ফলে মনশ্চিকিৎসার অগ্রগতি বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়ে উঠেছিল।

হিপপোক্রেটেসের পন্থা অনুসরণ করে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার প্রথা আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রচলিত হল। মানসিক রোগীদের জন্য প্রীতিকর এবং স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে চিকিৎসাগার তৈরী হল। সেখানে নাচগান, উৎসব, উদ্যানভ্রমণ, নৌকাবিহার প্রভৃতি আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে দিয়ে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্বদা প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করা হত। পরবর্তীকালের গ্রীক এবং রোমান চিকিৎসকেরা মানসিক রোগের চিকিৎসায় বহু বিভিন্ন প্রকৃতির চিকিৎসামূলক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতেন। খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ, দেহমর্দন, জলচিকিৎসা, শারীরিক চর্চা, সম্মোহন, শিক্ষাদান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পন্থার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য রক্তক্ষরণ, জোলাপ ব্যবহার, যান্ত্রিক প্রতিরোধ প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল।

হিপপোক্রেটেসের পদ্ধতির অনুসরণ করে পরবর্তী কালে যে সব রোমান চিকিৎসক নাম করেন তার মধ্যে এসক্লেপিয়াডেস (Asclepiades : 124 খৃঃ পূঃ) অন্যতম। মনশ্চিকিৎসার বিবর্তনে এসক্লেপিয়াডেসের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম গুরুতর মানসিক রোগ এবং স্থায়ী মানসিক রোগের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া তিনিই প্রথম অপবীক্ষণ (illusion), অলীকবীক্ষণ (hallucination) এবং ভ্রান্তির (delusion) মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্ণয় করেন। তিনি রসক্ষরণ, যান্ত্রিক প্রতিরোধ, এবং কারাগারে বন্দী করা প্রভৃতি

মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত পন্থাগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর চিকিৎসাগারে মানসিক রোগীদের আবাস ও আনন্দ দেবার জন্য তিনি নানা অভিনব পন্থার উদ্‌ভাবন করেন।

আরেটয়াস (Aretaeus : 100 খৃঃ পূঃ) নামে আর একজন রোমান চিকিৎসক প্রথম আবিষ্কার করেন যে কতকগুলি মানসিক রোগ স্বাভাবিক মানসিক প্রক্রিয়া-গুলির প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সব ব্যক্তি দুর্দম, অস্থিরমনা, উত্তেজনাপ্রবণ এবং সহজেই আনন্দদায়ক কাজের দিকে ঝোঁকে, তাদের মধ্যে ম্যানিক রোগগস্ত হবার বিশেষ প্রবণতা আছে। আর অপরপক্ষে যারা গম্ভীর প্রকৃতিসম্পন্ন তাদের মধ্যে মেলানকলিয়া রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আরেটয়াস আরও আবিষ্কার করেন যে ম্যানিক অবস্থা এবং মেলানকলিয়া অবস্থা প্রকৃতপক্ষে একই রোগের দুটি মনোবিকারমূলক অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি মানসিক রোগের পেছনে ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক অবস্থার উপর বিশেষ জোর দেন এবং রোগীর অতীত ব্যক্তিসত্তার পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথাও বিশেষ করে উল্লেখ করেন।

ইতিপূর্বে গ্রীক ও রোমান চিকিৎসকগণ মানসিক ব্যাধির ব্যাখ্যা ও চিকিৎসায় মানবদেহের সংগঠন ও ক্রিয়াকলাপের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন না। গ্যালেন (Galen : 130 – 200 খৃঃ) নামক রোমান চিকিৎসকই প্রথম মানবদেহের স্নায়ুগুলীর গঠন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করেন এবং মানসিক ব্যাধির ব্যাখ্যায় শারীরিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের উল্লেখ করেন। তিনি মানসিক ব্যাধির দুরকম কারণের কথা বলেন, শারীরিক ও মানসিক। তাঁর উল্লিখিত মানসিক ব্যাধির নানা কারণের মধ্যে নীচের কারণগুলি পাওয়া যায়—মাথায় আঘাত, অতিরিক্ত মদ্যপান, মানসিক আঘাত, ভয়, যৌবনাগম, রজোগত পরিবর্তন, আর্থিক বিপর্যয়, এবং প্রেমে ব্যর্থতা।

২০০ খৃষ্টাব্দে গ্যালেনের মৃত্যুর পর মানসিক চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতি উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। হিপপোক্রেটেস এবং তাঁর অনুগামীদের প্রগতিশীল চিকিৎসাতত্ত্বের স্থান আবার আসুরিক চিকিৎসাপদ্ধতি অধিকার করে নেয় এবং মনশ্চিকিৎসার ইতিহাসে তখন তামস যুগ সুরু হয়েছে বলা চলে।

মানসিক চিকিৎসার বিবর্তন : মধ্যযুগে

মধ্যযুগে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র সবেরই অবনতির যুগ। মানসিক

ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রেও গ্রীকদের প্রগতিশীল ধারণাগুলি মধ্যযুগে একরকম অবলুপ্ত হয়ে গেছল। কেবলমাত্র আরবদেশে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় গ্রীক চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসৃত হত। এই আরবদেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে আভিসেন্নার (Avicenna : 980 – 1037 খৃঃ) নাম বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। আভিসেন্নার চিকিৎসাপদ্ধতির সাফল্যের জন্য তাঁকে সকলে চিকিৎসকদের মধ্যে রাজপুত্র বলে অভিহিত করত। কিন্তু আভিসেন্না ছাড়া সে সময়ের অধিকাংশ চিকিৎসকই মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা প্রাচীন ও গতানুগতিক পন্থাতেই সম্পন্ন করতেন।

গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী লুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রাচীন ও পরিত্যক্ত অন্ধবিশ্বাস ও ত্রুটিপূর্ণ প্রথাগুলি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল তত্ত্বগুলির স্থানে আবার দেখা দিল প্রাচীনকালের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং কিছুটা পরিবর্তিত রূপে সেই আদিমকালের আসুরিক চিকিৎসাপদ্ধতি। সে সময়কার ঈশ্বর ও দেবদেবী সম্বন্ধে ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানসিক ব্যাধির ব্যাখ্যায় নতুন আসুরিক তত্ত্ব গড়ে উঠল। মানুষ মাত্রেই দেবতা ও অসুরের যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নয় এবং এই দু' পক্ষের মধ্যে নিয়ত যুদ্ধ চলেছে মানুষের উপর অধিকার স্থাপনের জন্য। যখন শয়তান বা অসুর ব্যক্তির দেহ অধিকার করে তখনই তার মধ্যে মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মানসিক ব্যাধির এই নতুন তত্ত্বটি প্রাচীনকালের মানবদেহের উপর ভূতপ্রেতের ভর করার পুরানো আসুরিক তত্ত্বটির ঈষৎ উন্নত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

গণ-উন্মত্ততা

মধ্যযুগে অস্বাভাবিক আচরণের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্যযুগের শেষার্ধে একধরনের গণ-উন্মত্ততার কাহিনী শোনা যায়। এই সময় এক অদ্ভুত মনোবিকার বিশেষ এক একটি দল বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করেছিল এবং সেই দলভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যেই সেই মনোবিকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছিল। লক্ষণগুলির বর্ণনা শুনে বোঝা যায় যে হিষ্টিরিয়া রোগের দ্বারাই ঐ ব্যক্তিরা আক্রান্ত হয়েছিল। সাধারণত এই রোগের আক্রমণের সময় দলবদ্ধভাবে নাচ, চীৎকার, উত্তেজিতভাবে লাফালাফি করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইটালিতে দশম শতকে এই ধরনের এক গণ-উন্মত্ততার ক্ষেত্রে দলে দলে লোকেরা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। কেউ কেউ ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আর

মৌমাছির কামড়ের মত দারুণ যন্ত্রণা শরীরে অনুভব করতে লাগল। দলে দলে রাস্তায় বাজারে বেরিয়ে এসে তারা উত্তেজিত অবস্থায় নাচতে সুরু করল, কেউ কেউ তাদের কাপড়জামা ছিঁড়ে ফেলল, কেউ তরওয়াল বার করে খেলা সুরু করল, কেউ চাবুক দিয়ে অপরকে মারতে লাগল, কেই আবার মনে করল যে আকাশে সে উড়ছে, কেউ বা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকল। তারা সকলে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করতে লাগল এবং মত্ত অবস্থায় গান করতে এবং প্রলাপ বকতে সুরু করল।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালে গ্রীকদেবতাদের পূজার সময় যে উদ্দাম নাচের প্রথা প্রচলিত ছিল মধ্যযুগের এই গণ-উন্মত্ততা তারই পরিবর্তিত রূপ। এই উদ্দাম নৃত্য-উৎসব খৃষ্টধর্মের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই উৎসবের বীজ মানুষের কৃষ্টির গভীর অচেতন স্তরে নিহিত ছিল এবং উপযুক্ত সুযোগ পেলেই বাইরে প্রকাশ পেত। সাধারণত গুপ্ত সমিতির ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই এই প্রাচীন প্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু গণ-উন্মত্ততার ক্ষেত্রে এই অচেতনের চাহিদাটি দলগতভাবে বাইরে প্রকাশ লাভ করেছিল।

টারানটুলা নামে একপ্রকারের বিষাক্ত মাকড়সার আক্রমণ থেকেই এই গণউন্মত্ততা সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করা হত। কেউ কেউ নাকি এই মাকড়সা দেখতে পেত, আবার অনেকেই মাকড়সা দেখতে পেত না। কিন্তু সবাই জানত যে তাদের সেই অস্বাভাবিক আচরণের পেছনে আছে 'টারানটুলা'। এই 'টারানটুলা' নাম থেকে ইটালির ঐ গণ-উন্মত্ততার নাম দেওয়া হয়েছিল টারানটিজম্ (Tarantism)

ইটালি থেকে টারানটিজম্ ছড়িয়ে পড়ে জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে। সেখানে এর নাম দেওয়া হয় সেণ্ট ভিটাস ডান্স। এ ছাড়াও গণ-উন্মত্ততার অন্যান্য কাহিনীও শোনা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে একটি জার্মান মঠে একজন সন্ন্যাসিনী অন্যান্য সন্ন্যাসিনীদের কামড়াবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গে তার এই আচরণ অন্যান্য সন্ন্যাসিনীরা অনুকরণ করে এবং দেখতে দেখতে এই উন্মত্ততা জার্মানী, হলাণ্ড, ইটালির মঠে ছড়িয়ে পড়ল।

আর এক ধরনের গণ-উন্মত্ততার কাহিনী শোনা যায়। এর নাম লিসানথ্রপি (Lycanthropy)। এই মানসিক ব্যাধিতে রোগী নিজেকে নেকড়ে বাঘ বলে মনে করে এবং নেকড়ে বাঘের মত আচরণ করতে থাকে। একবার একজন এই ধরনের রোগীকে ধরা হলে সে বলে যে সে প্রকৃতপক্ষে একটি নেকড়ে

বাঘই এবং তার চামড়া যে মসৃণ দেখা যাচ্ছে তার কারণ তার গায়ের লোমগুলো ভিতরের দিকে আছে। তাকে তার এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার জন্য তার হাত-পায়ের আঙুল কেটে ফেলা হয় এবং তাতে তার মৃত্যু হয়, যদিও শেষ পর্যন্ত সে যে একটি নেকড়ে বাঘ এ বিশ্বাস তার অটুট ছিল।

এই গণ-উন্মত্ততা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছিল।

মধ্যযুগেও মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ভার ন্যস্ত ছিল পুরোহিতদের উপর এবং মঠ ও বিহারগুলি রোগীদের চিকিৎসা এবং আটক করে রাখার জায়গারূপে ব্যবহৃত হত। অল্প মাত্রায় মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে প্রার্থনা, পবিত্র জল সিঞ্চন, পবিত্র মলম ব্যবহার, পূত ধ্বংসাবশেষ স্পর্শ, পবিত্রস্থানে ভ্রমণ প্রভৃতি পন্থার আশ্রয় নেওয়া হত। ভূত বিতাড়নের পন্থাও অনেক স্থানে অনুসরণ করা হত। কোনও কোনও বিহারে রোগীর উপর ধীরে ধীরে হাত রাখা হত। কোনও স্থানে কিছুটা চিকিৎসাপদ্ধতিও এই প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। এই ধরনের একটি চিকিৎসায় বলা হচ্ছে যে—যখন শয়তান কোনও ব্যক্তিকে আশ্রয় করে এবং অসুস্থতার দ্বারা তাকে তার ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রিত করে তখন তাকে লুপিন, বিশপসভর্ট, হেনবেন (এ সবগুলিই বিস্বাদময় বা বিষাক্ত গাছ-গাছড়ার নাম) আর রসুন এক করে গুঁড়িয়ে তার সঙ্গে মদ এবং পবিত্র জল মিশিয়ে তাকে পান করতে দাও।

ভূতবিতাড়নের নানা কৌশলের মধ্যে এই সময় একটি পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছিল। ঈশ্বরের স্বর্গ থেকে শয়তানের পতন হয়েছিল তার দম্ভের জন্য। অতএব শয়তানের অধিকৃত ব্যক্তির দেহ থেকে শয়তানকে তাড়াতে হলে তার দম্ভে আঘাত করতে হবে। অর্থাৎ তাকে প্রচণ্ডভাবে অপমানিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে যখন কারও শরীরে শয়তান ভর করেছে বলে মনে করা হত তখন যত রকম অশ্রাব্য ও কুৎসিত গালাগালি কল্পনায় আসে সে সবের প্রয়োগ করা হত সেই শয়তানের উদ্দেশ্যে। শোনা যায় এই পদ্ধতিতে নাকি খুব ভাল ফল হত এবং শয়তান অপমানিত বোধ করে ব্যক্তির দেহ ত্যাগ করে চলে যেত। আমাদের দেশেও ভূত তাড়াবার সময় নানারকম অকথ্য গালাগালির সঙ্গে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঝাঁটা দিয়ে মারার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই চিকিৎসা পদ্ধতিরও উদ্দেশ্য হল ভূত বা অপদেবতাকে রাগিয়ে দিয়ে তাকে চলে যেতে বাধ্য করা।

শয়তান বা অপদেবতার কুপ্রভাব থেকেই যে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে

এই ধারণা মধ্যযুগে ক্রমশ প্রসার লাভ করে। তার ফলে এই সময়ে মানসিক ব্যাধির প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার অগ্রগতি একরকম বন্ধ হয়ে যায়। মানসিক রোগীদেরও দুর্দশা ও লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। সহৃদয়, সহানুভূতি-পূর্ণ ও বিচারভিত্তিক আচরণ থেকে তারা ক্রমশ বঞ্চিত হতে থাকে এবং যতই মানসিক রোগের এই অলৌকিক ব্যাখ্যাটি পরিপুষ্ট হতে থাকে ততই মনোবিকারের রোগীদের নির্যাতন বাড়তে থাকে। সহজ ও অল্পমাত্রার ক্ষেত্র-গুলিতে চাবুকমারা, গরম জলে ডুবিয়ে রাখা, চেন দিয়ে বেঁধে রাখা, প্রভৃতি নির্যাতনমূলক চিকিৎসা পদ্ধতির বহুল ব্যবহার সুরু হয়। কিন্তু গুরুতর ক্ষেত্রগুলিতে রোগীদের উপর অধিকতর নির্মম পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় এবং ফলে তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন বাড়তে থাকে। সর্বত্রই মনে করা হত যে অবমাননা, অত্যাচার ও নির্যাতনের দ্বারা রোগীর শরীরকে এমন বাসের অযোগ্য করে তুলতে হবে যে কোনও আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন অপদেবতাই পালাবার আর পথ পাবে না। এই ধরনের নিষ্ঠুর চিকিৎসাপদ্ধতির ফলে অনেক মানসিক ব্যাধির রোগীরই রোগ সারা দূরে থাকুক তাদের রোগ আরও জটিল ও অনারোগ্য হয়ে উঠতো। অনেকেই এই আসুরিক চিকিৎসা পদ্ধতি সহ্য করতে না পেরে মারাও যেত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ থেকে মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে এই বিকৃত ও ভ্রান্তিকর ধারণা চরমে ওঠে এবং সারা ইউরোপ এবং কোনও কোনও আমেরিকান উপনিবেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শয়তান বা অপদেবতার অধিকৃত ব্যক্তিদের দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হল। প্রথম, যারা ঈশ্বরের দণ্ড পেয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শয়তানের কবলস্থ হয়েছে। আর দ্বিতীয়, যারা স্বেচ্ছায় শয়তানের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরাই শয়তানের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এবং শয়তানের দেওয়া একটি বইতে তাদের রক্ত দিয়ে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করেছে। তার ফলে তারা শয়তানের কাছ থেকে কতকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। এই শক্তির জোরে তারা দুর্ভিক্ষ ও মড়ক সৃষ্টি করতে পারে, ঝড়, বন্যা আনতে পারে, মানুষের মধ্যে যৌন-অক্ষমতা, শারীরিক ব্যাধি বা আঘাত সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যহানি, পশুমৃত্যু প্রভৃতি ঘটাতে পারে। এরা আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে, নিজেরা জন্তুজানোয়ারের রূপ নিতে পারে। এদের দৃষ্টিতে দুধ টকে যায় এবং টাটকা খাদ্য পচে যায়। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী এবং এদের চলিত ভাষায় ডাইনী নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা অর্থাৎ ঈশ্বরের রোষে শয়তানের কবলস্থ হয়েছে বলে যাদের মনে করা হত, তাদের ঠিক সমাজের শত্রু বলে মনে করা হত না এবং তাদের প্রতি জনসাধারণের আচরণও অপেক্ষাকৃত উদার ও কোমল ছিল। শয়তান তাড়াবার যে সব পন্থার বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে সেগুলিরই প্রয়োগ করে তাদের অপদেবতার প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হত।

কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি অর্থাৎ ডাইনীদের সমাজ, ধর্ম ও জনসাধারণের প্রচণ্ড শত্রু বলে মনে করা হত এবং এদের চরম শাস্তি দেওয়াই একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হয়েছিল। ফলে এই সময় মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপর নৃশংস অত্যাচার এবং অমানুষিক নির্যাতন সংঘটিত হত। ডাইনী বলে যাদের সন্দেহ করা হত তাদের উপর যে ধরনের নির্মম নির্যাতন চলত তা সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে। এই নির্যাতনের ব্যবস্থাদানের পেছনে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণই যে ছিল তা নয়, দেশের শিক্ষিত, পণ্ডিত, ধর্মযাজক, জননেতা সকলেই এই বর্বরোচিত প্রথার সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ১৪৮৪ সালের ডিসেম্বরে অষ্টম পোপ ইনোসেন্ট ইউরোপের সমস্ত ধর্মযাজকদের উপর এই নির্দেশ দেন যে তাঁরা যেন যেমন করে হোক ডাইনীদের খুঁজে বার করেন। তাঁর এই নির্দেশের পেছনে ছিল বাইবেলের একটি উদ্ধৃতি—"তোমরা কখনই কোন ডাইনীকে বাঁচতে দেবে না।" যদিও তাঁর এই নির্দেশনায় ডাইনীদের উপর অত্যাচার বা নির্যাতনের কথা বলা ছিল না, তবু তাঁর এ নির্দেশের ফলরূপে সমস্ত ইউরোপে মানব ইতিহাসের একটি করুণতম যুগের দেখা দিয়েছিল। পোপের এই নির্দেশনামাকে ভিত্তি করে ডাইনীদের অনুসন্ধান এবং নির্ণয়করণের বিশদ পদ্ধতি রচিত হল। গায়ের চামড়ার উপর লাল লাল দাগ হল ডাইনীদের লক্ষণ। এগুলিকে বলা হত 'শয়তানের থাবা' এবং শয়তানের সঙ্গে চুক্তির ঐগুলি হল প্রমাণ। ডাইনীদের শাস্তি দেবার আগে তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার প্রথাও এই সময় প্রচলিত হল। তার জন্য যতদূর সম্ভব বর্বরোচিত ও নৃশংস অত্যাচার তাদের উপর করা হত। নির্যাতনের ফলে অনেকেই স্বীকারোক্তি করত এবং তারপর তার শাস্তি দেওয়া হত। সাধারণত ডাইনীদের প্রচলিত শাস্তি ছিল কাঠের পোলে দড়ি দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে মারা। তার আগে যতরকম সম্ভব নৃশংস শারীরিক শাস্তি তাকে দেওয়া হত। কোন কোনও ক্ষেত্রে পোড়াবার আগে ব্যক্তিটিকে ফাঁসি দিয়ে মারা বা মাথা কেটে ফেলা হত। প্রায় ক্ষেত্রেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা

হত। এই প্রথা সমস্ত ইউরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং কত যে নিরীহ মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের ডাইনী মনে করে এইভাবে নির্যাতন করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তার সংখ্যা নেই। একজন ফরাসী বিচারক গর্ব করে বলেন যে ষোল বছরের বিচারক জীবনে তিনি ৮০০ নারীকে ডাইনী বলে পোড়াবার আদেশ দিয়েছেন। জেনেভাতে ১৫১৫ সালে ৫০০ ব্যক্তিকে ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়। ট্রেভেসে কয়েক বছরের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রায় ৭০০০ ব্যক্তিকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ক্যাথলিক মতবাদী এবং প্রগতিশীল প্রোটেষ্টান্ট মতবাদী উভয় সম্প্রদায়েই ডাইনীদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা সমান-ভাবে প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগের মানসিক রোগীদের সম্পর্কে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও তথাকথিত ধর্ম-ভিত্তিক বিকৃত ধারণা প্রায় তিন শতাব্দী ধরে মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধি ও মানবতার অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই মতবাদের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ বা সমালোচনা করার সাহসও কারও ছিল না। কেননা এই ধর্মমূলক ধারণার বিরোধিতা করা স্পষ্টই বিধর্মিতার লক্ষণ এবং তার শাস্তিও মৃত্যু। কিন্তু তবু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানসিক রোগীদের প্রতি এই নৃশংস এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আচরণের বিরোধিতা করে কয়েকজন মানবদরদী মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় প্যারাসেলসাসের (১৪৯০-১৫৪১)। ইনি প্রথমে জানালেন যে 'নৃত্য মত্ততা' একধরনের ব্যাধি, শয়তান বা অপদেবতার ভর থেকে হয় না এবং অন্যান্য ব্যাধির মত এরও চিকিৎসা করা উচিত। তিনি এই সব রোগের পেছনে মানসিক কারণ আছে বলে উল্লেখ করেন এবং 'শারীরিক আকর্ষণের' দ্বারা চিকিৎসার নির্দেশ দেন। এই 'শারীরিক আকর্ষণের' ধারণা থেকেই পরে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সম্মোহনের প্রয়োগ প্রচলিত হয়। তিনি মানসিক ব্যাধির আসুরিক তত্ত্বে বিশ্বাসী না হলেও ব্যক্তির মস্তিষ্কের উপর চাঁদের প্রভাব থেকে মত্ততা দেখা দেয় বলে বিশ্বাস করতেন। ইংরাজী লুনাটিক (lunatic) কথাটি ল্যাটিন শব্দ লুনা (luna) বা চাঁদ থেকে এসেছে। অতএব লুনাটিক ব্যক্তিরা হল চাঁদের প্রভাবগ্রস্ত। প্যারাসেলসাসের এই তত্ত্বের জন্য তাঁর অত্যাচারের শেষ ছিল না এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁকে জনসাধারণের নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল।

জোহান ওয়েয়ার (১৫১৫-১৫৮৮) ছিলেন একজন শিক্ষিত চিকিৎসক। তিনি মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের উপর এই অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন দেখে

ব্যথিত হন। তিনি এই সমস্যাটি নিয়ে বিশেষ গবেষণা করেন এবং ১৫৬৩ সালে ডাইনী প্রথার উপর একটি বই লেখেন। এই বইটিতে তিনি লেখেন যে যাদের ডাইনী সন্দেহে জেলে পুরে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে তাদের সকলে না হলেও অধিকাংশই মানসিক ব্যাধির রোগী এবং তাদের এইভাবে নির্যাতিত করা বা হত্যা করা অত্যন্ত জঘন্য ও অমানুষিক কাজ। যদিও ওয়েয়ারের এই বইখানি তুমুল প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় তুলেছিল তবে সে সময়ের অনেক চিকিৎসক এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিদ ওয়েয়ারের মতের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

জোহান ওয়েয়ার মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি আনেন। তার পাণ্ডিত্য বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আধুনিক পন্থায় চিকিৎসা করার প্রগতিশীল পন্থা আবিষ্কার করেন। এইজন্য তাঁকে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মনশ্চিকিৎসা বিদ্যার (Psychiatry) জনক বলা চলে। কিন্তু তাঁর মতবাদ ও চিকিৎসা পদ্ধতি এতই প্রগতিশীল যে সে সময়ে তাঁর লিখিত পুস্তকগুলি বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল। ওয়েয়ারের পরেই রেজিনাল্ড স্কটের (১৫৩৮-১৫৯৯) নাম করতে হয়। ডাইনী প্রথার আবিষ্কার নামে তাঁর লিখিত একটি পুস্তকে তিনি ডাইনীদের সম্বন্ধে প্রচলিত কুসংস্কার এবং তাদের উপর আসুরিক প্রথার প্রয়োগের তীব্র সমালোচনা করেন। এই বইটিতে তিনি লেখেন যে যাদের ডাইনী বলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তারা প্রকৃতপক্ষে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। তাদের কাজ, কথাবার্তা, বিচারবুদ্ধি, হাবভাব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাদের মস্তিষ্ক ব্যাধিগ্রস্ত এবং তারা তার ফলে তাদের সাধারণ বিচারক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। তাদের মানসিক অসুস্থতা এতই তীব্র যে তারা কল্পনা করে যে তারা ডাইনী এবং তাদের মধ্যে অলৌকিক শক্তি আছে। রাজা জেমস আসুরিকবাদের এই বিরোধিতা সহ্য করলেন না। তিনি স্কটের বই আটক করে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক রোগীদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা দূর হতে সুরু হল এবং ডাইনীদের শাস্তি দেবার বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হল। সেন্ট ভিনসেন্ট ডু পল ১৬০০ সালে জানালেন যে মানসিক অসুস্থতা শারীরিক রোগের মতই এক ধরনের ব্যাধি এবং খৃষ্টধর্মের নীতি অনুযায়ী উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাময় সহৃদয় এবং সক্ষম ব্যক্তিদেরই কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে পরবর্তী দুই শতকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা এবং আসুরিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল ও সম্মিলিত জনমত গড়ে ওঠে।

সমগ্র মানব-চিন্তার রাজ্যেই যুক্তিধর্মিতা এবং পর্যবেক্ষণের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং শীঘ্রই আসুরিক মতবাদ বিলুপ্ত হয়ে যায় তার স্থানে গড়ে ওঠে আধুনিক যুক্তিধর্মী ও পর্যবেক্ষণভিত্তিক অস্বাভাবিকতার মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি।

প্রশ্ন :

1. Give a brief account of the general beliefs and modes of treatment followed in the past in relation to abnormal behaviours.

ছয়
অস্বাভাবিকতার চিকিৎসাপদ্ধতির বিবর্তন

অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস ও বিকৃত ধারণা ধীরে ধীরে লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিকতার চিকিসার পদ্ধতির মধ্যেও প্রচুর পরিবর্তন দেখা দিল। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শয়তান বা অপদেবতার প্রভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বলে আর মনে করা হল না এবং তারাও যে শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মত এক শ্রেণীর অসুস্থ ব্যক্তি এ সত্য সকলে হৃদয়ঙ্গম করল। ফলে আসুরিক ও অমানুষিক চিকিৎসা পদ্ধতির স্থানে দেখা দিল সহৃদয় বিচারভিত্তিক চিকিৎসার আয়োজন। ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই দেখা যায় যে গির্জা, মঠ এবং কারাগার থেকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ভার ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের নিরাময়াগারে (asylum)। যদিও এই নিরাময়াগারগুলি তেমন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল না, এমন কি অনেকক্ষেত্রে কারাগারেরই উন্নত সংস্করণ ছিল, তবু একথা অনস্বীকার্য যে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার রাজ্যে এই নতুন প্রতিষ্ঠানগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রগতিশীল চিকিৎসা-পদ্ধতির সূত্রপাত করেছিল।

১৫৪৭ সালে অষ্টম হেনরী লণ্ডনের সেন্ট মেরী অফ বেথেলেহেম নামক মঠটিকে মানসিক রোগের হাসপাতালে রূপান্তরিত করেন। এই হাসপাতালের নামটি পরে সঙ্কুচিত হয়ে বেডলাম (Bedlam) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই তথাকথিত হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং চিকিৎসাপদ্ধতি অত্যন্ত শোচনীয় প্রকৃতির ছিল। যে সব রোগী দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল তাদের এক পেনী মূল্য নিয়ে বাইরে জনসাধারণের কাছে দেখান হত। যারা অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল তাদের দিয়ে ভিক্ষা করান হত। এরা বেডলাম ভিক্ষুক বলে পরিচিতি লাভ করে। সেক্সপীয়ারের কিং লীয়ার নাটকে বেডলাম ভিক্ষুকদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেডলামের অনুরূপ মানসিক রোগীদের জন্য নিরাময়াগার অন্যান্য দেশেও স্থাপিত হল। আমেরিকায় এই ধরনের প্রথম উন্মাদাগার স্থাপিত হল বারনারডিনো আলভারেস নামে একজন সহৃদয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ১৫৬৬ সালে মেক্সিকোর স্যান হিপোলিটোতে। ফ্রান্সের প্রথম উন্মাদাগার স্থাপিত হয় প্যারিসের উপকণ্ঠে

লা মেসন ছ সারেন্টনে ১৬৪১ সালে। মস্কোতে ১৭৬৪ সালে এই ধরনের একটি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাগার স্থাপিত হয় এবং ভিয়েনার কুখ্যাত লুনাটিক্স্ টাওয়ার নির্মিত হয় ১৭৮৪ সালে। এই টাওয়ারটি জনসাধারণের দর্শনীয় স্থানরূপে তৈরী করা হয়েছিল। টাওয়ারটি ছিল জমকালোভাবে খচিত ও কারুকার্যময় একটি গোলাকার গৃহ এবং তার মধ্যে ছিল চৌকো চৌকো ঘর। এই ঘরগুলিতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বন্দী করে রাখা হত এবং জনসাধারণের কাছ থেকে স্বল্প প্রবেশমূল্য নিয়ে তাদের প্রকাশ্যে দেখান হত। টাওয়ারের আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা খুবই শোচনীয় প্রকৃতির ছিল এবং রোগীদের ঘৃণ্য অপরাধী বা পশুর চেয়ে কোন দিক দিয়ে উন্নত বলে মনে করা হত না। অবশ্য মানসিক রোগীদের প্রতি এই ধরনের মনোভাব সে সময়ের সব হাসপাতালেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

১৭৫৬ সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের তত্ত্বাবধানে ফিলাডেলফিয়াতে পেনসিলভেনিয়া হাসপাতালটি নির্মিত হয়। এতে মানসিক রোগীদের থাকার জন্য বিশেষ একটি অংশ ছিল। তবে আমেরিকায় সম্পূর্ণভাবে মানসিক রোগীদের জন্য হাসপাতাল তৈরী হয় ভার্জিনিয়ার উইলিয়ামস্বার্গ নামক স্থানে ১৭৭৩ সালে।

পূর্বেই বলেছি যে সে কালের মানসিক রোগের হাসপাতালগুলি অপরাধীদের জন্য কারাগারের চেয়ে কোনও দিক দিয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না এবং মানসিক রোগীদেরও অপরাধী বা বনের পশুর চেয়ে ভাল জীব বলে মনে করা হত না। প্যারিসের লা বিসেত্রে নামক হাসপাতালের বর্ণনায় দেখা যায় যে অন্ধকার আলোকহীন ছোট ছোট ঘরে দেওয়ালের সঙ্গে রোগীদের চেন দিয়ে এমনভাবে বেঁধে রাখা হত যার ফলে তারা নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারত না। অনেক সময় রোগীদের কোমরে লোহার বেড়ী এবং হাত পা দুই চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হত। রোগীদের খাওয়া দাওয়ার কোনও সুব্যবস্থাই ছিল না এবং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি কোনও রকম মনোযোগ দেওয়া হত না।

সে সময়ে মানসিক রোগীদের চিকিৎসাপদ্ধতিরও কোন উন্নতি হয় নি। অনেক জায়গায় মানসিক রোগ সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণাই বলবৎ ছিল এবং মানসিক রোগীদের শয়তানের প্রভাবগ্রস্ত বলেই ধরে নেওয়া হত। ফলে তাদের উপর যথেচ্ছ উৎপীড়ন, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা ও চরম অবহেলার সীমা থাকত না। ঠাণ্ডা জলে হঠাৎ ডুবিয়ে ধরা, দু তিন ঘণ্টা ধরে কনকনে ঝর্ণার জলে চান করান, রক্তক্ষরণ করা, বমি করান, মাথা কামিয়ে দেওয়া, স্বল্পাহারে রাখা, আঁটসাট

জামা পরান ইত্যাদি নির্যাতনমূলক প্রক্রিয়াগুলি চিকিৎসাপদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।

কোনও কোনও হাসপাতালে অবশ্য আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির সূচনা দেখা দিয়েছিল। কোথাও কোথাও প্রগতিশীল চিকিৎসকেরা প্রাচীন আসুরিক চিকিৎসা-পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতি পুরোমাত্রায় সর্বত্র অনুসৃত হয়ে এসেছিল।

ঘিলের মন্দির (Gheel Shrine)

উন্মাদাগারের ক্রমবিবর্তনের প্রাচীন ইতিহাসে বেলজিয়ামের 'ঘিলের মন্দিরে'র কাহিনীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানসিক রোগীদের এই নিরাময়ক্ষেত্রটি সেকালের অন্যান্য উন্মাদাগারের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির ছিল। এই উন্মাদালয়টিতে সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও ভালবাসা ছিল মানসিক রোগীদের চিকিৎসা-পদ্ধতির সর্বপ্রধান উপাদান। 'ঘিল' প্রকৃতপক্ষে একটি বেলজিয়ামের গ্রামের নাম এবং এটি মানসিক রোগীদের একটি উপনিবেশরূপে গড়ে উঠে ছিল। মানসিক রোগীদের এই অভিনব নিরাময়ক্ষেত্রটির উৎপত্তির পেছনে একটি অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে।

বহু প্রাচীনকালে আয়ারল্যাণ্ডে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাণী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। রাণীর একটি মেয়ে ছিল। সেও ছিল মায়ের মত অতুলনীয় সুন্দরী। একবার কঠিন রোগে রাণীর মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুতে মেয়ে শপথ গ্রহণ করে যে সে আজন্ম কুমারী থেকে দরিদ্র এবং মানসিক রোগগ্রস্তদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। শোকাতুরা রাজা এদিকে ঘোষণা করলেন যে তিনি তাঁর মৃতা রাণীর মত সুন্দরী দেখতে হবে এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করবেন। কিন্তু সারা রাজ্যে মৃতা রাণীর মত সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেল না। কিন্তু শয়তান রাজাকে চুপিচুপি পরামর্শ দিল যে রাণীর মত সুন্দরী ত রাজ্যে একজন আছে—সে রাজার মেয়ে। রাজা শয়তানের প্ররোচনায় নিজের মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। রাজকন্যা এই ঘৃণিত প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বেলজিয়ামে পালালেন। রাজা সেখান পর্যন্ত তাকে তাড়া করলেন এবং শয়তানের সহায়তায় রাজকন্যা এবং তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের হত্যা করলেন। রাত্রে দেবদূতেরা দেখা দিল এবং রাজকন্যার মৃতদেহ ঘিল নামে গ্রামের বনেতে লুকিয়ে রাখল। বহু বৎসর পরে একদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পাঁচজন উন্মাদ ব্যক্তিকে নিয়ে তাদের রক্ষকেরা এই গ্রামের একটি সরাইখানাতে রাত কাটায়। পরের দিন দেখা যায় সেই পাঁচজন উন্মাদ ব্যক্তিই

সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে। সেই থেকে এই 'ঘিল' গ্রামটি উন্মাদ ব্যক্তিদের নিরাময়ের পবিত্র ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে পৃথিবীর সব দেশ থেকেই দলে দলে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা 'ঘিলে' তাদের ব্যাধিমুক্তির আশায় সমবেত হত। অনেক রোগী ঐ ঘিলেই বসবাস করত এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন কাটাত। স্থানীয় লোকেরা এদের সহানুভূতি ও দয়ার সঙ্গে গ্রহণ করত এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে যতদূর সম্ভব সাহায্য করত।

ঘিলের উপনিবেশে এখনও মানসিক রোগীদের বাসের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এখানের ২০,০০০ অধিবাসীদের শতকরা ১০ জনই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। এদের উপর বিশেষ কোন বিধিনিষেধ নেই। কেবলমাত্র মদ্যপান করা এবং কোনও জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া এদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া, ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ, মস্তিষ্কঘটিত মানসিক ব্যাধি, উনমানসিকতা প্রভৃতি সব রোগের রোগীই আছে। একজন তত্ত্বাবধায়ক মনশ্চিকিৎসকের কাছে নিয়মিতভাবে এদের পরীক্ষার জন্য যেতে হয় এবং যতদিন না তাদের রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে বলে চিকিৎসকেরা মত দেন ততদিন তারা ওখানে বাস করার অনুমতি পায়।

পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিকাশভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল। ১৭৯২ সালে ফ্রান্সের ফিলিপ পিনেল (১৭৪৫-১৮২৬) এবং ইংল্যাণ্ডের উইলিয়ম টিউকের মূল্যবান অবদান এই নতুন চিকিৎসাপদ্ধতির প্রসার ও জনপ্রিয়তালাভে প্রচুর সাহায্য করে।

ফরাসী বিপ্লবের কিছু পরে প্যারিসের লা বিসেত্রের হাসপাতালের পরিচালনার ভার পড়ে পিনেলের উপর। পিনেল প্রথমেই মানসিক রোগীদের শৃঙ্খল মুক্ত করে দিলেন এবং অন্ধকূপের পরিবর্তে আলোকোজ্জ্বল স্বাস্থ্যকর ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। তিনি জানালেন মানসিক রোগীরা জঘন্য অপরাধী বা বনের পশু নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে অসুস্থ মানুষ। পিনেল তাদের হাসপাতালের খোলা জায়গায় ব্যায়ামের ব্যবস্থা করলেন, তাদের থাকার জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিলেন, ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলেন এবং সহানুভূতি ও দয়ার সঙ্গে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলেন। ফলে সমস্ত হাসপাতালে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। কুড়ি-ত্রিশ বৎসর অন্ধকার কারাগৃহে বন্দী অবস্থায় পড়ে ছিল এমন অনেক মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দু একবৎসরের মধ্যে সেরে উঠল এবং স্বাভাবিক মানুষের

-মত আচরণ সুরু করল। পরে পিনেলের উপর সালপেট্রিয়ের (Salpetriere) হাসপাতালের ভার পড়ে এবং সেখানেও তিনি একই ধরনের পরিবর্তন এনে চমৎকার ফল পান। এইভাবে পিনেলের সংস্কারের ফলে বিসেত্রে এবং সালপেট্রিয়ের ছুটিই মানসিক রোগীদের প্রথম আধুনিক হাসপাতালে পরিণত হয়। পিনেলের পরে তাঁর স্থানে আসেন জিন এস্কুইরল (১৭৭২-১৮৪০)। তিনি পিনেলের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি সালপেট্রিয়ের উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য ত করেনও তাছাড়া আরও দশটি নতুন মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। পিনেল এবং এস্কুইরলের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় আধুনিক মনশ্চিকিৎসার পুরোভাগে ফ্রান্স নিজের স্থান করে নেয়।

পিনেলের সমসাময়িক উইলিয়াম টিউক নামে একজন ধর্মযাজক ইংলণ্ডে 'ইয়র্ক রিট্রিট' নামে একটি মানসিক রোগীদের চিকিৎসাগার খোলেন। তিনি তাঁর এই নতুন চিকিৎসাগারে প্রাচীন আসুরিক পন্থা ত্যাগ করে এক সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন। মানসিক রোগীরা সেখানে ধর্মচর্চা, নানারকম কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাত। টিউকের এই অভিনব চিকিৎসাপদ্ধতি তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল এবং মুষ্টিমেয় সহায়ক ছাড়া আর সকলেই তাঁকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু এই সময় ফ্রান্সে পিনেলের অসাধারণ সাফল্যের খবর ইংলণ্ডে এসে পৌঁছয় এবং ধীরে ধীরে টিউকের সমর্থকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেখতে দেখতে জন কনোলি, সামুয়েল হিচ প্রভৃতি সেই সময়ের প্রখ্যাত চিকিৎসক মনোবিজ্ঞানীরা টিউকের পদ্ধতির সমর্থন জানালেন। ১৮৪১ সালে হিচ্ গ্লষ্টারের উন্মাদাগারে রোগীদের শুশ্রূষার জন্য নার্স নিযুক্ত করলেন এবং তাদের পরিচালনার ভার দিলেন শিক্ষণপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কদের উপর।

পিনেল এবং টিউকের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় অভিনব পরীক্ষণ সমস্ত পৃথিবীতেই সাড়া জাগালো। আমেরিকায় এই নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন বেঞ্জামিন রাস্ (১৭৪৫-১৮১৩) পেনসিলভেনিয়া হাসপাতালে। এই রাসকেই আমেরিকায় মনশ্চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলে বর্ণনা করা হয়।

রাস ১৭৮৩ সালে পেনসিলভেনিয়া হাসপাতালে যোগদান করেন। তিনি পিনেল ও টিউকের মত মানসিক রোগীদের সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে ১৮১২ সালে একটি বই লেখেন। বলতে গেলে আমেরিকায় এইটিই মনশ্চিকিৎসার উপর প্রথম বই। রাস আধুনিক মনশ্চিকিৎসার সূত্রপাত করলেও তাঁর পদ্ধতি পুরাতনপন্থীই ছিল। রক্তক্ষরণ ও জোলাপ ছিল

তাঁর চিকিৎসার প্রধান পদ্ধতি। তাছাড়া তিনি ট্রাঙ্কুইলাইজার (tranquillizer) বা শান্তকরক নামে একরকম যন্ত্র বার করেছিলেন, যা প্রাচীন নির্যাতন পদ্ধতির উন্নত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও মনশ্চিকিৎসার নতুন ধারা প্রবর্তনে রাস যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

রাসের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে মানসিক রোগের চিকিৎসার অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেন নিউ ইংলণ্ডের ডরোথিয়া ডিকস (১৮০২-১৮৮৭) নামে একজন স্কুল শিক্ষিকা। ১৮৪১ সালে তিনি একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে নারীবন্দীদের পড়াতে গিয়ে তাদের শোচনীয় অবস্থার কথা জানতে পেরে খুব বিস্মিত হন। ১৮৪৮ সালে আমেরিকার কংগ্রেসে একটি বিবৃতিতে তিনি জানান যে আমেরিকায় ৯০০০ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও উন্মাদ আছে অথচ তাদের লোহার চেন দিয়ে বেঁধে অত্যন্ত জঘন্য পরিবেশে অপরিসীম লাঞ্ছনার মধ্যে রাখা হয়েছে। এই ব্যাপার নিয়ে তিনি ব্যাপক আন্দোলন স্থরু করলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ টাকার চাঁদা সংগৃহীত হল। এই টাকা দিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে মানসিক রোগীদের জন্য হাসপাতাল গড়ে উঠল। কেবল আমেরিকাতে নয় মিস ডিক্সের পরিচালনায় কানাডায় দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠিত হল এবং স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের হাসপাতালগুলির ব্যাপক সংস্কারেও তিনি প্রচুর সাহায্য করেন। মিস ডিক্সের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশে বত্রিশটি আধুনিক মানসিক রোগের হাসপাতাল গড়ে ওঠে। মানব সেবার ইতিহাসে মিস ডিক্সের অবদান যে অসাধারণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অধিকাংশ আমেরিকার মানসিক হাসপাতালে তত্ত্বাবধানের ভার যাদের উপর থাকত তারা চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষণপ্রাপ্ত হত না। তাছাড়া রোগীদেরও নিয়মিত চিকিৎসার আয়োজন থাকত না। ধীরে ধীরে চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষণপ্রাপ্ত স্থপারিন্টেণ্ডেণ্টদের হাতে মানসিক হাসপাতালগুলির ভার দেওয়া হল। ১৮৪৪ সালে ১৩ জন স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিলে আমেরিকার উন্মাদ প্রতিষ্ঠানগুলির মেডিকাল স্থপারিন্টেণ্ডেণ্টদের এ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত করেন। এই প্রতিষ্ঠানই পরে বর্তমানের আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এ্যাসোসিয়েসনে পরিণত হয়।

মানসিক রোগীদের জন্য হাসপাতালের সংগঠন এবং তাদের প্রতি ব্যবহারের যথেষ্ট উন্নতি হলেও মানসিক ব্যাধির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান লাভে তখনও দেরী ছিল অনেক। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক চিকিৎসকের

মধ্যে ধারণা ছিল যে পাপ থেকেই মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ফলে অমানুষিক ও বর্বরোচিত চিকিৎসা পদ্ধতি লুপ্ত হলেও সত্যকারের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি তখনও হয় নি। এই সব কারণে জনসাধারণের মনেও মানসিক রোগ সম্বন্ধে একটা ভীতিকর ও বিরূপ ধারণা ছিল। মানসিক রোগীদের মনে করা হত ভয়ঙ্কর ও দুর্দান্ত এক ধরনের অদ্ভুত মানুষ।

১৯০৮ সালে ক্লিফোর্ড বিয়ার্স নামে একজন যুবক "এ মাইণ্ড দ্যাট্ ফাউণ্ড ইট্‌সেল্‌ফ" (A Mind That Found Itself) নামে একটি বইতে মানসিক রোগীদের প্রতি অবিচার ও নির্দয় আচরণের বর্ণনা করেন। ইনি নিজে মানসিক রোগে অসুস্থ হয়ে তিনটি মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা করান। কিন্তু সেই সব হাসপাতালে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার শোচনীয় ব্যবস্থার ফলে তাঁর রোগ সারে না। শেষে একজন সহৃদয় বন্ধুর চিকিৎসায় তাঁর রোগ সেরে যায়। তিনি এই বইটিতে দেখান যে জনসাধারণ থেকে সুরু করে চিকিৎসকদের মধ্যেও মানসিক রোগ সম্বন্ধে নিতান্ত ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। তার ফলে তারা রোগের প্রশমন করা দূরে থাক, রোগ তারা আরও বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। মানসিক রোগীকে সত্যকার অসুস্থ ব্যক্তি ভেবেই চিকিৎসা করা দরকার। বিয়ার্সের এই বইখানি আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেম্‌স্ এবং প্রখ্যাত মনশ্চিকিৎসক অ্যাডলফ্ মেয়ার বিয়ার্সের বই পড়ে এই সমস্যাটির প্রতি সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁরা বুঝলেন যে মানসিক ব্যাধির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে নির্ভুল ধারণার সৃষ্টি করার দরকার। মেয়ারই মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (Mental Hygiene) নামটির সৃষ্টি করলেন এবং এই নামেই জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন। ১৯০৮ সালে প্রথম মেণ্টাল হাইজিনের সোসাইটি গঠিত হয়। পরে এই আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানটি প্রসার লাভ করে ন্যাশানাল কমিটি ফর মেণ্টাল হাইজিনে পরিণত হয়। ক্লিফোর্ড বিয়ার্সের নেতৃত্বে এই আন্দোলন বিশ্বব্যাপী রূপ গ্রহণ করে এবং ১৯১৯ সালে মেণ্টাল হাইজিনের ইণ্টার ন্যাশনাল কমিটি স্থাপিত হয়। আধুনিক মনশ্চিকিৎসার প্রসারে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই আন্দোলনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন :

1. Trace the evolution of techniques and methods of treating abnormal behaviours.

সাত

অস্বাভাবিক আচরণের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা

(Scientific Definition of Abnormal Behaviours)

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে অস্বাভাবিক আচরণের যে সব বৈচিত্র্যময় কাহিনীর সংগে আমরা পরিচিত হলাম সেগুলি থেকে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে করা যায় যে অতীতে কোন সময়েই অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে চিকিৎসকরা বা মনোবিজ্ঞানীরা সক্ষম হননি। এর প্রধান কারণ ছিল স্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট মান সম্পর্কে ধারণার অভাব। বর্তমান কালেও এমন অনেক আচরণের আমরা উল্লেখ করতে পারি যা অতীতে অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হত কিন্তু বর্তমান যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিচারে সে আচরণকে আর অস্বাভাবিক বলা চলেনা।

অতএব অস্বাভাবিক আচরণের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দিতে হলে প্রথমেই স্বাভাবিক আচরণের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট মান নির্ধারণ করা দরকার। শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার পথে কোন বাধা বা অসুবিধা বোধ করতে আমাদের হয় না। কেননা শারীরিক স্বাস্থ্যের একটি মান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাবে দেওয়া সম্ভব এবং যদি কোন শারীরিক অবস্থা সেই শারীরিক স্বাস্থ্যের মান থেকে দূরে সরে যায় তা হলে তাকেই আমরা শারীরিক অসুস্থতা বা অস্বাভাবিকতা বলতে পারি। কিন্তু স্বাভাবিক আচরণের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট মান দেওয়া সম্ভব হয়না, ফলে অস্বাভাবিক আরচণেরও কোন সুনির্ধারিত সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

স্বাভাবিক আচরণের একটি নির্দিষ্ট মান বা মাপকাঠি পাওয়া যায় না বলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির মানের উল্লেখ করেছেন এবং এই বিভিন্ন মান বা মাপকাঠিগুলির সংগে তুলনা করে আমরা অস্বাভাবিক আচরণের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারি। এই বিভিন্ন মান বা মাপকাঠিগুলির স্বতন্ত্রভাবে নীচে উল্লেখ করা হল।

১। পরিসংখ্যানমূলক মান (Statistical Norm)

আমরা অস্বাভাবিকতা শব্দটির আক্ষরিক বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিতে পারি।

এই অর্থ নিলে শব্দটির পরিসংখ্যানমূলক মান নির্ণয় করলেই চলবে। পরিসংখ্যানমূলক মান বলতে বোঝায় যে কোন একটি বিশেষ দলের অধিকাংশ লোক যে আচরণ করবে সেটাই স্বাভাবিক এবং এই অধিকাংশ লোকের আচরণ থেকে কোন রকম পার্থক্য থাকলেই সেটা অস্বাভাবিক আচরণের শ্রেণীভুক্ত হবে। যেমন আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোকই রাত্রে ঘুমোয়। অতএব যদি কেউ রাত্রে না ঘুমোয় তবে সেটা অস্বাভাবিক আচরণ হয়ে উঠবে। এই অর্থে যে কোন সমাজের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিও অস্বাভাবিক। স্পষ্টতই অস্বাভাবিকতার এই মান গ্রহণ করলে অস্বাভাবিক আচরণের কোন সর্বজনীন মাপকাঠি পাওয়া যাবে না। নরখাদকদের দলে যেমন আমাদের যে কেউ অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হবে, তেমনি আমাদের সমাজে একজন নরখাদকও সেইরকম অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হবে। চোরেদের সমাজে একজন সাধু ব্যক্তি যেমন অস্বাভাবিক, সাধু ব্যক্তিদের সমাজে একজন চোরও তেমনি অস্বাভাবিক। এক কথায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজে এবং বিভিন্ন স্থানে অস্বাভাবিকতার মান বিভিন্ন হয়ে দাঁড়াবে।

যদিও অস্বাভাবিকতার এই সংজ্ঞা শব্দার্থের দিক দিয়ে নির্ভুলই তবুও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই অর্থ গ্রহণ করা চলবে না। অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানে আমরা অস্বাভাবিক আচরণ বলতে সেই আচরণকে বোঝাব যে আচরণ প্রকৃতিতে বিকারমূলক বা ব্যাধিজাত। অতএব অস্বাভাবিক আচরণের এমন একটি মানের প্রয়োজন যা মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন সমাজে প্রয়োগ করা যাবে এবং যার দ্বারা আমরা বাঞ্ছিত আচরণ এবং অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।

২। ব্যক্তিগত সংগতিবিধানের মান

ব্যক্তির আচরণের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা নির্ণয়ে ব্যক্তিগত সংগতিবিধানকে মান বা মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান উভয়ের দিক দিয়েই পরিবেশের সংগে ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই সংগতিবিধান করে যেতে হচ্ছে। এই পরিবেশ বিচিত্র এবং বহুবিধ শক্তির সমষ্টি। কোন কোন শক্তি ব্যক্তির অনুকূল হলেও বহু শক্তিই ব্যক্তির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এই বহুমুখী ব্যক্তির সংগে সংগতিবিধান করে চলতে পারাই সুষ্ঠু জীবন যাপনের লক্ষণ। যারা তা পারে তাদের আমরা সুসংগতিসম্পন্ন

ব্যক্তি বলে বর্ণনা করে থাকি এবং তারাই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় জীবনে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং প্রীতিকর জীবন যাপন করে থাকে। অপর পক্ষে যারা এই বহুমুখী পরিবেশের সংগে সুষ্ঠুভাবে সংগতিবিধান করতে পারে না তাদের জীবনে ব্যর্থতা, কষ্ট এবং অবসন্নতা দেখা দেয়। নানারকম মানসিক উপসর্গ তাদের জীবনকে বিব্রত করে তোলে এবং দুশ্চিন্তা, ভয়, নিরাপত্তার অভাববোধ এবং অসন্তোষ প্রভৃতি মনোবিকারের লক্ষণ তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। এদের আমরা অপসংগতিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করে থাকি।

সংগতিবিধানকে যদি স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার মান বলে ধরা হয় তাহলে যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে তার ব্যক্তিগত সংগতিবিধানের কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছে তাকেই আমরা স্বাভাবিক ব্যক্তি বলব এবং যে ব্যক্তি তা পারেনি সে অস্বাভাবিক ব্যক্তির পর্যায়ে পড়বে। কেবল তাই নয় সংগতিবিধানের অভাবের মাত্রা দিয়ে ব্যক্তির অস্বাভাবিকতার মাত্রাও নির্ণয় করা যাবে। অর্থাৎ যে যত বেশী ব্যক্তিগত সংগতিবিধান করতে পারবে না, তার আচরণ তত বেশী অস্বাভাবিক বলে ধরা হবে।

ব্যক্তিগত সংগতিবিধানের এই মানটি যে অনেক দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এই মানের একটি সুবিধা হল যে মনোবিজ্ঞানমূলক এবং জীবতত্ত্বমূলক উভয় স্তরের সংগতিবিধানকেই এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই মানটির কতকগুলি গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। যেমন এখানে প্রথমত ব্যক্তিগত সংগতিবিধানের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে, সমাজ জীবনে ব্যক্তির ভূমিকার উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সমাজ জীবনের নিম্নতম কর্তব্য শেষ করেই ব্যক্তি তার সংগতিবিধান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তার আচরণকে ত্রুটিহীন বলা চলে না। সামাজিক জীবনের সামগ্রিক মঙ্গল এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রেও প্রতিটি ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য আছে। দ্বিতীয়ত কেবলমাত্র সংগতিবিধান করতে পারলেই সবক্ষেত্রে আচরণকে পূর্ণাঙ্গ বা স্বাভাবিক বলা চলে না। সত্তার পূর্ণ বিকাশনও স্বাভাবিক আচরণের অন্তর্ভুক্ত হবে। তার উপর ব্যক্তি তার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলির কতটা বিকাশ করতে পারল তার উপর তার আচরণের স্বাভাবিকতা নির্ভর করবে। অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে এমন একজন ব্যক্তি যদি তার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার বিকাশ না করে কেবলমাত্র সাধারণ স্তরের সংগতিবিধানে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন কাটায় তাহলে তার আচরণে কোন দোষ না থাকলেও তাকে স্বাভাবিক বলা চলবে না।

অর্থাৎ এক কথায় ব্যক্তিগত সংগতিবিধান ব্যক্তির মানসিক স্তরের সংগে সামঞ্জস্য রেখে সম্পন্ন করতে হবে। তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত সংগতিবিধানের নৈতিক দিকটির কথা এখানে বলা হয়নি। ব্যক্তিগত সংগতিবিধান কেবলমাত্র সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক হলেই হবেনা। ব্যক্তির নিজের এবং তার সমাজের দিক দিয়েও সেই সংগতিবিধান যেন উপযোগী এবং কাম্য হয়। যেমন একজন সাধু ব্যবসায়ী এবং একজন অসাধু ব্যবসায়ী দুজনেই পরিবেশের সংগে নিজের নিজের পন্থায় সন্তোষজনক ভাবে সংগতিবিধান করে সুখী, পরিতৃপ্ত এবং সাফল্যময় জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি এবং সমাজের দিক দিয়ে সাধু ব্যবসায়ীর আচরণকে আমরা স্বাভাবিক বলে মনে করব এবং অসাধু ব্যবসায়ীর আচরণকে আমরা অস্বাভাবিক আচরণের পর্যায়ে ফেলব।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত সংগতিবিধানকে যদি স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার মান বলে গ্রহণ করতে হয় তাহলে এই সংগতিবিধানের সামাজিক দিক এবং নৈতিক দিক এই উভয় দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়নের মান

ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়নকে স্বাভাবিকতার মান রূপে গ্রহণ করার পেছনে সবল মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। ব্যক্তিসত্তা বলতে ব্যক্তির শারীরিক মানসিক এবং প্রক্ষোভমূলক বহুবিধ শক্তির সংগঠনকে বোঝায়। অতি শৈশব থেকে ব্যক্তি যখন ধীরে ধীরে পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠে তখন এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তি তার মধ্যে পুষ্টিলাভ করে এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। সেই সময় যদি সেগুলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটে তবেই ব্যক্তিসত্তার পূর্ণবিকাশ ও সুষম পরিণতি সম্ভব হয়। আর যদি এই বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সুষ্ঠুভাবে না ঘটে তাহলে ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়সাধনও অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায় এবং ব্যক্তির আচরণে অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে যে সব বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তি কার্যকরী হয় সেগুলির মধ্যে অভ্যাস, মনোভাব, সংলক্ষণ (traits), আচরণ-বৈশিষ্ট্য, সেন্টিমেন্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সুসংহত কর্মসূচীর অনুসরণের উপরই ব্যক্তিসত্তার সুসমন্বয়ন নির্ভর করে। সুসমন্বিত ব্যক্তিসত্তার লক্ষণ বলতে বোঝায় ব্যক্তির চিন্তা এবং অনুভূতির মধ্যে সুসঙ্গতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং যান্ত্রিক প্রতিরক্ষা কৌশলের অভাব, নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণে উন্মুখতা এবং সব শেষে পরিবেশের সঙ্গে সন্তোসজনক সঙ্গতিবিধান।

ব্যক্তিসত্তার সুসমন্বয়ন স্বাভাবিকতার মান রূপে অনেক দিক দিয়ে সন্তোষজনক হলেও এ মানটিও ত্রুটিশূন্য নয়। তার প্রথম কারণ হল যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়নের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। অথচ সব রকম সমন্বয়নই যে বাঞ্ছিত ও স্বাস্থ্যবান তা বলা চলে না। উদাহরণস্বরূপ দীর্ঘকারাবাসে দণ্ডিত বা কনসেন্ট্রেসান ক্যাম্পে বন্দী ব্যক্তি যে অনুভূতি-বর্জিত ও উদাসীন মনোভাবের আড়ালে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখে, সে ধরনের মনোভাব কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতিতে মোটেই স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যকর বলে গৃহীত হবে না। এর দ্বারা এইটুকু 'প্রমাণিত হচ্ছে যে ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়নের কোন স্বাভাবিক মান দেওয়া সম্ভব নয়। পরিবেশের জটিলতা এবং সঙ্কটের মাত্রার পরিবর্তনে ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়নেরও প্রকৃতি বদলে যায়। অতএব এ ধরনের অস্থায়ী একটি মাপকাঠিকে স্বাভাবিকতার মানরূপে গ্রহণ করা চলে না।

৪। ব্যক্তিগত সুপরিণতি বা পূর্ণবিকাশন

ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাগুলির পূর্ণবিকাশন এবং তার সত্তার সুপরিণতিকে অনেকে স্বাভাবিকতার মানরূপে গ্রহণ করে থাকেন। ব্যক্তিগত সুপরিণতি বলতে বোঝায় যে ব্যক্তি তার বিভিন্ন বয়সের উপযোগী আচরণগুলি সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যক্তির বিকাশের বিভিন্ন স্তরে তার বহুমুখী সম্ভাবনা, দক্ষতা এবং মানসিক শক্তিগুলিও অনুরূপ পরিণতি লাভ করে এবং সেই স্তরের উপযোগী আচরণ করতে তাকে সক্ষম করে। তাকে সেই স্তরের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং যে ধরনের সঙ্গতিবিধান সম্পন্ন করতে হয় সে যদি তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে সে তার বাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করেছে এবং তার পূর্ণ বিকাশনের লক্ষ্যে যথাযথভাবে এগিয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য এই ধরনের ব্যক্তির আচরণ স্বাস্থ্যকর, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বাভাবিক হবে। আর যদি ব্যক্তি তার বয়সোচিত পরিণতি লাভ না করে এবং তার সহজাত সম্ভাবনাগুলি তার বিকাশ-স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিকশিত না হয় তাহলে তার পক্ষে দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সমাধান করাও যেমন কষ্টকর হয়ে ওঠে তেমনই তার পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করাও দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তার আচরণ ত্রুটিপূর্ণ, অনুপযোগী, অসংহত এবং অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অতএব এই দিক দিয়ে বিচার করলে ব্যক্তিগত সুপরিণতি এবং পূর্ণ বিকাশনকে স্বাভাবিকতার মানরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত সুপরিণতিকে স্বাভাবিকতার মানরূপে গ্রহণ করার পথে একটা বড় বাধা

হল যে সুপরিণতি বলতে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিসত্তার কোন্ অবস্থাকে বোঝায় তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তেমনই ব্যক্তিসত্তার বৃদ্ধি কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছলে তাকে পূর্ণবিকাশ আখ্যা দেওয়া যাবে তাও নির্দিষ্ট করে বলা শক্ত। বয়সোচিত আচরণ বলতেও ঠিক কোন্ আচরণকে বোঝাবে তারও কোন সর্বজনীন মান দেওয়া সম্ভব হয় না। মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি যে কোনও ব্যক্তি যদি নিজের সম্বন্ধে এবং পৃথিবী সম্বন্ধে বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে, তার সকল জীবনযাত্রার জন্য দৈনন্দিন বহুমুখীর সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধান করতে পারে এবং দায়িত্বসম্পন্নভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে তাহলে তার ব্যক্তিসত্তা সুপরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু এই সর্তগুলি যে ব্যক্তিসত্তার সুপরিণতির সর্বজনীন মাপকাঠি তা কখনই বলা চলে না। ব্যক্তিসত্তার সুপরিণতির দিক দিয়ে সমানভাবে সমর্থনীয় অথচ প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক এমন বহু বিভিন্ন ধারণাও দেওয়া যেতে পারে।

৫। দলগত মঙ্গল এবং অগ্রগতির মান

ব্যক্তির নিজস্ব দিক দিয়ে যেমন স্বাভাবিকতার মান দেওয়া যায় তেমনই ব্যক্তি যে দল বা সমাজের অন্তর্গত সেই দল বা সমাজের দিক দিয়েও স্বাভাবিকতার মানের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।

ব্যক্তি তার প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করে তার উপর আচরণের স্বাভাবিকতা অনেকখানি নির্ভর করে। যদি ব্যক্তির আচরণ সমাজের আর সকলের মঙ্গল ও উন্নতির অনুকূল এবং সহায়ক হয় তাহলে ব্যক্তির আচরণকে আমরা স্বাভাবিক বলে মনে করব। আর যদি ব্যক্তির আচরণ সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করে তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ ব্যক্তির আচরণ অস্বাভাবিক পর্যায়ের। ব্যক্তিমাত্রের জীবন সমাজের আর সকলের আচরণের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তুর অসাধু ব্যবসায় করে বা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কালোবাজারী করে অর্থ সঞ্চয় করে সে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করলেও তার আচরণ অস্বাভাবিক, কেননা তার আচরণ আর সকলের ক্ষতি করে এবং সমাজের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। এককথায় সুষ্ঠু সামাজিক সঙ্গতিবিধানই হবে ব্যক্তির স্বাভাবিকতার প্রকৃষ্ট মান। যে ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পেরেছে তার আচরণকে স্বাভাবিক বলা হবে আর যার সামাজিক সঙ্গতিবিধান অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিময় তার আচরণকে আমরা অস্বাভাবিক বলব।

স্বাভাবিকতার মানরূপে দলগত মঙ্গল এবং অগ্রগতি বা সামাজিক সঙ্গতিবিধান সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য নয়। তার প্রথম কারণ হল যে সমাজ বা দলের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করাকে স্বাভাবিকতার মান বলে গ্রহণ করা হবে যদি সেই সমাজের সংগঠনই ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে সেই সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানকে স্বাভাবিক বলে কেমন করে মনে করা যাবে। যেমন যে সমাজে দাসত্বপ্রথা বা বর্ণবৈষম্য প্রচলিত সে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করাটা স্বাভাবিক আচরণের পর্যায়ে পড়বে না। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের নানা গবেষণা থেকে দেখা যায় যে সমাজের সংগঠনও খুবই ত্রুটিপূর্ণ এমন কি বিকৃত হতে পারে। অতএব সুষ্ঠু সামাজিক সঙ্গতিবিধানকে সব ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকতার মাপকাঠি বলে ধরা সম্ভব হবে না। যে সমাজের সংগঠন ত্রুটিহীন এবং আদর্শপ্রকৃতির সে সমাজের মঙ্গল ও অগ্রগতির প্রচেষ্টা ব্যক্তির আচরণের স্বাভাবিকতার পরিচায়ক হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আদর্শ সামাজিক সংগঠন বলতে কোন্ সংগঠনকে বোঝায় তার কোনও স্পষ্ট উত্তর কোনও সমাজবিজ্ঞানীই এখনও দিতে পারেন নি।

৬। স্বাভাবিকতার মান: আদর্শ মানব-আচরণ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে স্বাভাবিকতার কোন সীমাবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারিত করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধান, ব্যক্তিসত্তার পূর্ণবিকাশন, সামাজিক সঙ্গতিবিধান ইত্যাদি যে মাপকাঠিগুলি আমরা আচরণের স্বাভাবিকতার নির্ধারণে ব্যবহার করে থাকি সেগুলির কোনটিই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের দিক দিয়ে ব্যক্তির কোন্ আচরণ আদর্শ স্তরের হবে তা যেমন বলা যায় না তেমনই সামাজিক সঙ্গতিবিধানের দিক দিয়ে কোন্ সামাজিক সংগঠনকে ত্রুটিহীন বলে ধরে নেওয়া হবে তাও সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আবার ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশনকে স্বাভাবিকতার মান বলে ধরে নিলে সামাজিক মঙ্গল ও অগ্রগতির দিক দিয়ে সেটি কতটা সঙ্কুচিত হবে তাও বলা যায় না। অথচ এই ধারণাগুলিই যে মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে ব্যক্তির আচরণের স্বাভাবিকতা নির্ধারিত করে থাকে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অতএব স্বাভাবিকতার মান নির্ণয়ে উপরের ধারণাগুলিকে এক সঙ্গে সংগ্রথিত করে আমরা স্বাভাবিকতার একটি সংজ্ঞা গঠন করতে পারি।

স্বাভাবিক আচরণ বলতে বোঝাবে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার পূর্ণবিকাশন

পরিবেশের উপযোগী সার্থক সক্রিয়তা এবং নিজের সমাজের মঙ্গল ও অগ্রগতির পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

এই ধরনের একটি ব্যাপকধর্মী মানছাড়া স্বাভাবিকতার প্রকৃত ও বাস্তব মাপকাঠি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। উপরের স্বাভাবিকতার মানের মধ্যে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনযাপনের তিনটি প্রধান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল, প্রথম তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বিকাশের দিক, দ্বিতীয়, তার নিকট ও দূর পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধানের দিক এবং তৃতীয়, সে যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের মঙ্গল ও অগ্রগতির দিক। এই তিনটি দিক নিলে ব্যক্তির সমগ্র সত্তাটি মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হল এবং যে ব্যক্তির আচরণ এই তিনটি দিকের বিচারে কার্যকরী এবং যথেষ্ট, সে ব্যক্তির আচরণকে আমরা স্বাভাবিক বলে বিবেচনা করব। আর যে ব্যক্তির আচরণ এই তিন দিকের কোন একটি বা একের বেশী দিক দিয়ে অনুপযোগী এবং অক্ষম, তার আচরণকে আমরা অস্বাভাবিক বলে মনে করব। স্বাভাবিক আচরণের যে ব্যাপকধর্মী মানটি উপরে দেওয়া হল তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সুষ্ঠু সঙ্গতি-বিধান, ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়ন, ব্যক্তিগত সুপরিণতি, পূর্ণবিকাশন, সামাজিক যোগ্যতা, গোষ্ঠিগত কর্তব্যপালন, স্বাধীনতার ব্যবহার ইত্যাদি। আবার অস্বাভাবিক আচরণ বলতে বোঝায় অনুপযোগী সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টা, ব্যক্তিসত্তার সুসংহত সমন্বয়নের অভাব, ব্যক্তিগত অপরিণতি, সহজাত সম্ভাবনার অপূর্ণ বিকাশ, সংশয়, ব্যর্থতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অসামাজিক মনোভাব, অপরাধ-পরায়ণতা, সমাজবিরোধী কর্ম-তৎপরতা, নেশায় আসক্তি, মানসিক ব্যাধি, যৌনমূলক অপরাধ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য অস্বাভাবিক আচরণ মাত্রেই কোন না কোন প্রকারের সঙ্গতিবিধানের অভাব থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে এবং সামাজিক, মনোবৈজ্ঞানিক, জীবতত্ত্বমূলক প্রভৃতি যে কোনও দিক দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের এই অভাব বা অসম্পূর্ণতা দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন :

1. Describe the different norms of normality. Which one do you consider the most acceptable ?

আট

অস্বাভাবিক আচরণের কারণ

(Causes of Abnormal Behaviour)

অস্বাভাবিক আচরণের প্রকৃতি যেমন বহুপ্রকারের হতে পারে তেমনই তার কারণও বহু বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। তবে সেই কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করে আমরা দুটি ব্যাপক শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা—

১। **বিকাশমূলক দোষ (Developmental Defects)**

২। **পরিবেশঘটিত চাপ (Environmental Stress)**

প্রত্যেক মানুষই বংশধারা এবং পরিবেশের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলবিশেষ। বংশধারা বলতে বোঝায় যে সব সম্ভাবনা, বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা এবং প্রকৃতিগত শক্তি নিয়ে ব্যক্তি জন্মায় সেইগুলিকে। পরিবেশ বলতে বোঝায় নানা প্রকৃতির শক্তি যেগুলি ব্যক্তির জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই তার উপর সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির আচরণ, মনোভাব, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতির স্বরূপ নির্ধারিত করে। পরিণত জীবনে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বলতে যা বোঝায় তা গঠিত হয় এই আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দুধরনের শক্তিপুঞ্জের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে। এই দুধরনের শক্তির কোনোটির প্রতিক্রিয়া যদি ব্যক্তির সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিপন্থী হয় তাহলে তা ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে। আর এই বিভিন্ন শক্তিগুলি যদি ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনযাপনের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সুষম সামঞ্জস্য রেখে চলে তাহলে ব্যক্তির আচরণও স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। এককথায় ব্যক্তির উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি কোনও ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা দেখা দেয় তাহলেই ব্যক্তির আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। বংশধারা থেকে সঞ্জাত ত্রুটিগুলিকে আমরা মোটামুটিভাবে বিকাশমূলক দোষ বলে বর্ণনা করতে পারি। তার কারণ হল যে ব্যক্তির বিভিন্নমুখী বিকাশ-প্রক্রিয়া মূলত তার বংশধারার প্রকৃতি ও সংগঠনের উপর নির্ভরশীল। এই বংশধারার মধ্যে যদি কোনও দোষ বা অসম্পূর্ণতা থাকে তাহলে তার বিকাশমূলক প্রক্রিয়াগুলিও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তবে বিকাশমূলক দোষগুলিকে নিছক বংশধারার দোষ থেকে সঞ্জাত বলে মনে করলে ভুল হবে। ব্যক্তির বিকাশ-

প্রক্রিয়াগুলি তার বংশধারার উপর প্রধানত নির্ভরশীল হলেও পরিবেশের ভূমিকাও তাদের ক্ষেত্রে মোটেই কম নয়। বিকাশপ্রক্রিয়া মাত্রেই ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ উপাদান এবং পারিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে বংশধারার প্রভাব ও ভূমিকা বিকাশপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

তেমনই, পরিবেশজাত অসম্পূর্ণতা বা দোষগুলিকে আমরা পারিবেশিক চাপ বলে বর্ণনা করতে পারি। পরিবেশ বলতে বোঝায় বিভিন্নধর্মী কতকগুলি শক্তি। এই শক্তিগুলির কিছু কিছু ব্যক্তির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হলেও এমন বহু শক্তি আছে যেগুলি ব্যক্তির প্রতিকূলধর্মী এমন কি বিশেষভাবেই শত্রুভাবাপন্ন। এই প্রতিকূল পারিবেশিক শক্তিগুলি প্রতিনিয়তই ব্যক্তির উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করছে এবং ব্যক্তিকে সেই প্রভাবের উপযোগী আচরণ সম্পন্ন করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে। এই প্রতিকূল শক্তিগুলির চাপ যখন ব্যক্তির সাধারণ সহনশীলতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তার মধ্যে মনোবিকারমূলক লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির চাপ, নাগরিক জীবনে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার চাপ, সমাজ সংগঠনের ক্রমবর্ধমান জটিলতার চাপ প্রভৃতি যখন তাদের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। পারিবেশিক চাপগুলিকেও আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—জীবতত্ত্ব-মূলক, মনোবিজ্ঞানমূলক এবং সমাজতত্ত্বমূলক। এই তিন ধরনের চাপের ফলেই ব্যক্তির মধ্যে মনোবিকার দেখা দিতে পারে।

বিকাশমূলক দোষ (Developmental Defects)

মানুষ মাত্রেই কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ প্রক্রিয়ার পরিণতি। শিশু জন্মাবার মুহূর্ত থেকেই আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে মায়ের গর্ভে পিতৃকোষ-মাতৃকোষের মিলনের মুহূর্ত থেকেই শিশুর বহুমুখী বিকাশ প্রক্রিয়ার কাজ সুরু হয়। পূর্ণদেহ মানুষ এই বিভিন্ন বিকাশ প্রক্রিয়াগুলির পরিণতি থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। এই বিকাশ প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যদি দোষ বা অসম্পূর্ণতা থেকে যায় তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তাও ত্রুটিপূর্ণ ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শিশুর বিভিন্ন বিকাশ প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে আমরা বিকাশমূলক দোষগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

(ক) জীবতত্ত্বমূলক বিকাশের ত্রুটি
(Defect in Biological Development)

(খ) মনোবিজ্ঞানমূলক বিকাশের ত্রুটি
(Defect in Psychological Development)

(গ) সামাজিক বিকাশের ত্রুটি (Defect in Social Development)

এই তিন শ্রেণীর বিকাশ প্রক্রিয়া শিশুর বংশধারা এবং পরিবেশ দুয়ের উপরই সমানভাবে নির্ভরশীল। বিকাশ প্রক্রিয়াগুলির উপাদানরূপে কাজ করে শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া নানা বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা, মানসিক সংগঠন এবং বহু বিভিন্নধর্মী শক্তি ও দক্ষতা। শিশুর চারপাশের বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তিগুলি এই সহজাত উপাদানগুলির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে এবং দুয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে শিশুর বিকাশমূলক প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ ও গতিপথ নির্ধারিত হয়। এই বিকাশ প্রক্রিয়াগুলির অগ্রগতির পথে কোথাও যদি কোন ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা বা প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে সেই অগ্রগতি ব্যাহত হয় এমন কি রুদ্ধ হয়ে যেতেও পারে। ফলে শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তার গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়।

ক। জীবতত্ত্বমূলক বিকাশের ত্রুটি

জীবতত্ত্বমূলক বিকাশের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে নানাপ্রকার মানসিক রোগ সৃষ্ট হয়ে থাকে। মোঙ্গলিজম্ (Mongolism), টার্নার্স সিন্‌ড্রোম্ (Turner's Syndrome) এবং সিজোফ্রেনিয়া, প্যারানইয়া প্রভৃতি আচরণমূলক মনোবিকারের ক্ষেত্রে বংশধারাগত ত্রুটিকেই সাধারণত কারণরূপে ধরা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে বংশধারাগত ত্রুটিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর না হলেও বংশগত ত্রুটি থেকে যে নানাপ্রকার অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হতে পারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বংশধারার ত্রুটির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে বংশধারার রহস্য কিছুটা জানা দরকার।

মায়ের গর্ভে মায়ের একটি কোষ এবং পিতার একটি কোষের মিলনে শিশুর জন্ম হয়। এই দুটি কোষ এক সংগে মিলে একটি কোষে পরিণত হয়। তারপর সেই কোষটি কোষ-বিভাজন নামক একটি অদ্ভুত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে দুটি, পরে চারটি, পরে আটটি, পরে ষোলটি এইভাবে বাড়তে বাড়তে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষের সমষ্টিতে পরিণত হয়। এই

কোষের সমষ্টিই শিশুর দেহ গঠন করে। প্রথম যে কোষটি থেকে শিশুর জন্ম স্বরু হয় সেই কোষটিতে থাকে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ২৩টি ক্রোমোজোম (Chromosome) এবং বাবার কাছ থেকে পাওয়া ২৩টি ক্রোমোজোম, মোট ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম। এর মধ্যে ২২ জোড়া ক্রোমোজোমকে বলা হয় অটোজোমস্ (Autosomes) এই ২২ জোড়া ক্রোমোজোমই শিশুর দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। আর শেষ বা ২৩ নম্বর জোড়াটিকে বলা হয় যৌন ক্রোমোজোম (Sex chromosome)। এই জোড়াটি শিশুর যৌনতা অর্থাৎ শিশু ছেলে হবে কিং মেয়ে হবে তা নির্ধারিত করে। মেয়ে সন্তানের বেলায় এই ক্রোমোজোম জোড়ার (একটি মায়ের কাছ থেকে আর একটি বাবার কাছ থেকে পাওয়া) দুটিই একটু বৃহৎ আকারের ক্রোমোজোম— এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে X ক্রোমোজোম। আর ছেলে সন্তানের বেলায় এই ক্রোমোজোম জোড়ার মধ্যে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ক্রোমোজোমটি X ক্রোমোজোমই, কিন্তু বাবার কাছ থেকে পাওয়া ক্রোমোজোমটি অন্য প্রকৃতির ক্রোমোজোম, তার নাম দেওয়া হয়েছে Y ক্রোমোজোম। এককথায় মেয়ে সন্তানের বেলায় ২৩ নম্বর ক্রোমোজোম জোড়ায় থাকে XX ক্রোমোজোম, আর ছেলের বেলায় XY ক্রোমোজোম।

ক্রোমোজোমের ক্রটিজাত অস্বাভাবিকতা

জননবিজ্ঞানের (Genetics) উপর আধুনিক গবেষণা থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে উপরে ক্রোমোজোমের যে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং সংগঠনের বর্ণনা করা হল তার মধ্যে যদি কোনও রকম পার্থক্য বা বৈষম্য দেখা যায় তাহলে শিশুর মধ্যে নানা ধরনের অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে, যে ক্রোমোজোমের কোনও জোড়ার জায়গায় যদি দুটির পরিবর্তে তিনটি ক্রোমোজোম থাকে তাহলে মোঙ্গলিজম্ নামক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। দুটি ক্রোমোজোমের জায়গায় তিনটি ক্রোমোজোম থাকার নাম দেওয়া হয়েছে ট্রাইজোমি (Trisomy)। মোঙ্গলিজম্ রোগে মানসিক পরিণতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং শিশুর মুখ চ্যাপ্টা হয় এবং চোখের দৃষ্টি ট্যারা হয়। মোঙ্গল নামক মানবজাতির সঙ্গে চেহারার বাহ্যিক মিল থেকে এই রোগের নাম দেওয়া হয় মোঙ্গলিজম্। তেমনই, টার্নার্স সিনড্রোম নামক আর এক ধরনের অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ২টির জায়গায় ৬টি যৌন ক্রোমোজোম থাকলে এই রোগ

হয়ে থাকে। এই রোগে চেহারা খর্বাকার এবং ঘাড় কাঁধের সঙ্গে জোড়া হয় এবং যৌন পরিণতি শৈশবকালীন স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। যে সব অস্বাভাবিকতা যৌন-ক্রটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলির সবই যৌন ক্রোমোজোমের কোন না কোন রকমের দোষ বা অসঙ্গতি থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। মেয়েদের বেলায় যৌন ক্রোমোজোমের দোষ কম হয়। তার কারণ হল মেয়েদের দুটি যৌন ক্রোমোজোমই X ক্রোমোজোম। সেজন্য একটার মধ্যে দোষ থাকলে অপরটি তার সংশোধন করে নেয়। কিন্তু ছেলেদের যৌন ক্রোমোজোমের একটি X ক্রোমোজোম, অপরটি Y ক্রোমোজোম। ফলে একটি যদি ক্রটিপূর্ণ হয় তার দোষ অপরটি শোধরাতে পারে না এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে যৌনমূলক অসঙ্গতি দেখা দেবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

ক্রোমোজোমগত ক্রটি বা অসঙ্গতি থেকে মানসিক অস্বাভাবিকতা যত না সৃষ্টি হয় তার চেয়ে বেশী হয় শারীরিক অস্বাভাবিকতা। ক্রোমোজোমের গঠন এবং কার্যকারিতার রহস্য সম্বন্ধে এখনও বিশদ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় নি। ফলে কোন্ ধরনের অসঙ্গতি থেকে কোন্ প্রকৃতির ক্রটি বা দোষ দেখা দেয় তা এখনও নির্ভুলভাবে জানা যায় নি। তবে একথা সত্য যে ক্রোমোজোমের সংগঠন বা বিন্যাসে যদি গুরুতর কোনও বৈষম্য থাকে তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গর্ভাবস্থাতেই বা ভূমিষ্ঠ হবার পরেই শিশুর মৃত্যু হয়।

জিনের ক্রটিজাত অস্বাভাবিকতা

ক্রোমোজোমের গঠন, সংখ্যা এবং বিন্যাসে ক্রটি থাকলে যেমন মানসিক এবং দৈহিক অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে, তেমনই ক্রোমোজোমের অভ্যন্তরস্থ জিনের (gene) মধ্যে কোন দোষ থাকলেও শিশুর মধ্যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হতে পারে। একটি ক্রোমোজোমকে ইলেক্ট্রোন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করলে যে পরমাণুগুলি পাওয়া যায় সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে জিন। এক একটি জিন দেখতে একটি ঘোরানো বা ভাঁজ খাওয়া সিঁড়ির মত। এক একটি ঘোরানো ভাঁজের মধ্যে দশটা করে সিঁড়ির ধাপ (rung) থাকে। প্রত্যেকটি জিন আবার তৈরী ডিঅক্সি-রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (deoxyribonucleic acid) নামে একটি পদার্থ দিয়ে। এটিকে সংক্ষেপে DNA বলা হয়। এই DNA'র মধ্যে প্রাণীর অস্তিত্বের সমস্ত মূলবস্তুগুলি নিহিত থাকে। আগেই বলেছি এই DNA পরমাণুর আকৃতি একটি ঘোরানো বা ভাঁজ-খাওয়া সিঁড়ির মত। সিঁড়ির দুপাশটা তৈরী হয়েছে শর্করা এবং ফসফেট দিয়ে তৈরী চেন বা শৃঙ্খল দিয়ে। শর্করা এবং ফসফেট

সাজানো থাকে পর্যায়ক্রমে। দুপাশের চেন বা শৃঙ্খলের যেখানে যেখানে শর্করা থাকে সেখান থেকে বেরিয়েছে সিঁড়ির ধাপগুলি। এই ধাপগুলি আবার তৈরী হয়েছে চারটি মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে—এ্যাডেনাইন (adenine), থিমাইন (thymine), গুয়ানাইন (guanine) এবং সিষ্টোসাইন (cystosine)। এই রাসায়নিক বস্তুগুলি আবার এক একটি ধাপে থাকে জোড়া বেঁধে, যেমন এ্যাডেনাইন-থিমাইন বা থিমাইন-এ্যাডেনাইন বা গুয়ানাইন-সিষ্টোসাইন বা সিষ্টোসাইন-গুয়ানাইন। শিশুর বংশধারার সমস্ত রহস্য নির্ভর করছে এই বিশেষধর্মী ধাপগুলির সাজানো বা বিন্যাসের উপর। বংশধারাগত সমস্ত নির্দেশই অর্থাৎ শিশুর আকৃতি, চোখের রঙ, গায়ের রঙ, চুলের প্রকৃতি, মনঃপ্রকৃতি, বুদ্ধি, উচ্চতা ইত্যাদি কি হবে তা এই ধাপগুলির বিন্যাস বা সাজানোর ভিতর নিহিত থাকে। যদি এমন কোন দিন আসে যখন DNAর অভ্যন্তরস্থ বংশধারা-নির্দেশের এই গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার মানুষ পুরোপুরি করতে পারে তাহলে মানবের জন্মরহস্য সম্পূর্ণভাবে মানুষের করতলগত হয়ে উঠবে।

কেবল তাই নয়, পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী DNA ও ঐ চারটি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। এই তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী—ক্ষুদ্র কীট থেকে স্বরু করে বিজ্ঞতম মানুষের মধ্যেও একটি মৌলিক একতা বিদ্যমান। একটি বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শরীর ও মনের দিক দিয়ে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। তার কারণ হল যে সেখানে পূর্বপুরুষ এবং তাদের বংশধরদের DNA'র আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের মধ্যে অধিকতর মিল বর্তমান থাকে।

এই DNAর মধ্যে যে নির্দেশলিপি নিহিত থাকে তার কাজ দুটি—প্রথম, ঠিক অবিকল নিজের নকল করে নিজের প্রতিকৃতির সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া, আর দ্বিতীয়, প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে প্রোটিন তৈরী থেকে স্বরু করে অন্যান্য বৃদ্ধিমূলক কাজ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া। এই দুটি কাজের জন্যই DNAটির সিঁড়ির মতন সংগঠনটি মাঝখান থেকে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি টুকরো আবার একটি করে পুরো সিঁড়িতে পরিণত হয়।

DNA'র মধ্যে বংশধারার যে নির্দেশলিপি নিহিত থাকে যদি কোনও কারণে সেই নির্দেশের মধ্যে কোনও গলদ থাকে বা যদি সেই নির্দেশের কোনও অংশ অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে কোষের সৃষ্টিমূলক এবং বৃদ্ধিমূলক উভয় কাজই ব্যাহত হয়। DNA'র নির্দেশ যদি কোষগুলি ঠিক মত বুঝতে এবং অনুসরণ করতে পারে

তাহলে ব্যক্তির বিকাশ এবং বৃদ্ধিতে কোনও ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় না। কিন্তু কোন কারণে যদি এই নির্দেশ কোষগুলির কাছে তুর্বোধ্য হয় বা নির্দেশের প্রকৃতি বা অর্থ তারা গোলমাল করে ফেলে তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়।

এই জিনের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি, সংগঠন এবং উপাদানের মধ্যে যদি কোনও দোষ বা অসম্পূর্ণতা থাকে তাহলে তাকে জিন বিকৃতি (gene mutation) বলা হয় এবং এই ধরনের জিনকে বিকৃত জিন (mutant gene) নাম দেওয়া হয়। জিন বিকৃতি তুভাবে ঘটে থাকে। এক স্বাভাবিকভাবে, আর তুই, পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে জাত আয়নধর্মী বিকীরণের ফলে। আধুনিক জননবিজ্ঞানীদের মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ জিন থাকে তার যে কোনটিরই ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই ঈষৎ পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য এই সম্ভাবনা ১০ হাজারে ১টি থেকে সুরু করে আড়াই লক্ষে ১টি। এত দূরগত সম্ভাবনা হলেও এই স্বাভাবিক জিন বিকৃতির ক্ষেত্র প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন, স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৫০,০০০ যৌন কোষের মধ্যে একটিতে এমন এক ধরনের বিকৃত জিন থাকে যার ফলে শিশুদের মধ্যে রেটিনোব্লাসটোমা (retinoblastoma) নামে এক প্রকারের চোখের ক্যানসার দেখা দেয়। এই ধরনের স্বাভাবিক জিন বিকৃতি কোন বাহ্যিক কারণ থেকে ঘটে না, সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রসূতভাবেই দেখা দেয়। কৃত্রিম জিন-বিকৃতি আয়নধর্মী রশ্মি বিকীরণের ফলে ঘটে থাকে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের সময় আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি কয়েকটি রশ্মির বিকীরণ হয় এবং এগুলি মানবদেহের কোষের অভ্যন্তরস্থ জিনের সংগঠন বা প্রকৃতিকে নানাভাবে বিকৃত করে তোলে। তার ফলে সেই ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে নানারকম শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি, অসম্পূর্ণতা ও দোষ দেখা দেয়। ১৯৬২ সাল থেকে পৃথিবীতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের যে সব পরীক্ষণ হয়েছে তার ফলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে গুরুতর বিকৃতি দেখা দেবে বলে মনে করা হয়। পলিং (Pauling)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমস্ত পৃথিবীতে আগামী বংশধরদের মধ্যে ৮০ হাজার থেকে ১৮০ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে আয়ন বিকীরণের ফলে বিকৃতি দেখা দেবে।

বিকৃত জিন থেকে নানা রকমের আভ্যন্তরীণ অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই এই সব অস্বাভাবিকতার সঙ্গে মানসিক ব্যাহতি বা উনমানসিকতা যুক্ত থাকে। জিন বিকৃতি থেকে যে সব অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তার মধ্যে ফেনিলকেটোনুরিয়া (Phenylketonuria) বা PKU নামক অস্বাভাবিকতা

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। DNA'র মধ্যে যখন বিশেষ একটি এনজাইম কম থাকে তখন এই রোগ দেখা দেয়। জিনের এই সংগঠনগত দোষ যদি যথাসময়ে ধরা না যায় এবং উপযুক্ত খাদ্যনিয়ন্ত্রণের দ্বারা তার চিকিৎসা না করা হয় তাহলে ফেনিলালাইন নামে একটি বিষাক্ত এ্যাসিড রক্তের মধ্যে তৈরী হয় এবং মস্তিষ্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। এই বিশেষ জিন বিকৃতির সম্ভাবনাটি প্রতি ৭০ জনের মধ্যে ১ জনের থাকে বলে জননবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। হানটিংটন্‌স্ কোরিয়া (Huntington's Chorea) নামে রোগটিও জিন বিকৃতির জন্য ঘটে থাকে বলে মনে করা হয়।

বিভিন্ন পরিবারের কুলপঞ্জী বিশ্লেষণ এবং যমজ সন্তানের পর্যবেক্ষণ থেকে মানসিক ব্যাধির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আহরণ করা গেছে। কুখ্যাত কালিকাক (Kallikaks) এবং ইয়ুকস (Jukes) পরিবারের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মানসিক ব্যাধি পরিবারের এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে সঞ্চালিত হয়। এই থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে মানসিক রোগ বা অসম্পূর্ণতা জননকোষের মধ্যে দিয়ে পিতামাতার কাছ থেকে সন্তানসন্ততিতে সঞ্চালিত হয়। এই সিদ্ধান্তটিকে ভিত্তি করে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মানসিক ব্যাধি উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চালিত হয় কিনা নির্ণয় করার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণগুলিতে কোনও বিশেষ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে বংশধরা-সূত্রে আবদ্ধ এমন আত্মীয়দের মধ্যে ঐ রোগ কি পরিমাণে দেখা যায় তারই মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। কলম্যানের (Kallmann) একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে সিজোফ্রেনিয়া নামক রোগের ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বিভিন্ন আত্মীয়দের মধ্যে বিভিন্ন হারে ঐ রোগ দেখা যায়। সিজোফ্রেনিয়া রোগীর অভিন্ন যমজ-ভাইবোনদের মধ্যে ৮৬·২%, সাধারণ যমজ ভাইবোনদের মধ্যে ১৪·৫%, সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে ১৪·২%, গোষ্ঠিগত ভাইবোনদের মধ্যে ৭·১% ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ রোগ দেখা দিতে পারে। সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে এই রোগ ·৮৫% ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়। অতএব এই পরীক্ষণ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে সিজোফ্রেনিয়া রোগীর সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ রোগ হবার সম্ভাবনা বেশ উল্লেখযোগ্য এবং যত রক্তের সম্বন্ধ নিকটতর হবে ততই ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়ে উঠবে। এককথায় কলম্যানের মতে সিজোফ্রেনিয়া রোগ জিনের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

কিন্তু পরিবার ইতিহাস বা যমজসন্তানের পর্যবেক্ষণের ফলাফল সম্পূর্ণভাবে

নির্ভরযোগ্য বলে ধরা যায় না। তার প্রথম কারণ হল যে এই সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর পরিবেশের বৈষম্যজনিত প্রভাবের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। তাছাড়া যে সব মানসিক রোগকে আচরণগত বিকার বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে সেগুলির ক্ষেত্রে এইরকম বংশধারাভিত্তিক সঞ্চালনের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেই জন্য সেই সব ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বংশধারার মাধ্যমে কোন রোগ সম্পূর্ণ সঞ্চালিত হয় একথা না বলে বংশধরদের মধ্যে জনকজননীর রোগের প্রবণতা সঞ্চালিত হয় এই কথাই বলে থাকেন।

দেহপ্রকৃতিগত ত্রুটি (Constitutional Defects)

জীবতত্ত্বমূলক বিকাশের ত্রুটির মধ্যে আমরা বিভিন্ন দেহপ্রকৃতিমূলক ত্রুটিগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। বিভিন্ন ব্যক্তির দেহপ্রকৃতি বিভিন্ন এবং তার আচার ব্যবহার, অভ্যাস, বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিক্রিয়া অনেকাংশে তার এই দেহপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। দেহপ্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বহু শ্রেণীবিভাগ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এই ধরনের দেহপ্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগকে ব্যক্তিসত্তার টাইপ (type) বলা হয়। প্রচলিত টাইপ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ক্রেৎসমারের পিকনিক-এস্থেনিক-এথলেটিক, সেলডনের এণ্ডোমর্ফিক-মেসোমর্ফিক-এক্টোমর্ফিক, ইউঙের এক্স্ট্রোভার্ট-ইন্ট্রোভার্ট প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সেলডন তিন ধরনের টাইপে সমস্ত মানবজাতিকে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে এই তিন ধরনের মৌলিক দেহপ্রকৃতির সমান্তরালভাবে আছে বিশেষ তিন ধরনের মনঃপ্রকৃতি। যখন এই তিন বিভিন্ন দেহপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তখনও তা তিনটি বিশেষ ধরনের মানসিক বিকারের রূপ গ্রহণ করে। যেমন, প্রথম টাইপ এণ্ডোমর্ফিকদের দৈহিক সংগঠন হল গোলগাল ও নরম প্রকৃতির, আর তারা মনঃপ্রকৃতির দিক দিয়ে আরামপ্রিয় প্রক্ষোভধর্মী ও সঙ্গকামী। এদের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে তা ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ মনোবিকারের রূপ নেবে। দ্বিতীয় টাইপ মেসোমর্ফিকদের দেহ হল শক্ত ও মাংসপেশীবহুল আর মনঃপ্রকৃতির দিক দিয়ে তারা কর্মঠ, উদ্যমশীল এবং আক্রমণধর্মী। এদের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে তা ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের রূপ নেবে। তৃতীয় টাইপ এক্টোমর্ফিকদের দেহ হল কৃশ এবং দুর্বল, আর মনঃপ্রকৃতির দিক দিয়ে তারা হল অতিরিক্ত কর্মঠ, অনুভূতিপ্রবণ, চিন্তাশীল এবং নিঃসঙ্গতাপ্রিয়।

এদের মধ্যে যখন অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তা তখন সিজোফ্রেনিয়ায় পরিণত হয়। সেলডনের আবিষ্কৃত দেহপ্রকৃতির সঙ্গে মানসিক অস্বাভাবিকতার এই সম্পর্ক নিয়ে অনেক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এই সব পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে মোটামুটিভাবে সেলডনের তত্ত্বটিই প্রমাণিত হয়েছে। এই সব পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে যে সব ছেলেমেয়ের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক পর্যায়ের হয় এবং শরীরের টিস্থ, মাংসপেশী প্রভৃতির গঠন ভালভাবে সম্পন্ন হয় তাদের মধ্যে অপসঙ্গতি কম দেখা যায় এবং তাদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা দেবার সম্ভাবনা কম থাকে। অপরপক্ষে যে সব ছেলেমেয়ের শারীরিক বৃদ্ধি কোনও দিক দিয়ে ব্যাহত হয়েছে এবং দেহের গঠন ক্ষীণ বা কৃশপ্রকৃতির এবং শরীরের টিস্থ ও মাংসপেশীগুলি যদি ঠিকমত বিকাশপ্রাপ্ত না হয় তাহলে তাদের সঙ্গতিবিধানে বাধা দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা দেবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে।

শরীরতত্ত্বমূলক ত্রুটি (Physiological Defects)

মানুষের শরীরে এমন কতকগুলি শরীরতত্ত্বমূলক যন্ত্রপাতি আছে যেগুলির মধ্যে যদি কোন ত্রুটি বা অসঙ্গতি দেখা দেয় তাহলে ব্যক্তির মধ্যে নানা ধরনের মানসিক অসুস্থতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, গ্রন্থি, শ্বাসপ্রণালী, স্নায়ুমণ্ডলী প্রভৃতির মধ্যে যদি কোনও দোষ থাকে তাহলে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের কাজে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেবে এবং তার ফলে তার মধ্যে মানসিক বিকার সৃষ্টি হতে পারে। শরীরতত্ত্বমূলক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তির শারীরিক উদ্যমশীলতার স্তর, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ, কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যকারিতা ইত্যাদি।

বিভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক সক্রিয়তা ও উদ্যমশীলতার স্তর বিভিন্ন হতে পারে। যে সব ব্যক্তির সক্রিয়তা ও উদ্যমশীলতার স্তর যথেষ্ট উঁচু তারা তাদের উত্তেজনাকে অভিব্যক্ত করে তাদের স্নায়ু ও মাংসপেশীর সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে। আর যাদের সক্রিয়তা ও উদ্যমশীলতার স্তর নীচু তারা তাদের উত্তেজনাকে অভিব্যক্ত করে তাদের চিন্তা, কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। অতএব পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে ব্যক্তির সক্রিয়তা ও উদ্যমশীলতার স্তরের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গতিবিধানের মাত্রা, প্রকৃতি ও পন্থা সবই নিরূপিত হয় তার এই উদ্যমশীলতার স্তরের দ্বারা। এই স্তরের সংগঠন ও প্রকৃতিতে যদি কোনও

ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা থাকে তাহলে তা তার মধ্যে মানসিক ও শারীরিক অস্বাভাবিকতা ও অসঙ্গতির সৃষ্টি করে।

তেমনই ব্যক্তির স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়াও তার সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ হল ব্যক্তির প্রক্ষোভমূলক অভিব্যক্তির প্রকৃতি ও মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করা। যদি এই স্বয়ংক্রিয়ামূলক প্রতিক্রিয়াগুলি যথাযথ বিকাশপ্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ যদি সেগুলি মাত্রার দিক দিয়ে খুব কম বা খুব বেশী হয় তাহলে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এবং তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। স্বয়ংক্রিয়ামূলক প্রতিক্রিয়ার মাত্রা বেশী হলে ব্যক্তি সহজেই প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে অতিরিক্ত আবেগ-প্রবণতা দেখা দেয়। আর যদি এই প্রতিক্রিয়া স্বল্প মাত্রার হয় তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অনুভূতির দৈন্য বা অভাব দেখা দেয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির পক্ষে সুষ্ঠু ও সুষম সঙ্গতিবিধান করা শক্ত হয়ে ওঠে। কার্যকরী এবং সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের জন্য প্রয়োজন অনুভূতির সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিব্যক্তি এবং আবেগ ও প্রক্ষোভের সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া। যেখানেই প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত মাত্রার চেয়ে কম বা বেশী হয় সেখানেই সঙ্গতিবিধান বৈষম্যমূলক, দুর্বল এবং অসার্থক হয়ে ওঠে। প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া যদি স্বল্পমাত্রার হয় তাহলে শিশুর প্রয়োজনীয় অনুবর্তনগুলি দুর্বল হয়ে গড়ে ওঠে। প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি কম থাকলে শিশুর অনুবর্তন-প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণগুলি তাড়াতাড়ি এবং স্থায়ীভাবে গঠিত হয় না। তার ফলে তার মধ্যে সামাজিক আচরণ ও মনোভাব ঠিকমত গড়ে ওঠে না এবং শিশুর সমাজবিরোধী কাজের দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। কালক্রমে তার মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-প্রবণতার সৃষ্টি হয় এবং আত্মসংযমের অভাব দেখা দেয়।

শরীরতত্ত্বমূলক আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে। সেটি হল শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গ্রন্থিগুলির রসনিঃসরণের প্রকৃতি ও মাত্রা। শিশুর দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বিকাশ, নানা ব্যাধির জীবাণুদের আক্রমণ থেকে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখা এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন কাজের সুষ্ঠু সম্পাদন এই গ্রন্থিরসগুলির উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে যে বিভিন্ন গ্রন্থিরসের অত্যধিক বা স্বল্পমাত্রায় নিঃসরণ উভয়েই শরীরের স্বাভাবিক বিকাশ ও সংরক্ষণের পরিপন্থী। গ্রন্থিরসের নিঃসরণ যদি যথাযথ না হয় তাহলে শরীরের পক্ষে উপকারী এবং অপরিহার্য এনজাইম নামক রসগুলি

প্রয়োজনমত তৈরী হয় না এবং তার ফলে শরীরের সংরক্ষণপ্রক্রিয়া ত ব্যাহত হয়ই এমন কি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজগুলিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। ব্যক্তি যখন কোনও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন তাকে বহুমুখী মনোবিজ্ঞানমূলক চাপের অধীনস্থ হতে হয় এবং সে সময় যদি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ঠিকমত সম্পন্ন না হয় তাহলে তার পক্ষে সেই সব চাপ সহ্য করে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করা শক্ত হয়ে ওঠে।

এছাড়া আরও অনেক প্রকার শরীরতত্ত্বমূলক ঘটনা আছে যেগুলি ব্যক্তির স্বাভাবিক আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শরীরের প্রতিরোধমূলক শক্তি, অনুভূতিপ্রবণতা, বিভিন্ন সহজাত শক্তি ও দক্ষতার প্রকৃতি ইত্যাদি। এগুলির বৈষম্যের উপরও ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের স্বরূপ ও কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে।

এই শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত বংশধারাগত হলেও এগুলির বিকাশ ও প্রকৃতি নির্ধারণে পরিবেশের ভূমিকাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। গর্ভাবস্থায় এবং জন্মের পর নানা পারিবেশিক কারণের প্রভাবে এই শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন ঘটতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশমূলক কারণে শরীরের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠতে পারে। উত্তেজক বস্তু, জীবাণু, আয়নধর্মী বিকীরণ প্রভৃতির প্রভাবে উপরে বর্ণিত শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে দোষ দেখা দিতে পারে এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে খর্ব বা বিকৃতও করে তুলতে পারে।

মনোবিজ্ঞানমূলক বিকাশের ত্রুটি

(Defects in Psychological Development)

শারীরিক বিকাশের ত্রুটির জন্য যেমন মানসিক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তেমনই দেখা দেয় মনোবিকারমূলক বিকাশের ত্রুটির জন্যও। বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক আচরণ ও আদানপ্রদানের ইতিবৃত্তের মধ্যেও ব্যক্তির অনেক অস্বাভাবিকতার কারণ নিহিত থাকতে পারে। কেবলমাত্র ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার মৌলিক সংগঠনটিই মনোবিজ্ঞানমূলক কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয় যে তা নয়, শারীরিক ও কৃষ্টিগত বস্তু বা ঘটনার প্রতি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াও তার মনস্তত্ত্বমূলক সংগঠনের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মাথায় আঘাত

থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা দেবে তা অনেকটা নির্ভর করছে তার ব্যক্তিসত্তার মনোবিজ্ঞানমূলক কারণের উপর।

মনোবিজ্ঞানমূলক কারণ কিন্তু অসংখ্য প্রকারের হতে পারে। সাধারণত সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং একটি আর একটি বা একাধিক কারণের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যক্তির উপর কার্যকরী হয়। সেইজন্য কোনও একটি বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক কারণকে কোনও অস্বাভাবিক আচরণের কারণ বলে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আচরণ ও আদানপ্রদান এবং তার নিজের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের কাহিনী ভাল করে বুঝতে হলে তার জীবনের স্তর পরম্পরাগুলিকে অনুসরণ করাই সবচেয়ে ভাল। সাধারণত মানবজীবনকে সাতটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা, শৈশব, প্রথম বাল্যকাল, শেষ বাল্যকাল, যৌবনাগম, প্রথম বয়স্ক কাল, মধ্য বয়স এবং বার্ধক্য। অবশ্য এই কালবিভাগগুলিকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন সময়স্তর বলে মনে করা ভুল হবে। এগুলি পরস্পরের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ এবং প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ইতিহাসের গঠনে প্রত্যেকটি সময়স্তরেরই অবদান উল্লেখযোগ্য।

শৈশব

শৈশবের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল শিশুর শারীরিক চাহিদার পূরণ। শিশু এই সময় থাকে সম্পূর্ণ অসহায় এবং তার প্রতিটি প্রয়োজনের জন্য সে অপরের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকে। এই পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা থাকে প্রায় দ্বিতীয়-বর্ষের শেষার্ধ পর্যন্ত যে সময় সে সাধারণভাবে চলাফেরা করতে ও অপরকে নিজের ইচ্ছা জানাতে সক্ষম হয়। এর পর থেকেই তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দ্রুত হারে চলতে থাকে। তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্রুত বিকাশ হয়, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা ক্রমশ বিশেষায়িত হতে থাকে, সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে, শরীরের প্রধান প্রধান পেশীগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সৃষ্টি হয়, ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তির পরবর্তী জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে এই সময়টির জটিল প্রকৃতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশবকালে যে সব সমস্যা দেখা দেয় তার অধিকাংশই শিশুকে আদরযত্ন করা এবং খাওয়ান সংক্রান্ত। মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস সৃষ্টি করাও একটি সমস্যার অন্তর্গত কিন্তু এই সমস্যাটি একটু বড় না হলে শিশু তা নিজে উপলব্ধি করে না।

শিশুর জীবনে তার নিজের দেহের বাইরের জগতের সঙ্গে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ হল তার মায়ের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের পরিধি এবং প্রকৃতির উপর গড়ে ওঠে বাইরের পৃথিবী এবং তার নিজের প্রতি তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোভাব। মা তার প্রতি যতটা স্নেহময়, উষ্ণ এবং আন্তরিক মনোভাব দেখাবেন তার বাইরের পৃথিবীর প্রতি আচরণও সেইমত প্রীতিজনক ও তৃপ্তিকর হয়ে উঠবে। অপর পক্ষে যদি মায়ের মনোভাব স্নেহবর্জিত ও রুক্ষ হয়, তারও বাইরের জগতের প্রতি প্রতিক্রিয়া অপ্রীতিকর ও অসন্তোষময় হয়ে উঠবে। ছোট শিশুকে, আদর করা, দু'হাতে ধরা তার সঙ্গে কথা বলা প্রভৃতি আচরণগুলি তার মনে মৌলিক নিরাপত্তার অনুভূতির সৃষ্টি করে থাকে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি বাবা এবং পরিবারের অপরাপর ব্যক্তিরা তার সঙ্গে এই ধরনের স্নেহময় আচরণ করেন তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ আরও সুষম ও সুষ্ঠু হয়ে ওঠে। মায়ের আদরের অভাব অনেক সময় শিশুর দৈহিক বিকাশকেও গুরুতরভাবে ব্যাহত করে তোলে এবং অনেক মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে শৈশবে মাতৃস্নেহের অভাব তাদের মনোবিকৃতির একটা বড় কারণ। এমন কি গর্ভাবস্থায় মায়ের দুশ্চিন্তা বা প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয় শিশুর পরবর্তী জীবনে নিরাপত্তার অভাবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছোট শিশুকে খাওয়ানোও তার প্রক্ষোভমূলক সংগঠনের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিশুর সবচেয়ে বড় শারীরিক প্রয়োজন হল তার ক্ষুধা আর এই ক্ষুধা যদি যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত না হয় তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠনে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে যে খাওয়ার মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র শিশুর ক্ষুধারই তৃপ্তি হয় না! সে চোষা, মুখ নাড়া, খেলা প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়েও প্রচুর আনন্দ লাভ করে। শিশুকে পর্যাপ্তভাবে খাওয়ানো যেমন দরকার, তেমনই দরকার খাওয়ানোর যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে খাওয়ানোর প্রকৃত পদ্ধতি না জানার জন্য শিশু তার খাওয়া থেকে প্রত্যাশিত তৃপ্তি পায় না। তার ফলে শিশুর মনে ব্যর্থতা ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই থেকে শিশুকে খাওয়ানো ঘটিত নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং আরও বড় হলে এই সমস্যাগুলি জটিল আচরণ-সমস্যার রূপ নেয়।

প্রথম বাল্যকাল

দ্বিতীয় বর্ষের শেষার্ধ থেকেই শিশুর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা চলে যেতে থাকে

এবং শিশু চলাফেরা, নিজের প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটান প্রভৃতি কোনও কোনও কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে। এই সময় থেকে শিশুর সামাজিক আচরণও সুরু হয় এবং সে অপরকে নিজের মনোভাব জানাবার চেষ্টা করে। এই সময় থেকেই আবার সে বাইরের সমাজের কর্তৃত্ব এবং শৃঙ্খলা মেনে চলারও দাবী অনুভব করতে সুরু করে। শিশুর ষষ্ঠ বা সপ্তম বর্ষে শৈশব শেষ হয় বলে ধরে নেওয়া হয়।

এই সময় শিশুর উপর পরিবারের প্রভাব সবচেয়ে গভীর ও ব্যাপক। পরিবারের মধ্যে যে মান নির্ধারিত করে দেওয়া হয় সেই মান অনুযায়ীই সে বিভিন্ন সামাজিক কৌশল ও আচরণ শিখে থাকে। পিতামাতার অনুমোদনই তার কাজকর্মের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তিরূপে কাজ করে থাকে এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রধান শক্তিশালী নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে তার মধ্যে যে সব মনোবিজ্ঞানমূলক সমস্যা দেখা দেয় সেগুলিই পরবর্তী জীবনে তার সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। দেখা গেছে যে অস্বাভাবিক আচরণের ক্ষেত্রে যে সব কারণ শিশুর প্রথম শৈশবে আরোপ করা যায় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক, কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলা, যৌনবিকাশ, আক্রমণধর্মিতা ও শত্রুতা, ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং গুরুতর আশাভঙ্গ ও অন্যান্য আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা।

পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক যদি সুসঙ্গত ও আন্তরিক না হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হতে পারে। পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক নানা দিক দিয়ে বিকৃত হতে পারে, যেমন, পরিত্যজন, অতিরিক্ত সংরক্ষণ এবং দাম্পত্যজীবনে অসঙ্গতি বা বিপর্যস্ত গৃহ। এর মধ্যে পিতামাতা কর্তৃক শিশুর পরিত্যজন খুবই গুরুতর একটি কারণ। শিশুর মনে তার নিজের সম্বন্ধে এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধে ধারণা এবং মূল্যায়ন সবই পিতামাতার আচরণের দ্বারাই প্রধানত নির্ধারিত হয়ে থাকে। পিতামাতা যদি শিশুকে অবহেলা করেন এবং তাকে তাদের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেন তাহলে তার মধ্যে নিরাপত্তার অভাব এবং অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং পরবর্তী জীবনে তার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি করে। পিতামাতার পরিত্যজন থেকে শিশুর মধ্যে অতিরিক্ত লাজুকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, আক্রমণধর্মিতা প্রভৃতি নানারকম অবাঞ্ছিত ও সামঞ্জস্যমূলক আচরণ দেখা দিয়ে থাকে।

পরিত্যজন বা আদর-ভালবাসার অভাব যেমন অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করতে পারে

তেমনই অতিরিক্ত ভালবাসা বা অতিরিক্ত সংরক্ষণ শিশুর মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি শিশুর সব আব্দার নির্বিচারে মেনে নেওয়া হয় বা তাকে অতিরিক্ত শাসন বা নিয়মকানুনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আগলে আগলে রাখা হয় তাহলেও তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশও স্বাস্থ্যসম্মত হয়ে ওঠে না। শিশুকে অতিরিক্ত আব্দার দিলে বা সব সময় তাকে সংরক্ষিত করে রাখলে শিশু বাস্তব জগতের বিভিন্ন জটিল শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে সক্ষম হয় না এবং বাস্তবের সম্মুখীন হবার জন্য তৈরী হয়েও ওঠে না। অতিরিক্ত সংরক্ষিত ছেলেমেয়ে বশ্যতাধর্মী কিংবা আক্রমণর্মী, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং নিরাপত্তাহীন ব্যক্তি হয়ে বড় হয়ে ওঠে।

দাম্পত্যজীবনে অসঙ্গতি বা যাকে বিপর্যস্ত পরিবার (Broken Home) বলা হয় তাও শিশুর অস্বাভাবিক আচরণ সৃষ্টির একটি বড় কারণ। শিশু যে পরিবারে মানুষ হয় সে পরিবার যদি সুসংহত ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশও সুষ্ঠু ও সুষম হয়ে উঠতে পারে। মাতা ও পিতা দুজনের স্নেহ ও মনোযোগ শিশুর সুষ্ঠু মানসিক সংগঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। যে পরিবারে পিতা ও মাতার মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিচ্ছেদ দেখা দেয় সে পরিবারে শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং পরবর্তী জীবনে নানারকম অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি করে।

শৃঙ্খলা ও কর্তৃত্বকে মানতে শেখা শিশুর সামাজিক বিকাশের একটি বড় অঙ্গ। প্রথম জীবনে শিশু থাকে নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর। সে নিজের প্রয়োজন ও তার পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই জানে না। কিন্তু একটু বড় হলেই তাকে পরিবেশের দাবী অনুযায়ী তার ইচ্ছা ও প্রয়োজনকে কিছু কিছু মাত্রায় ত্যাগ করতে হয়। এই থেকেই সে কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলা মানতে শেখে এবং তার সামাজিকীকরণের শিক্ষা সুরু হয়। শিশুর উপর এই কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলার আরোপ খুব বিবেচনার সঙ্গে করা দরকার। যদি শৃঙ্খলার মান শিশুর আয়ত্তাতীত হয় বা কর্তৃত্ব অতিরিক্ত কঠোর হয়ে ওঠে তাহলে শিশুর মধ্যে হয় অতিরিক্ত বশ্যতা নয় বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দেবে। আবার যদি কর্তৃত্ব অত্যন্ত দুর্বল হয় বা শৃঙ্খলার মান যদি খুব নীচু হয় তাহলে শিশু ব্যর্থতাকে সহ্য করতে বা মেনে নিতে শিখবে না এবং পরিণত জীবনে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সক্ষম হবে না।

যৌন বিকাশও প্রথম শৈশবে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে প্রভাবিত করে

থাকে। এই সময় শিশু তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিনতে শেখে এবং তাই থেকেই তার মধ্যে বিভিন্ন যৌন বিষয় সম্বন্ধে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। শিশুদের এই যৌন সচেতনতার উন্মেষণকে পিতামাতারা কি ভাবে নেন এবং তার প্রতি এ ব্যাপারে কি ধরনের আচরণ করেন তার দ্বারাই শিশুর ভবিষ্যৎ যৌনবিকাশের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিশুর যৌনকৌতূহল সম্পর্কে পিতামাতার প্রতিক্রিয়া যদি উদার ও প্রগতিশীল হয় তাহলে শিশু যৌন বিষয় সম্পর্কে বলিষ্ঠ মনোভাব গড়ে তুলতে পারে এবং নির্ভুল জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে। আবার অপর পক্ষে যদি পিতামাতার প্রতিক্রিয়া এ ব্যাপারে অনুদার ও সঙ্কীর্ণ হয় তাহলে যৌনবিষয় সম্পর্কে শিশুরও মনোভাব গোপনতাধর্মী ও বিকৃত হয়ে ওঠে এবং এ সম্বন্ধে তার অর্জিত জ্ঞানও ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ফ্রয়েড প্রথম শৈশবে যৌনতার বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে এই সময় শিশুর মধ্যে তার মা বা বাবার প্রতি গভীর যৌন প্রক্ষোভমূলক আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। ফ্রয়েড এই আকর্ষণের নাম দিয়েছেন ইডিপাস কম্প্লেক্স। তাঁর মতে শিশুর ভবিষ্যৎ যৌনসংগঠনের সম্পূর্ণ কাঠামোটাই পিতামাতার প্রতি যৌন আকর্ষণ বা ইডিপাস কম্প্লেক্সের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। পিতামাতার আচরণ বা অন্যান্য কোন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন রকমে যদি এই কম্প্লেক্সটি অবাঞ্ছিতভাবে প্রভাবিত হয় তাহলে শিশুর সমস্ত যৌনজীবনটাই বিকৃত হয়ে উঠতে পারে। প্রথম বাল্যকালে যৌন সচেতনতার বিকাশে নানা অসঙ্গতি ও ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনে নানারকম অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং বিশেষ করে অনেকের মধ্যে যে সব বিভিন্ন প্রকৃতির যৌনমূলক বিকৃতি দেখা যায় সেগুলির অধিকাংশই এই বাল্যকালীন যৌন অসঙ্গতি থেকে জন্মে থাকে সে বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা একমত।

এ ছাড়া বাল্যকালে যেমন শিশুর শরীরের অস্থি, পেশী প্রভৃতি পুষ্ট হতে থাকে তেমনই তার মধ্যে আক্রমণধর্মিতা ও শত্রুতাবোধ জেগে ওঠে। বিশেষ করে শিশু যখন কোন রকম ব্যর্থতা, অবমাননা, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদির সম্মুখীন হয় তখন তার মধ্যে আক্রমণধর্মিতার সৃষ্টি হয়। শিশু যদি এই আক্রমণধর্মিতা ও শত্রুতাবোধের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করতে না শেখে তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিকৃত হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে আক্রমণধর্মিতা থেকে একটা বিষচক্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে যেমন, ব্যর্থতা→ আক্রমণধর্মিতা→অপরাধবোধ→দুশ্চিন্তা→বর্ধিতা ব্যর্থতা।

নিজের ভাইবোনদের মধ্যে সম্পর্কের উপরও শিশুর আচরণের স্বাভাবিকতা নির্ভর করে। ভাইবোনদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক নির্ভর করছে পিতামাতার ভালবাসাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে শিশু কতটা মানিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে তার উপর। যদি এ ব্যাপারে শিশু অতিরিক্ত মাত্রায় ঈর্ষা-পরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিকৃত হয় এবং তার মধ্যে নানারকম অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি হয়। আর পিতামাতার ভালবাসার ব্যাপারে যদি শিশুর মধ্যে কোনও রকম ক্ষোভ, দুশ্চিন্তা ও ঈর্ষা না সৃষ্টি হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে।

সবশেষে অস্বাভাবিক আচরণ সৃষ্টির কারণরূপে আমরা আঘাতাত্মক অভি-জ্ঞতার উল্লেখ করতে পারি। বাল্যকালে শিশু নানাভাবে এমন সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে যেগুলি তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। দৈনন্দিন ব্যাপারে পিতামাতা বা অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের আচরণে, বিদ্যালয়ে বা অন্য কোনও পরিবেশে শিশু যদি এমন কোন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় যা তার মনে কোন গভীর প্রক্ষোভধর্মী ছাপ রেখে যায়, তাহলে সে অভিজ্ঞতা তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে তোলে এবং পরিণত বয়সে তার মধ্যে নানা ধরনের বিকৃতি দেখা দেয়।

শেষ বাল্যকাল

সাধারণত শিশুর ষষ্ঠ ও সপ্তম বৎসর বয়স থেকে বাল্যকাল সুরু হয়। এ সময় থেকে শিশুর স্কুলজীবনেরও সুরু। এই সময়টির বৈশিষ্ট্য হল প্রচণ্ড শারীরিক বৃদ্ধি এবং উন্নত মানসিক শক্তির বিকাশ। যদি কোন কারণে এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি বা ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ব্যাহত হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে নানাবিধ অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি হয়। যেমন শারীরিক অক্ষমতা, অঙ্গবিকৃতি কিংবা দেহঘটিত কোনও গুরুতর অসঙ্গতি যদি শিশুর মধ্যে থাকে তাহলে তা পরে শিশুর সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয়। সে আর দশজনের সঙ্গে সমানভাবে মিলে মিশে দলের কাজকর্মে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আর সকলের বিদ্রূপ বা সহানুভূতির পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। শারীরিক ত্রুটি বা বিকৃতি প্রকৃতপক্ষে প্রক্ষোভমূলক অপসঙ্গতির সৃষ্টি করে না। অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয় নিজের চেহারা সম্পর্কে শিশু কি ধরনের মনোভাব এবং মূল্যবোধ গঠন

করতে পারল তার দ্বারা। এই মনোভাবে এবং মূল্যায়ন আবার নির্ভর করে তার পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার উপর। সাধারণত শারীরিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে শিশু সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে নানা ধরনের পরিপূরক (compensatory) আচরণের মাধ্যমে, যেমন সে কোন বিশেষ শক্তির উৎকর্ষ সাধন করে, কিংবা বাহবা নেবার মনোভাব দেখায় কিংবা অপরাধপ্রবণতার আশ্রয় নেয় কিংবা অন্য কোন ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণ সম্পন্ন করে।

শিশু যখন বিদ্যালয়ে যাওয়া সুরু করে তখন তার সঙ্গতিবিধানের কাজ আরও জটিল হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি যদি স্বাস্থ্যময়, প্রীতিকর ও সুসংহত হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তা সুষ্ঠু ও সুষম ভাবে বিকশিত হতে পারে। আর অপর পক্ষে যদি শিশুর বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাগুলি কষ্টকর, অপ্রীতিজনক ও অসংবদ্ধ হয় তাহলে শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয় দেখা দেবে এবং পরিণত জীবনে তার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি করবে।

এই বয়সে শিশু তার সীমাবদ্ধ পারিবারিক পরিবেশ থেকে বৃহত্তর সমাজে পদক্ষেপ করে এবং পিতামাতা ভাইবোনের গণ্ডীর বাইরে বহির্জগতের বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই তার সামাজিকীকরণের কাজ সুরু হয়। বিদ্যালয়ের সহপাঠী, শিক্ষকশিক্ষিকা ও অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সঙ্গে আদানপ্রদানের সুযোগ সে পায় এবং এ সময়ে সে যদি সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধান করতে না পারে তাহলে তার মধ্যে দেখা দেয় অস্বাভাবিক আচরণ। এই সময় সে সমাজে নারী ও পুরুষের বিভিন্ন ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং নানারকম সামাজিক আচার ব্যবহার ও কৌশলও শেখে। যদি শিশুর উপর অতিরিক্ত ভার বা দায়িত্ব চাপান হয় বা তার স্বাধীন সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় তাহলে তার মধ্যে অতি অবশ্যই অপসঙ্গতি দেখা দেবে এবং তার সামাজিক শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। সাধারণত শিশুর সামাজিকীকরণে যে সব বিষয় বাধার সৃষ্টি করে সেগুলি হল বাধ্যতামূলক একাকিত্ব, শিশুর আচরণের উপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ, পিতামাতার পছন্দমত কাজে জোর করে নিযুক্ত করা ইত্যাদি।

যৌবনাগম

এই স্তরে শিশুর শারীরিক এবং জীবতত্ত্বমূলক সব রকম প্রক্রিয়াগুলি প্রায় পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছয়। এই সময় ছেলেমেয়ে উভয়েরই যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের শরীরে নানারকম যৌনমূলক চিহ্ন দেখা দেয়।

এককথায় উভয়ের ক্ষেত্রেই এই সময় পূর্ণ যৌনবিকাশ ঘটে থাকে। এই শারীরিক ও জীবতত্ত্বমূলক পরিণতিগুলি ছাড়াও নানারকম মনোবিজ্ঞানমূলক পরিবর্তনও দেখা দিয়ে থাকে। যেমন, পরিবারের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা, ছেলেদের মেয়েদের এবং মেয়েদের ছেলেদের সংসর্গ পাবার আগ্রহ, আত্মসচেতনতা, বৃত্তিগ্রহণ করার ইচ্ছা, উচ্চাশার সৃষ্টি, ব্যর্থতার অনুভূতি ইত্যাদি।

যে সব শারীরিক পরিবর্তন এই সময় শিশুর মধ্যে দেখা দেয় সেগুলি শিশুর মানসিক সংগঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যৌনমূলক বিকল্প ও পরিবর্তনগুলি যদি স্বাভাবিক সময়ের আগে বা পরে ঘটে তাহলে শিশুর পক্ষে সঙ্গতি-বিধানের সমস্যা জটিল হয়ে পড়ে। এই যৌনমূলক শারীরিক পরিবর্তনগুলি সহজেই পরিবেশের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শিশুর প্রতি তাদের মনোভাব ও আচরণের বেশ কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। বয়স্কদের মনোভাব ও আচরণ যদি শিশুর পক্ষে রুচিকর ও অনুকূল না হয় তাহলে তার মধ্যে গুরুতর প্রক্ষোভমূলক অপসঙ্গতি দেখা দেয়। শারীরিক পরিবর্তনের চেয়ে প্রাপ্ত-যৌবন ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেসব মনোবিজ্ঞানমূলক ও প্রক্ষোভমূলক পরিবর্তন দেখা দেয় সেগুলি আরও অধিকমাত্রায় তাদের মানসিক সংগঠন ও আচরণকে প্রভাবিত করে। প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে এই সময় যে সব মানসিক চাহিদা দেখা দেয় সেগুলির পরিতৃপ্তি যদি তারা না লাভ করে তাহলে তাদের মধ্যে আশাভঙ্গ, বিক্ষোভ ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় এবং গুরুতরক্ষেত্রে নানারকম অপরাধপ্রবণতায় পর্যবসিত হয়। বস্তুত যৌবনপ্রাপ্তির সময় অতৃপ্ত চাহিদা ছেলেমেয়েদের অবাঞ্ছিত পথে নিয়ে যায় এবং তাদের নানারকম অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য করে।

প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েরা যত বড় হয় তত তারা স্বাধীন মনোভাবের অধিকারী হয় এবং সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ইচ্ছা তাদের হয়। তারা নিজেদের অহংসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অথচ এই সময় তার উপর বয়স্ক ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব পুরোমাত্রায় বজায় থাকে। তার ফলে দেখা দেয় আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় প্রকারের দ্বন্দ্ব এবং তা সময় সময় বিদ্রোহে পরিণত হয়।

এই সময় প্রাপ্তযৌবনদের নানা মানসিক শক্তির বিকাশ হয় এবং তারা চায় তাদের সেই সব শক্তির যথাযথ প্রয়োগ করতে। যদি তারা নিজের পরিবারে বা বাইরের বিদ্যায়তনে তাদের সেই সব শক্তির প্রয়োগের উপযুক্ত সুযোগ না

পায় তাহলে তাদের মধ্যে যেমন একদিকে ব্যর্থতা দেখা দেয় তেমনই তাদের অহংসত্তা আত্মতৃপ্তি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

যৌবনাগম যৌনবিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনঘটিত বিভিন্ন তথ্য ও রহস্য জানবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল জাগে। এই কৌতূহল যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৃপ্ত না হয় তাহলে তারা নানা অসম্পূর্ণ ও ভুল যৌনজ্ঞান সঞ্চয় করে এবং তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা বিকৃত পথে চলে যায়। এই থেকেই যৌনঘটিত নানা অস্বাভাবিক আচরণ তাদের মধ্যে সৃষ্ট হয়।

সাধারণত যে সব ব্যাপার প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি করে থাকে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, পিতামাতার অতিরিক্ত শাসন, স্বাস্থ্যকর সামাজিক অভিজ্ঞতার অভাব, দায়িত্ব পালন ও স্বাধীন কাজকর্মের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব, যৌনকৌতূহল মেটানোর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের অভাব ইত্যাদি।

প্রথম বয়স্ক স্তর (Early Adulthood)

সাধারণভাবে যৌবনপ্রাপ্তির শেষে ব্যক্তির সব রকম বিকাশই পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছয় এবং ব্যক্তি পূর্ণবয়স্ক বলে পরিগণিত হয়। এই সময়ে ব্যক্তি সংসারজীবনে প্রবেশ করে, জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে, স্বাধীনভাবে ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ কর্ম করে ইত্যাদি। এই সময়ে প্রত্যেক মানুষকেই নানারকম জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেগুলির জন্য সাধারণক্ষেত্রে কোনও রকম অস্বাভাবিকতা যে দেখা দেয় না তা নয়। তবে এমন কতকগুলি অত্যন্ত জটিল ও সমস্যামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যেগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে অত্যন্ত গুরুতরভাবে ব্যাহত করতে পারে এবং তার মধ্যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য এই সব জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করাটা বিশেষভাবে নির্ভর করে তার যৌবনাগমে কি ধরনের সঙ্গতিবিধান করতে সে সমর্থ হয়েছে। যদি যৌবনাগমের সময় তার চতুষ্পার্শ্বের ব্যক্তিদের সঙ্গে সে সন্তোষজনক প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধান করতে পেরে থাকে এবং তার যৌনবিকাশ যদি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পন্থায় ঘটে থাকে তাহলে তার পক্ষে তার বয়স্ক জীবনে সমস্যাগুলি সমাধান করা সহজ ও আয়াসহীন হয়। আর যদি অপরপক্ষে তার

বাল্যকাল ও যৌবনে নিরাপত্তার অভাব বা অন্য কোনও ধরনের ব্যক্তিসত্তাঘটিত অপসঙ্গতি তার জীবনে দেখা দিয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষে বয়স্কজীবনে সুসঙ্গতিবিধান করা শক্ত হয়ে ওঠে এবং অবসন্নতা, দীর্ঘস্থায়ী দুশ্চিন্তা বা কোনও প্রকারের মানসিক বিকার তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে।

এই বয়সের দুটি ঘটনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, একটি বিবাহ, অপরটি সন্তানের জনক হওয়া। এই দুটি ব্যাপারের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সঙ্গতি ঘটা বিশেষ প্রয়োজন। বিবাহের ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধান নির্ভর করে প্রক্ষোভমূলক স্থায়িত্ব ও পরিণতির উপর। সাফল্যজনক বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষ তাদের সমস্যাগুলি বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান করে থাকে। অসুখী বিবাহের ক্ষেত্র মাত্রেই বুঝতে হবে যে স্বামী এবং স্ত্রীর ব্যক্তিসত্তাগত দুর্বলতা আছে এবং সেইজন্য তাদের পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্য যেখানে বিবাহ সুখের হয় না সেখানে ব্যক্তিসত্তাগত অসঙ্গতি বৃদ্ধি পায় এবং শেষে অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি হয়। এই কারণে বলা চলে যে বিবাহিত জীবনে যে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পেরেছে সে জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিরই সার্থক সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে দেখা যায় যে শতকরা পঁচিশটি বিবাহই বিবাহবিচ্ছেদে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিবাহই সুখের হয় নি। আমাদের দেশে বিবাহবিচ্ছেদ খুব বেশী প্রচলিত হয় নি বলে এধরনের কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এদেশেও অসফল বিবাহের সংখ্যা কম নয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক অপসঙ্গতির ক্ষেত্র কত বেশী। বলাবাহুল্য যে এই ধরনের অসফল বিবাহের সন্তান-সন্ততিরাও যে বিশেষভাবে অপসঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সাধারণত বিবাহিত জীবনে ব্যর্থতার কারণ হল শৈশবে স্নেহ-ভালবাসার অভাব, বিপর্যস্ত পরিবার, বিবাহের জন্য উপযোগী শারীরিক ও প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতির অভাব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার অভাব, সন্তান ধারণের অক্ষমতা, দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে অপরাধবোধ প্রভৃতি। এছাড়া কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পারিবেশিক কারণ হল যুদ্ধজনিত জটিলতা, বাসস্থানের অভাব, মায়েদের কর্মগ্রহণ, নানাধরনের অর্থনৈতিক চাপ এবং সবশেষে আণবিক যুগপ্রসূত জীবন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ও ভীতি। বিবাহের ব্যর্থতা থেকে নানা ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয় যেমন,

মানসিক ব্যাধি, অবসন্নতা, দুশ্চিন্তা, ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ।

বিবাহের পর সঙ্গতিবিধানের সমস্যা দেখা দেয় ব্যক্তির জীবিকার্জন বা বৃত্তি অনুসরণের ক্ষেত্রে। আধুনিক সমাজের অতি জটিল, দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং সবশেষে অতিরিক্ত বিশেষ জ্ঞানধর্মী প্রকৃতির জন্য প্রত্যেক যুবক-যুবতীর পক্ষেই উপযোগী বৃত্তি নির্বাচন করা একটি অতি কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত আমাদের দেশে যে ধরনের শিক্ষা ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় সে শিক্ষা তাদের পক্ষে একটি সন্তোষজনক বৃত্তি খুঁজে পেতে মোটেই সাহায্য করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযোগী বৃত্তি লাভ করার জন্য যে বিশেষধর্মী জ্ঞানের প্রয়োজন তা তারা পায় না, ফলে দীর্ঘদিন শিক্ষালাভ করেও অনেকে সন্তোষজনক বৃত্তি পায় না। আবার এমন অনেকে আছে যারা বিশেষধর্মী জ্ঞান অর্জন করা সত্ত্বেও যে বৃত্তি তারা পায় তা তাদের সামর্থ্য এবং আগ্রহ অনুযায়ী হয় না, ফলে অসন্তোষ, কর্মে পূর্ণ দক্ষতা দেখাতে অক্ষমতা, হীনমন্যতার অনুভূতি, অপরাধবোধ প্রভৃতি তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এই রকম বৃত্তির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের অভাব ব্যক্তির মধ্যে নানাধরনের অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে এবং কাজে অনুপস্থিতি, দুর্ঘটনা, শারীরিক ব্যাধি, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি নানা অস্বাভাবিকতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়।

মধ্য বয়স (Middle Age)

মধ্যবয়স বলতে ব্যক্তির জীবনে সেই কালকে বোঝায় যখন তার জীবনের দাম্পত্য, বৃত্তিমূলক এবং সামাজিক দিকগুলি যথেষ্ট দৃঢ়বদ্ধ ও স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। এই সময়ে ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তাই থেকে তাদের মধ্যে তীব্র প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। মধ্যবয়সে সাধারণত ব্যক্তিকে যে কয়েকটি ক্ষেত্র নিয়ে সঙ্গতিবিধানের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি হল দৈহিক সামর্থ্যের হ্রাস প্রাপ্তি, পারিবারিক সংগঠনের পরিবর্তন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরকম পরিবর্তন বা নতুনত্বের সম্ভাবনা হ্রাস এবং সব শেষে কতকগুলি বিশেষ ধরনের শরীরতত্ত্বমূলক পরিবর্তন।

মধ্যবয়সে শারীরিক অসুস্থতা ঘন ঘন দেখা দেয়। সহনশীলতা এবং শারীরিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেশ কমে আসে। যৌনক্ষমতারও অবনতি ঘটে। ব্যক্তি তার এই সব পরিবর্তন সম্বন্ধে খুবই সচেতন থাকে এবং কি ভাবে সে এগুলিকে

গ্রহণ করে তার উপর নির্ভর করে তার সঙ্গতিবিধানের প্রকৃতি। তার প্রতিক্রিয়াগুলি যদি বাস্তবধর্মী না হয় তাহলে তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে।

ব্যক্তি যখন তার মধ্যবয়সে পৌঁছয় তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তার পারিবারিক সংগঠনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই তার মা-বাবা আর জীবিত থাকে না এবং ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ঘর সংসার করতে সুরু করে দেয়। তার ফলে যে পরিবারগত ভিত্তিতে তার বাল্যকালীন নিরাপত্তাবোধের শিকড়টি গ্রথিত ছিল সেই ভিত্তিটাই বিচ্যুত হয়ে যায়। এই সময় ব্যক্তিকে নতুন করে সঙ্গতিবিধান করতে হয় এবং ইতিপূর্বে তার সঙ্গতিবিধান কতটা কার্যকরী ও বলিষ্ঠ ছিল তার উপর নির্ভর করে তার এই সময়ের সঙ্গতিবিধানের সার্থকতা।

আর যে বিষয়টি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে অপসঙ্গতি সৃষ্টি করে থাকে সেটি হল এই সময় ব্যক্তিদের জীবন একটি ধরাবাঁধা দৃঢ়বদ্ধ ধারায় প্রবাহিত হয় এবং কোনরকম পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা একদম থাকে না। ব্যক্তি বেশ বুঝতে পারে যে তার ভবিষ্যতে আর কোনও নতুনত্ব বা পরিবর্তন আসতে পারবে না। এবং বর্তমান জীবনে যদি সে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত না থাকে তাহলে তার জীবন ব্যর্থতা ও বিষণ্ণতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি এই মনোভাব গুরুতর হয়ে ওঠে তাহলে ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়।

মধ্যবয়স স্তরে জীবনের পরিবর্তন বলে একটি জটিল সময় দেখা দেয়। বিশেষ করে মধ্যবয়স স্তরের শেষার্ধে যৌনমূলক গ্রন্থিগুলির মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয় বলে ব্যক্তির প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। যৌনসম্পর্ক রক্ষার ক্ষমতাও বেশ কমে আসে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আরও ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবে দেখা দেয়। এনড্রোকিন গ্রন্থি এবং যৌনগ্রন্থির পরিবর্তনের ফলে মধ্যবয়স্কা মেয়েদের মধ্যে রজোবন্ধ (menopause) দেখা দেয় এবং এই ঘটনাটি তাদের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাদের প্রক্ষোভমূলক সমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দুশ্চিন্তা, অবসন্নতা, অপরাধবোধ, আত্মগ্লানি এমন কি সময় সময় আত্মহত্যার ইচ্ছাও তাদের মনে দেখা দেয়। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াগুলিকে ইনভলুসানাল মেলানকলিয়া (Involutional melancholia) বলা হয়। এই সময় যদি ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতিবিধান করতে না পারে তাহলে তার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেওয়া খুবই সম্ভব। বিশেষ করে পরিবারের আর সকলে তার প্রতি কি ধরনের মনোভাব পোষণ করে এবং তার সঙ্গে

কি ধরনের আচরণ করে তার উপর তার মানসিক সমতা অনেকখানি নির্ভর করে।

বার্ধক্য স্তর (Old Age)

বার্ধক্যে নানা কারণে সঙ্গতিবিধানের কাজটি দুষ্কর হয়ে ওঠে। তবে ইতিপূর্বে পরিবেশের সঙ্গে সে কতটা সার্থক সঙ্গতিবিধান করেছে তার উপরে নির্ভর করছে তার বার্ধক্যকালীন সঙ্গতিবিধানের স্বরূপ। তবু যে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধানের সমস্যা গুরুতর হয়ে ওঠে সেগুলি হল নানারকম শারীরিক অক্ষমতা, অতিরিক্ত নির্ভরপরায়ণতা, অপরের কাছে নিজের ক্রমহ্রাসমান প্রয়োজনের অনুভূতি এবং নিঃসঙ্গতার অনুভূতি।

বার্ধক্যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কমে আসে, দ্রুত চলাফেরা করা সম্ভব হয় না, মস্তিষ্কের টিস্যুগুলির পরিবর্তনের ফলে শেখার ক্ষমতা কম হয়ে যায়, স্মরণ কার্য ব্যাহত হয় ইত্যাদি। এই সব পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির নিরাপত্তাবোধের হানি হয় এবং তার মধ্যে অসহায়তার অনুভূতি দেখা দেয়। এই ধরনের মনোভাব তীব্র হলে তা অস্বাভাবিকতার রূপ নিতে পারে।

এই সময় ব্যক্তি শারীরিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভীষণ-ভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় নিজেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত বলে মনে করে। তার ফলে তার মধ্যে আত্মবিরোধিতা, মনোযোগ পাবার ইচ্ছা, শিশুসুলভ অস্থিরতা দেখা দেয়।

এই সময় নারী-পুরুষ সকলের মধ্যেই নিজের প্রয়োজনীয়তার হ্রাসপ্রাপ্তির একটা অনুভূতি দেখা দেয়। অর্থাৎ তাদের মনে হয় যে সমাজে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে এবং তারা আর তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য কাজে লাগবে না। পরিবারগত এবং বৃত্তিমূলক দায়িত্বও এই সময় যথেষ্ট কমে আসে এবং সামান্য অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছাড়া তাদের আর কিছু করতে হয় না। ফলে তাদের মধ্যে একটা শূন্যতার বোধ দেখা দেয় এবং তারা শরীরের দিক দিয়ে বেঁচে থাকলেও মনের দিক দিয়ে তাদের মৃত্যু হয়।

বার্ধক্যের সময় আবাল্য বন্ধুবান্ধব সব একে একে ছেড়ে যায়, বেশী চলা ফেরাও সম্ভব হয় না এবং আয়ও সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে। তার ফলে ব্যক্তি তার পরিবেশ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। এই সময় যদি ব্যক্তি সংস্কৃতিমূলক এবং কোনও ভাল কাজকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করতে না পারে তাহলে তার পক্ষে

প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতি বজায় রাখা সম্ভব হয় না এবং তার মধ্যে নানা ধরনের অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হতে পারে।

সামাজিক বা কৃষ্টিমূলক বিকাশের ত্রুটি
(Defects in Social or Cultural Development)

অস্বাভাবিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামাজিক বা সংস্কৃতিমূলক কারণ খুব শক্তিশালী হয় না। এর প্রধান কাজ হল ব্যক্তির জীবনে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করা যেখানে প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয় বা অসঙ্গতি সহজে দেখা দিতে পারে। যে দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে শিশু বড় হয়, সেই দল বা গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংগঠন যে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে অনুসৃত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান এবং বিভিন্ন সমাজের কৃষ্টিমূলক সংগঠনের বিচিত্র পারিবেশিক চাপ ব্যক্তিমাত্রেরই প্রক্ষোভমূলক সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

বিশেষ কোন কৃষ্টিমূলক দল বা গোষ্ঠীর যে বিশেষ কোন মানসিক ব্যাধির প্রতি প্রবণতা আছে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে কোনও বিশেষ দলের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ মানসিক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন, আদিম সমাজের চেয়ে আধুনিক উন্নত সভ্যতাসম্পন্ন সমাজে সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্র অনেক বেশী দেখা যায়। তেমনই আইরিশ জনসমাজে অস্বাভাবিক মদ্যাসক্তি, নিউজিল্যাণ্ডে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ মনোবিকার অধিকমাত্রায় দেখা গেছে।

শিশুপালনের প্রথা ও পদ্ধতির বিভিন্নতার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কৃষ্টিগত পার্থক্য প্রকাশ পায়। বিশেষ করে সমাজে প্রচলিত যে ধরনের যৌনমূলক আচরণে শিশুরা অভ্যস্ত হয় এবং যে সব যৌনবিষয়ক শিক্ষা তারা লাভ করে সেগুলির উপর তার ভবিষ্যৎ জীবনের যৌনগত সঙ্গতিবিধান ও দাম্পত্যজীবনের প্রকৃতি পূর্ণভাবে নির্ভর করে। অনেক সমাজে দেখা গেছে যে যৌনবিষয় সম্বন্ধে অযৌক্তিক ও কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে আবার অনেক সমাজে যৌনমূলক আচরণের ক্ষেত্রে বেশ শিথিল অনুশাসন প্রচলিত রয়েছে। এ দু'ক্ষেত্রে ব্যক্তির যৌনবিষয়ক সঙ্গতিবিধান যে প্রচুর বৈষম্যসম্পন্ন হবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কৃষ্টিমূলক যে ব্যাপারটি ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে

সেটি হল সমাজে গৃহীত বা অনুসৃত মানের সংগঠনটি। দেখা যায় যে অনেক সময় ব্যক্তিকে তার নিজের কৃষ্টি বা বিভিন্ন কৃষ্টির মধ্যে পরস্পরবিরোধী মানের সম্মুখীন হতে হয় এবং তার ফলে তার মধ্যে গুরুতর সঙ্গতিবিধানের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে প্রত্যেক সমাজেই বিগত যুগের মানগুলির সঙ্গে নবীন যুগের মানের সংঘর্ষের ফলে শিশুদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রক্ষোভমূলক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে গুরুতর অপরাধপরায়ণতার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। সাধারণত যে সব মানমূলক সংঘর্ষ শিশুদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রথমত, বাড়ীতে বা স্কুলে যে সব নৈতিক মান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলির সঙ্গে সমাজের বয়স্কদের অনুসৃত নৈতিক মানের প্রচুর পার্থক্য, দ্বিতীয়ত, শিশুর ঈপ্সীত বাস্তব এবং প্রকৃত বাস্তবের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য এবং তৃতীয়ত, স্বাভাবিক ইচ্ছার অবদমিত এবং বিলম্বিত তৃপ্তি।

যে সব নৈতিক মান সম্পর্কে স্কুলে বা বাড়ীতে শিশু শিক্ষালাভ করে সেগুলির সঙ্গে সমাজে বয়স্কদের অনুসৃত মানের বিরাট পার্থক্য শিশুর মনে প্রচণ্ড সংশয় ও দ্বিধার সৃষ্টি করে। সে বড়দের প্রতি সম্মান ও বিশ্বাস হারায় এবং তার মৌলিক নিরাপত্তাবোধের ভিত্তিতে গিয়ে আঘাত পড়ে। অনেক সময় তার মধ্যে অপরাধ-বোধেরও সৃষ্টি হয়। অস্বাভাবিকতা সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ হল ব্যক্তির কল্পিত জগৎ ও বাস্তব জগতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। নানা বই, পত্রিকা, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতি থেকে উপাদান নিয়ে ব্যক্তি এক অপরূপ কল্পনার জগৎ রচনা করে এবং তার সঙ্গে কঠিন ও নির্মম বাস্তবজগতের বিরাট পার্থক্য তার মধ্যে ব্যর্থতার সৃষ্টি করে। সে যে সব অবাস্তব ও অসম্ভব আশা পোষণ করে সেগুলির প্রায় ক্ষেত্রেই পরিতৃপ্তি ঘটে না এবং তাই থেকেই তার মধ্যে নানা প্রকারের অপসঙ্গতি দেখা দেয়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী এ্যাডলারের মতে ব্যক্তির জীবনের কল্পিত মান এবং প্রকৃত জীবনের মানের মধ্যে বৈষম্য থেকেই ব্যক্তির মধ্যে মনোবিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়া আধুনিক সমাজের কৃষ্টিমূলক পরিবেশ এতই জটিল হয়ে উঠেছে যে ব্যক্তিকে বাধ্য হয়ে অনেক ইচ্ছা ও অভিলাষ দমন করতে হয়। বিশেষ করে যৌবনাগমে ব্যক্তির মধ্যে বয়স্কদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা, যৌন তৃপ্তির ইচ্ছা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রভৃতি নানা রকম ইচ্ছা দেখা দেয় এবং সেই ইচ্ছাগুলির তৃপ্তি সে লাভ করে বহু বিলম্বে। এই বিলম্বিত তৃপ্তির ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার মধ্যে নানা রকম অস্বাভাবিক আচরণ ও অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আধুনিক যুগের অতিরিক্তমাত্রায় শিল্পায়িত ও শহর-নির্ভর সভ্যতায় আমাদের কৃষ্টিমূলক পরিবেশটি যন্ত্রশিল্প-ঘটিত ও অর্থনৈতিক কারণের জন্য অধিকতর জটিল হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পারার জন্য অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম জটিলতা দেখা দেয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠনেও বাধার সৃষ্টি করে। এই শিল্পঘটিত ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, কাজ করা ও বাস করার শর্তাবলী, জীবনধারণের মৌলিক চাহিদাগুলি, পরিবারের স্থানপরিবর্তন বা পরিবার অন্তর্গত ব্যক্তিদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অপ্রীতিকর পরিবেশ এবং অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের শোষণমূলক নীতির জন্য বর্তমান যুগে অনেকেরই ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। আত্মসম্মানহানি, ব্যর্থতা, অবসরের অভাব প্রভৃতি কারণ ব্যক্তির মনে অস্বাভাবিকতা এনে দেয়। শিল্পাঞ্চলে বস্তিজীবনের নানা দুঃখ ও গ্লানি সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে প্রায়ই গুরুতর অপসঙ্গতির সৃষ্টি করে থাকে। তাছাড়া মায়েদের ক্রমবর্ধমান বৃত্তিগ্রহণ শিশুপালন ও পারিবারিক শান্তির পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে থাকে।

উন্নত যোগাযোগ ও দ্রুত যানবাহনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক স্থায়িত্বের মূলেও আঘাত পড়েছে। আজকাল নানা কারণে পরিবারের স্থান-পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং পরিবারের অনেক ব্যক্তিই কাজ বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল দূরবাসী হয়। তার ফলে অতীতে ব্যক্তিকে তার পরিবার যে নিরাপত্তা, শান্তি ও সুখ দিতে পারত আজ আর তা দিতে পারে না।

ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে দেশবিভাগের ফলে পারিবারিক স্থিতিশীলতা গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। লক্ষ লক্ষ পরিবার পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে এসে নতুন করে ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করছে। খুব কম ক্ষেত্রেই তারা তাদের অতীতের নিরাপত্তা ও সুখশান্তি ফিরে পেয়েছে। অধিকাংশ পরিবারেরই মৌলিক স্থায়ী সংগঠনটিই বিকৃত, শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার ফলে এই সব পরিবারের ব্যক্তিদের প্রাক্ষোভিক সঙ্গতিবিধান বিপর্যস্ত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গুরুতর প্রকৃতির অপসঙ্গতি দেখা দেয়। এই সব পরিবারের যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনে নিরাপত্তার অভাব, আশাভঙ্গতা, অসহায়তা ও আক্রমণধর্মিতা সৃষ্টি হয় এবং অনেকেই পরে অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

তাছাড়া খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান প্রভৃতি জীবনধারণের মৌলিক চাহিদাগুলি যদি প্রয়োজনমত না পাওয়া যায় তাহলেও অপসঙ্গতি সৃষ্টি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্ন :

1. Discuss the causes of Abnormal Behaviours. How far do the biological causes contribute to abnormality ?

2. Discuss the role of the defects of psychological development in producing abnormal behaviour in people.

3. How far are the defects of social or cultural development responsible for creating abnormality in people ?

নয়

অস্থায়ী পরিবেশগত ব্যক্তিসত্তার অসুস্থতা
(Transient Situational Personality Disorders)

সাধারণত নিউরসিস বা সাইকোসিস প্রভৃতি গুরুতর মানসিক অস্বাভাবিকতা দীর্ঘস্থায়ী অপসঙ্গতি বা ব্যক্তিসত্তার অস্বাভাবিক সংগঠন থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময় খুব ভীতিকর দুর্ঘটনা, আক্রমণ, হত্যা, পাশবিক অত্যাচার, যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি প্রভৃতি গুরুতর প্রকৃতির মানসিক অভিজ্ঞতা থেকেও সুস্থ ও সুসমন্বিত ব্যক্তিসত্তার মধ্যেও আকস্মিকভাবে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত অস্বাভাবিক আচরণ বা মনোভাবের সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে দৈহিক আঘাত থাকতে পারে কিন্তু মনোব্যাধিমূলক চাপ বা প্রতিক্রিয়ার ভূমিকাই সব চেয়ে বেশী।

এই ধরনের পরিবেশজাত মানসিক ব্যাধির লক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া সাধারণ নিউরসিস বা সাইকোসিসের লক্ষণ ও প্রতিক্রিয়ার অনুরূপই, কিন্তু এগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি অল্প চিকিৎসার ফলেই সেরে যায়। এই অস্থায়ী মানসিক অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করার একটা উপকারিতা হল যে সাধারণ পরিস্থিতিতে যে সব স্থায়ী মানসিক অস্বাভাবিকতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় সেগুলির প্রকৃতি, গতিধারা ও লক্ষণগুলির প্রকৃত স্বরূপ ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও কোরিয়া যুদ্ধ থেকে এই ধরনের স্বল্পস্থায়ী পরিবেশজাত মানসিক অস্বাভাবিকতার বহু ক্ষেত্র পাওয়া গেছে এবং সেগুলি থেকে পরিবেশের গুরুতর চাপে কি ভাবে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার প্রচুর নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া এই ধরনের ক্ষেত্রগুলি সংখ্যায় বেশী হওয়ার জন্য অস্বাভাবিক আচরণের বিভিন্ন রূপ বা টাইপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞেরাও পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার পদ্ধতি নির্ণয়ের প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন। যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির সঙ্গে এই ধরনের মানসিক অসুস্থতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার জন্য বর্তমানে এই ধরনের মানসিক অসুস্থতার পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণা ও উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

এই ধরনের অস্থায়ী পরিবেশজাত মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করে

কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যে আমরা বুঝতে পেরেছি যে পরিবেশ বা পরিস্থিতির চরম চাপ ব্যক্তির মধ্যে গভীর ও স্থায়ী মানসিক বিকৃতি ঘটাতে পারে, এমন কি তাকে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের অনুপযোগীও করে তুলতে পারে। এ ছাড়াও মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীরও সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণ মানুষ এখন বুঝেছে যে মানসিক ব্যাধি কোনও ধরনের লজ্জাকর বা অপরাধ ত নয়ই বরং ঘটনার চাপে পড়লে যে কোনও ব্যক্তিরই তা ঘটতে পারে।

সামরিক পরিবেশজাত অসুস্থতা

পরিস্থিতিজনিত অস্থায়ী মানসিক অসুস্থতার সব চেয়ে বেশী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যুদ্ধকালীন পরিবেশ থেকে ব্যক্তির মধ্যে যে সব আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয় সেগুলির মধ্যে। দুটি বিশ্ব যুদ্ধে, কোরিয়া ও ভিয়েতনামের প্রলম্বিত যুদ্ধে এই ধরনের অনেক পরিস্থিতিজনিত মানসিক ব্যাধির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। এতদিন এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিকে 'শেল সক' (Shell Shock) নাম দেওয়া হত। প্রথম প্রথম মনে করা হত যে এই অসুস্থ ব্যক্তিরা সত্য সত্যই বোমা বা গোলার আঘাত পেয়েছে এবং মস্তিষ্কের অতি সূক্ষ্ম প্রকৃতির রক্তপাত থেকে তাদের মধ্যে ঐ ধরনের অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু পরে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে এই ধরনের অসুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই সত্যকারের কোনও দৈহিক আঘাত পেয়ে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোবিকারের কারণ হল যুদ্ধমূলক পরিস্থিতি-জনিত দৈহিক ক্লান্তি, মৃত্যু বা বিকলাঙ্গ হবার সদাজাগ্রত ভয় এবং প্রচণ্ড মানসিক আঘাত। বর্তমানে এই ধরনের মানসিক অসুস্থতাকে সেনাবাহিনীর ভাষায় যুদ্ধজনিত অবসন্নতা (Combat exhaustion) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রতি বড় বড় যুদ্ধেই সৈন্যদের শতকরা ১০ থেকে ৪০ জন পর্যন্ত অল্পবিস্তর মাত্রায় এই ধরনের সামরিক পরিস্থিতি থেকে জাত মানসিক অসুস্থতায় ভুগে থাকে।

যুদ্ধজাত মানসিক অসুস্থতার রোগীদের মধ্যে নানা লক্ষণ দেখা গেছে। তার মধ্যে অবসন্নতা, ক্লান্তি, অনুভূতিপ্রবণতা, অনিদ্রা, শারীরিক কম্পন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিমানবাহিনীর সৈন্যদের অনেকের মধ্যে দীর্ঘ আকাশযুদ্ধের পর দুশ্চিন্তা, অবসন্নতা, বিষন্নতা, যুদ্ধের প্রতি ভীতি এবং থেকে থেকে চমকে ওঠার প্রবণতা দেখা গেছে। এই লক্ষণগুলি কখনও কয়েকদিন, কখনও বা কয়েক সপ্তাহ, কখনও বা কয়েক মাস ধরেও থাকতে পারে।

যুদ্ধমূলক পরিবেশে মানসিক অসুস্থতা ঘটার সব চেয়ে বড় কারণ হল যে সাধারণ অসামরিক জীবনে যে ধরনের নিরাপত্তা ও স্বস্তির বোধ মানুষ ভোগ করে থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে তা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তার উপর মৃত্যু বা আঘাতপ্রাপ্তির নিয়ত ভয়, ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা প্রভৃতি মিলে তার প্রক্ষোভমূলক সংগঠনটিকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তার মধ্যে অসহায়তা, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতার তীব্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। দুশ্চিন্তার ফলে তার মানসিক সংগঠনের সমন্বয়ন নষ্ট হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণতা, শরীর কম্পন, আকস্মিক চমকে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণের সৃষ্টি হয়। এই দুশ্চিন্তা থেকে ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করার জন্য বিস্মৃতি, আচ্ছন্নভাব প্রভৃতি অচেতন প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সব মানসিক বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয় চরম ক্লান্তি বা অবসন্নতা।

একথা অবশ্য সত্য যে এই ধরনের যুদ্ধজনিত মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পারিবেশিক চাপই অসুস্থতা সৃষ্টির প্রধান কারণ। বস্তুত পারিবেশিক চাপ হল এই ধরনের মানসিক অসুস্থতার প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু তা'ছাড়া আরও কতকগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কারণও এই শ্রেণীর মানসিক অসুস্থতার পিছনে আছে। এগুলিকে আমরা পরোক্ষ কারণ বলতে পারি। কেন না, অনেক সৈন্যই প্রচুর পারিবেশিক চাপ সহ্য করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেই ফিরে আসে। তাদের ক্ষেত্রে এই পরোক্ষ কারণের অভাব থাকে বলেই পারিবেশিক চাপরূপ প্রত্যক্ষ কারণ থাকা সত্ত্বেও তারা মানসিক অসুস্থতার রোগী হয়ে ওঠে না। এই ধরনের পরোক্ষ কারণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, শারীরিক পরোক্ষ বৈশিষ্ট্যাদি, মানসিক পরোক্ষ বৈশিষ্ট্যাদি এবং সমাজতত্ত্বমূলক পরোক্ষ বৈশিষ্ট্যাদি।

শরীরতত্ত্বমূলক পরোক্ষ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল যে অনুভূতিপ্রবণতা, উদ্যম, মেজাজ প্রভৃতির দিক দিয়ে যদি সৈনিক স্বাভাবিক মাত্রা থেকে বেশ পৃথক হয় তাহলে তার মধ্যে মানসিক ব্যাধি দেখা দেবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাছাড়া রণক্ষেত্রে শরীরের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয় তার ফলে শরীরের কষ্ট সহ্য করার সামর্থ্য একদমই আর থাকে না।

মনোবিজ্ঞানমূলক পরোক্ষ কারণগুলির মধ্যে যেগুলি সৈনিকের মধ্যে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে সেগুলি হল প্রক্ষোভমূলক অপরিণতি, বাড়ী এবং প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিসর্জন, নানা স্তরের ব্যর্থতা, পারিবারিক অসুবিধা এবং দুশ্চিন্তা। যুদ্ধকালীন অবস্থায় যদি বাড়ী থেকে কোনও চিঠিপত্র না আসে বা কোন খারাপ খবর আসে কিংবা স্ত্রীর উদাসীনতা বা

অবিশ্বস্ততার সংবাদ আসে, বা কোনও প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও প্রিয়সঙ্গীর মৃত্যু ঘটে তাহলে সৈনিকের মনে এমন একটা প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে যার ফলে তার মধ্যে মানসিক অসুস্থতা ঘটার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়াও যুদ্ধক্ষেত্রে সময় সময় এমন অনেক পরিস্থিতি দেখা দেয় যা ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বিপর্যয়ের পরোক্ষ কারণের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, পরিবেশের সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত প্রকৃতির জন্য সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানে অসামর্থ্য, চরম বিপদের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করার অক্ষমতা, শত্রু সৈন্য হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি কারণগুলিও তার মধ্যে মানসিক অসুস্থতা সৃষ্টি করার শক্তিশালী কারণ রূপে কাজ করে থাকে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শারীরিক ক্লান্তি, আঘাত বা মৃত্যুর ভয়ই যে একমাত্র মানসিক অপসঙ্গতি সৃষ্টি করে তা নয়, প্রবল প্রক্ষোভমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভীতি এবং গভীর অপরাধবোধ তার মনকে সর্বদা এমনই বিক্ষুব্ধ করে রাখে যে কোনও ধরনের আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা ঘটলেই তার মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। প্রথম যখন সৈনিক যুদ্ধে যোগ দেয় তখন তার যে আত্মবিশ্বাস ও মানসিক দৃঢ়তা থাকে, কিছুদিন চলে গেলে ক্রমাগত ভয়াবহ ও আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা পেতে পেতে তার সে আত্মবিশ্বাস ও মানসিক দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যায় এবং অহংসত্তা দুর্বল হয়ে ওঠে। সে সময় গুরুতর প্রকৃতির কোনও ঘটনা জীবনে ঘটলে মানসিক ব্যাধি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

সমাজতত্ত্বমূলক পরোক্ষ কারণও সৈনিকদের মধ্যে অস্থায়ী মনোবিকার সৃষ্টি করতে সাহায্য করে থাকে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল দলগত সংহতির অভাব, কর্মভারাক্রান্ত পরিস্থিতি, অক্ষম নেতৃত্ব বা দলনায়কদের উপর বিশ্বাসের অভাব, এবং সবশেষে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যের অভাব। সৈনিকদের মধ্যে যদি যথার্থ দলপ্রীতি ও সংহতিবোধ গড়ে তোলা যায় তাহলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায় এবং অনেক গুরুতর পরিস্থিতিতেও তাদের মানসিক স্থৈর্য ও সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এই ধরনের পরিবেশের চাপে পড়ে যাদের মধ্যে অস্থায়ী অসুস্থতা সৃষ্টি হয় তাদের কিছু দিনের জন্য সামরিক পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেই তারা সুস্থ হয়ে ওঠে। এই ধরনের চিকিৎসার মধ্যে প্রধান হল স্বল্পমাত্রায় মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা (Psychotherapy), গরম খাবার, ওষুধ খাইয়ে প্রচুর ঘুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অনেক সৈনিকই দু একদিনের চিকিৎসাতেই সেরে ওঠে।

এই ধরনের সৈনিকদের মধ্যে সামরিক পরিবেশজাত মনোবিকারের চিকিৎসার জন্য আধুনিক কালে 'সামরিক মনশ্চিকিৎসা' একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে গড়ে উঠেছে। সৈনিকদের মধ্যে যাতে মানসিক অসুস্থতা ঘটার মত মনোবিজ্ঞানমূলক এবং সমাজ-তত্ত্বমূলক কারণগুলি দেখা দিতে না পারে এবং যদি কোন কারণে দেখা দেয় তাহলে তার যথাযথ চিকিৎসার আয়োজন করা এই শাখাটির প্রধান কাজ।

নাগরিক পরিবেশজাত অসুস্থতা

অস্থায়ী পরিবেশজাত মানসিক ব্যাধি নাগরিক পরিবেশেও নানা কারণে দেখা দিতে পারে। হঠাৎ যদি ব্যক্তির সামনে কোন গুরুতর প্রকৃতির দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার মধ্যে যে গভীর মানসিক আঘাত দেখা দেয় তার ফলে তার মধ্যে নানাপ্রকার অস্থায়ী মনোবিকার সৃষ্টি হতে পারে। মোটর দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প, প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা, বন্যা, বিমান-দুর্ঘটনা প্রভৃতির দৃশ্য দেখে অনেকের মধ্যে অস্থায়ী মনোবিকার ঘটতে দেখা গেছে। বোস্টন সহরের বিরাট অগ্নিকাণ্ডে যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তাদের মধ্যে অর্ধেকেরই মানসিক আঘাতের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল। হিরোসিমার এটম বোমা বিস্ফোরণ থেকে যারা প্রাণে বেঁচেছিল তাদের অধিকাংশকেই মানসিক সাম্যাবস্থা ফিরে পাবার জন্য বহুদিন মানসিক চিকিৎসাগারে কাটাতে হয়েছিল। কলকাতার সাম্প্রদায়িক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই এমন মানসিক আঘাত পেয়েছিল যার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে তাদের বহুদিন সময় লেগেছিল।

এই ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়াও প্রিয়জনের আকস্মিক বিয়োগ, সামাজিক অবমাননা কিংবা গুরুতর অর্থনৈতিক ক্ষতিও গভীর মানসিক আঘাতের সৃষ্টি করতে পারে।

সাধারণত ভীতিকর বা গুরুতর প্রকৃতির দুর্ঘটনা থেকে যে মানসিক আঘাত সৃষ্টি হয় তা ব্যক্তির মধ্যে নানা লক্ষণের সৃষ্টি করে থাকে। দেখা গেছে যে এই ধরনের মানসিক আঘাতের লক্ষণাবলীর তিনটি পর পর স্তর বা পর্যায় থাকে।

প্রথমটিকে আঘাতমূলক স্তর (Traumatic Stage) বলা যেতে পারে। এই স্তরে ব্যক্তি হতভম্ব, আত্মবিস্মৃত এবং উদাসীন হয়ে পড়ে। সে নিজের ক্ষতি বা আঘাতের কোন পরিমাপ করতে পারে না এবং অনেক সময় লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণত অপরের সাহায্যে সে নিরাপদ জায়গায় ফিরে আসতে পারে। দ্বিতীয় স্তরটিকে অনুভাবনীয় স্তর (Suggestible Stage) বলা হয়। এই স্তরে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় এবং অপরের সাহায্য ও পরামর্শ নিতে ইচ্ছুক থাকে। তৃতীয় স্তরটিকে

নিরাময় স্তর (Recovery Stage) বলা হয়ে থাকে। এই স্তরে ব্যক্তি তার মানসিক সাম্য খুঁজে পায়।

সামরিক ক্ষেত্রের মত নাগরিক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রগুলিতেও আঘাতপ্রাপ্তির পরও বেশ কয়েকটি লক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে কিছুদিন ধরে থাকতে দেখা যায়। যেমন দুর্ভাবনা, মাংসপেশীগত উত্তেজনা, শারীরিক কম্পন, অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা, আঘাতাত্মক ঘটনাটির দুঃস্বপ্ন দেখা, থেকে থেকে চমকে ওঠা ইত্যাদি। প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলা, একাগ্রতার অভাব, যৌন প্রচেষ্টায় উদাসীনতা, আঘাতাত্মক ঘটনাটি সম্পর্কে আলোচনায় অনিচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণগুলি দেখা যায়।

চিকিৎসার দিক দিয়ে সামরিক ক্ষেত্রগুলির সংগে নাগরিক ক্ষেত্রগুলির বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তবে সামরিক ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তিকে আবার সেই পরিস্থিতিতে ফিরে আসতে হয় এবং সেই জন্য সামরিক ঘটনাবলীর সম্মুখীন হবার উপযোগী করে তাকে প্রস্তুত করাও চিকিৎসার একটি অংগ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু নাগরিক দুর্ঘটনাগুলিতে ব্যক্তির পুনরায় এই ধরনের কোন ঘটনার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে না বলে তার ক্ষেত্রে চিকিৎসা আরও সহজতর হয়।

স্থায়ী পারিবেশিক চাপ থেকে সঞ্জাত অসুস্থতা

অনেক সময় ব্যক্তির নিজস্ব স্থায়ী পরিবেশটি এমন প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে যার ফলে তার মধ্যে স্থায়ী প্রকৃতির ভীতি, অসন্তোষ বা নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের পরিবেশে ব্যক্তি নিয়ত একটি মানসিক চাপ অনুভব করে চলে, যার ফলে তার প্রতিরোধের সীমা ছাড়িয়ে গেলে সে মনোব্যাধির রোগী হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে নানা কারণে এই ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রতিকূল পরিবেশের সংগে যখনই ব্যক্তি ঠিক মত সংগতি বিধান করে চলতে পারে না তখনই তার মধ্যে মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। এই সব লক্ষণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল নিরতিশয় ক্লান্তিবোধ, কর্মদক্ষতার অভাব, অতিরিক্ত মদ্যপান, বার বার বৃত্তি পরিবর্তন, সংসার যাপনে উদাসীনতা, চরমপন্থী রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় দলে যোগদান ইত্যাদি। এই ধরনের অবস্থা বেশীদিন চলতে থাকলে ব্যক্তির জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রচণ্ড নিশ্চেষ্টতা দেখা দেয় এবং ব্যক্তি উৎসাহবর্জিত ও লক্ষ্যহীন ভাবে জীবন কাটায়।

এই ধরনের পারিবেশিক চাপ থেকে সৃষ্ট মনোবিকারের চিকিৎসার প্রধান পন্থা হল ঐ বিশেষ পরিবেশ থেকে ব্যক্তিকে সরিয়ে আনা। কিন্তু এ চিকিৎসা সব সময় সম্ভব হয় না এবং অনেক সময় বাঞ্ছিতও নয়। যেমন যে শিশু বিদ্যালয়ে পারিবেশিক চাপ অনুভব করছে তাকে বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে আনা তার চিকিৎসার উপায় নয়। সেই জন্য যেখানে ব্যক্তিকে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয় সেখানে ব্যক্তি যাতে সেই পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ সঙ্গতিবিধান করে চলতে সমর্থ হয় এবং ঐ প্রতিকূল পরিবেশকেই যতটা সম্ভব নিজের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করতে পারে সেই সম্বন্ধে তাকে উপযুক্ত শিক্ষণ দেওয়া দরকার। মানসিক চিকিৎসার মাধ্যমে সে যাতে তার অনুপযোগী মনোভাবগুলি বদলে ফেলতে পারে তার আয়োজন করতে হবে এবং দেখতে হবে সে যেন তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে এগিয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ

1. What are transient situational disorders ? Discuss its characteristics, causes and treatment.

দশ

মনোব্যাধিমূলক অসুস্থতা (Psychoneurotic Disorders)

মানসিক ব্যাধি বোঝাতে সাইকোনিউরসিস কথাটি ফ্রয়েডই প্রথম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। ফ্রয়েড নিউরসিস ও সাইকোনিউরসিস শব্দ দুটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর মতে নিউরসিস বলতে সেই সব রোগকে বোঝায় যেগুলি যৌনমূলক উত্তেজক পদার্থের নিঃসরণের মাত্রার উপর নির্ভর করে আর সাইকোনিউরসিস বলতে সেই সব ব্যাধিকে বোঝায় যেগুলি নিছক মন থেকে সঞ্জাত। বর্তমানে নিউরসিস এবং সাইকোনিউরসিস কথা দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাইকোনিউরসিস বা মনোব্যাধির ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এমন সব অস্বাভাবিক বিকাশ-প্রবণতা দেখা দেয় যার ফলে ব্যক্তি তার পারিবেশিক সমস্যাগুলির ঠিকমত মূল্যায়ন করতে পারে না, তার ব্যক্তিগত এবং সমাজগত সংগতিবিধান খুব নিম্নশ্রেণীর হয়ে পড়ে এবং তার মধ্যে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই অসুস্থ ও অস্বাভাবিক বিকাশ-প্রবণতাগুলির সুরু হয়েছে অনেক আগে, এমন কি ব্যক্তির অতি শৈশবে। সে সময় তার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে তার নিজের প্রতি এবং বস্তুজগতের প্রতি অপরিণত এবং ত্রুটিপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা মানসিক রোগে ভুগলেও তারা যে গুরুতরভাবে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিন কাটায় তা নয়। এমন কি তাদের আচার-আচরণও দুর্দান্ত প্রকৃতির হয়ে ওঠে না। কিন্তু তারা মানসিক অশান্তিতে কষ্ট পায়, সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে এবং পূর্ণভাবে নিজেদের অভিব্যক্ত করতে পারে না। এদের স্বাভাবিক ও সহজ জীবন ফিরে পেতে হলে মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য।

বর্তমানে মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা সব দেশেই বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান রাখা হয় না বলে এখানকার মনোব্যাধিগ্রস্তদের সংখ্যা ঠিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমেরিকার মত দেশে কম করে ধরলেও এক কোটির মত লোক মনোব্যাধিগ্রস্ত বলে বিশ্বাস করা হয়। তাছাড়া এও দেখা গেছে সাধারণত যারা শারীরিক ব্যাধির অভিযোগ নিয়ে ডাক্তারের দরজায় যায়

তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ জনই মনোব্যাধিগ্রস্ত। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও কর্মীদের অসুস্থতার জন্য মোট যে সময় নষ্ট হয়, দেখা গেছে যে তার শতকরা ৬০ ভাগই কোন না কোন প্রকারের মানসিক ব্যাধির জন্যই ঘটে থাকে।

পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যে মনোব্যাধির সংখ্যা বেশী। এর কারণ হল যে আমাদের সমাজে পুরুষ মানসিক অপসংহতি দূর করবার অনেক বেশী সুযোগ পেয়ে থাকে এবং তার ফলে তার মনোব্যাধিমূলক উত্তেজনা কমে যাবার বেশী সম্ভাবনা থাকে। মেয়েদের সে সুযোগ কম থাকায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

অনেকের ধারণা যে নিউরসিস বা মনোব্যাধি সাইকোসিস বা মনোবিকারের প্রাথমিক স্তর মাত্র। কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে মনোব্যাধি এবং মনোবিকার প্রকৃতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের মানসিক অসুস্থতা। তাছাড়া এও প্রমাণিত হয়েছে যে মনোব্যাধিগ্রস্তদের মধ্যে শতকরা ৪ থেকে ৭ জন মাত্র পরে মনোবিকারে আক্রান্ত হয়। বাকী রোগীদের মধ্যে পরে মনোবিকারের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাছাড়া যে শতকরা ৪ থেকে ৭ জনকে মনোবিকারগ্রস্ত হতে দেখা যায় তাদের সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে যে প্রথম দিকে তাদের রোগ-নির্ণয়ে ভুল থাকা খুবই সম্ভব। অর্থাৎ তারা প্রথম থেকেই মনোবিকারেই আক্রান্ত ছিল।

মনোব্যাধির কারণ (Causes of Neurosis)

মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে বহু ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে। কিন্তু এর যথার্থ কারণ নির্ণয় করা হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে। মনোব্যাধির যথার্থ কারণ নির্ণয়ের অধিকাংশ কৃতিত্ব ভিয়েনাবাসী প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডেরই প্রাপ্য। ফ্রয়েডের পূর্বে মনোব্যাধির গবেষণায় যাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে বার্নহিম (**Bernheim**), জেনেট (**Janet**) চারকো (**Charcot**), ফ্রয়েডের সহকর্মী ব্রুয়ার (**Breur**) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের গবেষণা থেকে মোটামুটি এইটুকু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল যে মনোব্যাধির প্রকৃত কারণ ব্যক্তির মনের মধ্যে তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায় নিহিত থাকে। এবং এই নিহিত ও অজ্ঞাত কারণটিকে প্রকাশ্যে বার করে আনতে পারলে ব্যক্তির মনোবিকারের লক্ষণগুলি নিজে নিজেই অবলুপ্ত হয়।

এই তথ্যকে অবলম্বন করে ফ্রয়েড তাঁর যুগান্তরকারী গবেষণা সুরু করেন

এবং মানব মনের অজ্ঞাত রহস্য সম্পর্কে বহু নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই তত্ত্বগুলিকে ভিত্তি করে মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) নামে মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা গড়ে ওঠে। মানব মনের অচেতন (unconscious) নামক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অংশের পরিকল্পনাটি, তাতে নিহিত বহু অতৃপ্ত ও অসামাজিক কামনা, বাস্তবের চাপে অবাঞ্ছিত কামনার অবদমন, অতৃপ্ত কামনা থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, প্রক্ষোভমূলক সংঘর্ষ থেকে মনের সমতার হানি, মৌলিক মানব কামনাগুলির যৌনাত্মক রূপ ইত্যাদি সম্পূর্ণ নতুন এবং বৈপ্লবিক প্রকৃতির ধারণাগুলির সাহায্যে ফ্রয়েডের এই নতুন মনোবিজ্ঞানটি গড়ে উঠেছিল। এই মনোবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে ফ্রয়েড প্রথম নিউরসিস বা মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ে সক্ষম হন।

মনোব্যাধি বা নিউরসিসের কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। এর পেছনে কোন মস্তিষ্কগত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই। ব্যক্তির কোনও মানসিক অসঙ্গতি বা বিক্ষোভ থেকে মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেইজন্য মনোব্যাধির সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব বলে মনশ্চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করেন।

ব্যক্তির চারপাশের বস্তুজগতের দাবী বা চাহিদা মেটাতে অসামর্থ্য এবং তা থেকে জাত অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকেই মনোব্যাধির কারণ বলা চলে। কিন্তু বস্তুজগতের এই দাবী বা চাহিদা বলতে স্থূল দাবী বা চাহিদাগুলিকে বোঝায় না। এই দাবী বা চাহিদাগুলি প্রধানত ব্যক্তির মন থেকে তৈরী অর্থাৎ সেগুলি পুরোপুরি মনোজাত। সেই জন্য এর মূলকারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অচেতন স্তরে এবং সেই অলক্ষ্য অজ্ঞাত মানসধর্মী স্তরে না পৌছতে পারলে ঐ মনোব্যাধির প্রকৃত কারণটিই খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন, আমাদের চারপাশের যে সব সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বা ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় সেগুলির ভয় যতটা না আমাদের বিক্ষুব্ধ করে তার চেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ করে সেই সব পরিস্থিতি এবং অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অন্তর্নিহিত কমপ্লেক্স বা প্রক্ষোভগুলি। যেমন, রোগ, বোমা পড়া, যুদ্ধ ইত্যাদিকে আমরা তেমন ভয় করি না। কিন্তু ঐ সব পরিস্থিতিতে যে আমরা নিজেদের কাপুরুষ প্রতিপন্ন করে তুলতে পারি তারই ভয় আমাদের মনকে বেশী করে পীড়িত করে তোলে। এক কথায় মনোব্যাধির ক্ষেত্রে বিপদের সত্যকারের উদ্দীপক বাইরে থেকে আসে না, আসে ভেতর থেকে। যেমন ভয়ে যে ব্যক্তি হিষ্টিরিয়ায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে তার ভয়ের কারণ এমন নয় যা থেকে সে পালাতে পারে না, বরং সে পালাতে চায় না বলেই তার মনে ভয় সৃষ্টি হয়েছে। অবসেসান বা বাধ্যতাধর্মী-চিন্তায় ভুগছে যে ব্যক্তি সে

এমন নয় যে তাকে সমাজের দাবী বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছে এবং তা থেকে তার পরিত্রাণ নেই। বরং সে নিজে থেকেই সমাজের দাবী মেনে নিয়েছে এবং সেগুলির সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতিবিধান করতে পারছে না বলেই তার মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দিয়েছে। এক কথায় মনোব্যাধিতে যে সঙ্কট বা সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে তা পূর্ণভাবে ব্যক্তির মনোগত।

মানুষকে ছ'ধরনের সঙ্গতিবিধান করে পৃথিবীতে বাঁচতে হয়। এক শরীরের দিক দিয়ে, আর এক, মনের দিক দিয়ে। বস্তুজগতের উত্তাপ, আলো, জল, হাওয়া, জীবাণু ইত্যাদির সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিসাধন করে তাকে তার দৈহিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হয়। যদি সে তা না পারে তাহলে তার মধ্যে দৈহিক ব্যাধি দেখা দেয়। তেমনই যে সব পারিবেশিক শক্তি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলির সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতিসাধন করতে না পারলে তার মধ্যে মানসিক ব্যাধি দেখা দেবে। অতএব মনোব্যাধির কারণ হল মানসিক জগতের সঙ্গে ব্যক্তির ভুল বা অসম্পূর্ণ সঙ্গতিবিধান। ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধানের ত্রুটি বা অক্ষমতা নানা অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। ছোটখাট ভুল, নানারকম স্বপ্ন, অদ্ভুত আচরণ ইত্যাদি ব্যক্তির এই মানসিক অপসঙ্গতিকে ব্যক্ত করে তোলে। তবে যখন এই অপসঙ্গতি অত্যন্ত তীব্র এবং গভীর হয়ে ওঠে তখনই তা মনোব্যাধির পর্যায়ে পড়ে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

পূর্বগামী ও সংঘটক কারণ

(Predisposing and Precipitating Causes)

মনোব্যাধির কারণকে সাধারণত ছ' ভাগে ভাগ করা হয়, প্রত্যক্ষ বা সংঘটক (Precipitating) কারণ ও পূর্বগামী বা পরোক্ষ (Predisposing) কারণ। আঘাতাত্মক মানসিক অসঙ্গতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কারণই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, মোটর দুর্ঘটনা, যুদ্ধকালীন অবসন্নতা, পারিবেশিক চাপ, প্রিয়জনের মৃত্যু, ব্যবসায়ে ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণজাত অস্থায়ী ব্যক্তিসত্তার অসুস্থতার[১] ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কারণই প্রধানত দায়ী। কিন্তু প্রকৃত মনোব্যাধির ক্ষেত্রে পরোক্ষ কারণের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একই ধরনের আঘাতে একজনকে ভেঙে পড়তে দেখা যায়, অথচ আর একজনকে দেখা যায় সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকতে। একটি মেয়ে তার প্রেমিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় দেখা গেল যে সে এতই হতাশ হয়ে পড়েছে যে সে আত্মহত্যা করতে চলেছে। অথচ অপর একটি মেয়ে একই ভাবে

১। অস্থায়ী পরিবেশজাত ব্যক্তিসত্তার অসুস্থতার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৮৪।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। হঠাৎ কোন সুস্থ ও সবল মানুষকে দেখা গেল যে সে তার আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলেছে এবং তার আগের জীবনের সব কথা ভুলে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিংবা আর একজন হঠাৎ গির্জার দেওয়ালে ভার্জিন মেরী ও শিশু যিশুর ছবি দেখে অন্ধ হয়ে গেল। এসব ক্ষেত্রে নিশ্চয় আমরা প্রত্যক্ষ কারণকে বড় বলতে পারি না। কেননা এখানে ব্যাধির গুরুত্বের তুলনায় প্রত্যক্ষ কারণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অতএব এ সব ক্ষেত্রে পরোক্ষ বা পূর্বগামী কারণকেই সব চেয়ে শক্তিশালী কারণ বলে মনে করতে হবে।

মনোব্যাধি বা নিউরসিসের পূর্বগামী কারণকে এক কথায় মনোব্যাধিমূলক সংগঠন (Neurotic Constitution) বলা যেতে পারে। মনোব্যাধিমূলক সংগঠনকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতি (Neurotic Temperament) এবং মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা (Neurotic Disposition)।

মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতি (Neurotic Temperament)

মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতিটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা খুবই সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ এবং সহজেই বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হয়ে থাকেন। অনেক শিল্পী ও কবি মনঃপ্রকৃতির দিক দিয়ে খুবই অনুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যে সকলেই নিউরটিক হবেন তার কোন অর্থ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যকারের মনোব্যাধিসম্পন্ন মনঃপ্রকৃতি নিয়ে জন্মে থাকে সে কোনরকম মানসিক আঘাত পেলেই মনোব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যাদের মনঃপ্রকৃতিতে কোন রকম দুর্বলতা থাকে না, তারা অল্পবিস্তর মানসিক আঘাত পেলেও তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা (Neurotic Disposition)

আবার অনেক ক্ষেত্রে মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতি না থাকা সত্ত্বেও অনেকে মনোব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এর কারণ হল যে তাঁদের মধ্যে মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা সৃষ্ট হয়েছে। মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা কোনও শারীরিক কারণের উপর নির্ভর করে না। এটি পুরোপুরি মানসধর্মী। শৈশবের কোন অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা থেকে শিশুর মনে কোন মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা বা কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তার ফলে তার মধ্যে মনোব্যাধি সৃষ্টি হবার উপযোগী একটা মনোভাব তৈরী হয়ে যায় এবং যখনই পরবর্তী জীবনে তাকে কোনও আঘাতাত্মক

পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তখনই শৈশবের সেই মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা বা কমপ্লেক্স জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির মধ্যে মনোব্যাধির সৃষ্টি করে। শৈশবের সেই অভিজ্ঞতাগুলি তার মনের অবচেতন স্তরে অবদমিত হয়ে তার বিস্মৃতির গর্ভে চলে যায় বটে কিন্তু যখনই পরবর্তী জীবনে ব্যক্তি কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখনই তার সেই অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতাগুলি জেগে ওঠে এবং তার সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে আরও কঠিন করে তোলে।

একটা বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রায়ই এক মত যে নিউরসিসের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল তার পরোক্ষ কারণটি এবং এই পরোক্ষ কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অতি-শৈশবকালীন কোন প্রতিকূল বা আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতার মধ্যে। প্রায়ই বিশ্লেষণের সময় দেখা যায় মনোব্যাধির রোগীর মন অতীতের কোন বিশেষ ব্যাপার বা অভিজ্ঞতায় সংবদ্ধ থাকে। একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় সংবন্ধন (fixation) বলা হয়। সকল মনোব্যাধির ক্ষেত্রে সংবন্ধন থাকবেই। যখনই মনোব্যাধি দেখা দেয় তখনই ব্যক্তির অহংসত্তা সেই সংবন্ধনের দিনগুলিতে ফিরে যায় এবং শৈশবকালীন অস্বাভাবিক আচরণ ও মিথ্যা কল্পনার মধ্য দিয়ে নিজের অবদমিত কামনার তৃপ্তি খোঁজে। ব্যক্তি তার সেই শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্র থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে জানে না কেমন করে তা থেকে সে মুক্তি পাবে। ফলে সে তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ থেকে পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে যেন তার ব্যাধির দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত হয়ে একটি দ্বীপের মত বাস্তব জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে বাস করে।

ফ্রয়েডের মতবাদ (Theory of Freud)

মনোব্যাধি বা নিউরসিসের কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ পরীক্ষণপ্রসূত, সুচিন্তিত এবং অপূর্ব প্রতিভা-সমুজ্জ্বল তাঁর দেওয়া এই মানসিক ব্যাধির ব্যাখ্যাটি যেমন বিপ্লবধর্মী তেমনই বহু বিতর্কের সৃষ্টিকারী।

তাঁর মতে মনোব্যাধি প্রকৃতপক্ষে রোগীর যৌনজীবনের কোন অন্তর্নিহিত গোপন কামনা থেকে উদ্ভূত। সেই যৌন কামনার পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টাই মনোব্যাধির লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। যে সব যৌন ইচ্ছা সে বাস্তবে পূর্ণ করতে পারে না সেই ইচ্ছাগুলিরই বিকল্প আচরণরূপে এই লক্ষণগুলি দেখা দেয়। সেই জন্য মনোব্যাধি মাত্রেই হল যৌনধর্মী এবং কোন অসামাজিক গোপন ইচ্ছার পরিতৃপ্তির জন্য সমাজসম্মত প্রচেষ্টা বিশেষ।

ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় মনোব্যাধির লক্ষণগুলির উদ্দেশ্য হয় কোন যৌনকামনার পরিতৃপ্তির প্রয়াস কিংবা কোন যৌনকামনার বিরুদ্ধে ব্যক্তির প্রতিরোধের প্রচেষ্টা। হিষ্টিরিয়াতে এই যৌনকামনার পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টাই প্রবল, কিন্তু অবসেসানের ক্ষেত্রে অবদমিত কামনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রয়াসই প্রধান।

ফ্রয়েড নিউরসিসের সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ কারণের ভূমিকাকে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর মতে শৈশবকালীন লিবিডোর সংবন্ধনই মনোব্যাধির প্রধান কারণ। শৈশবকালে লিবিডোর অগ্রগতির সময় কোন কারণবশত ব্যক্তির লিবিডো কোন বিশেষ যৌন-আসক্তির স্থলে সংবন্ধ হয়ে থাকে। ব্যক্তির পরিণত বয়সে যখন কোন বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতার জন্য লিবিডোর সম্মুখগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন লিবিডো তার সেই অতীতের সংবন্ধনের ক্ষেত্রে আবার ফিরে আসে। একে বলা হয় লিবিডোর প্রত্যাবর্তন (Regression)। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যক্ষ কারণ যতই প্রবল হোক না কেন, এই শৈশবকালীন লিবিডোর আসক্তি যদি তার পরিণত জীবনের লিবিডোকে পেছন থেকে আকর্ষণ না করে তাহলে মনোব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে না। এক কথায় ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন হল মনোব্যাধির পরোক্ষ কারণ এবং যে আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতার জন্য লিবিডোর সেই শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন হয় সেটি হল মনোব্যাধির প্রত্যক্ষ কারণ।

এই যদি মনোব্যাধির কারণ হয় তাহলে প্রত্যাবর্তিত লিবিডোকে তার শৈশবকালীন সংবন্ধন-স্থল থেকে মুক্ত করাই হল মনোব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র উপায়। লিবিডোকে বিস্মৃত অতীতের সেই সংবন্ধন-স্থল থেকে মুক্ত করার একমাত্র পন্থা হল অচেতন বিশ্লেষণ। ব্যক্তির অচেতনের অন্ধকার গহ্বরে নিহিত যে শৈশব আসক্তির স্থলটিতে লিবিডো সংবন্ধ হয়ে আছে সেই শৈশব-আসক্তির স্বরূপটি যদি অচেতন থেকে তুলে ব্যক্তির সচেতনে আনা যায় তাহলেই লিবিডোর সংবন্ধনের ছেদ ঘটে এবং ব্যক্তির লিবিডো তার স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় পথে অগ্রসর হতে পারে অর্থাৎ এককথায় তার মনোব্যাধির নিরাময় হয়। অচেতন বিশ্লেষণের পদ্ধতিরূপে ফ্রয়েড তাঁর প্রসিদ্ধ মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) পদ্ধতিটির উদ্ভাবন করেন এবং বর্তমানে এই পদ্ধতিটি মনশ্চিকিৎসকদের সমাজে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইউঙের মতবাদ (Theory of Jung)

ফ্রয়েডের প্রাক্তন সহকর্মী ইউঙ মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত

হন নি এবং একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে শৈশবকালীন সংবন্ধন মনোব্যাধির সৃষ্টির অপরিহার্য কারণ নয়। মনোব্যাধির সৃষ্টির প্রকৃত কারণ হল কোন বর্তমান সমস্যার সমাধানে বা কোন বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের ব্যক্তির অসামর্থ্য। এই অসামর্থ্য যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তির লিবিডো তার শৈশবকালীন জীবনযাত্রা ও আচরণধারাতে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দেয়। ইউঙের মতে মনোব্যাধি যে সব সময় অবদমিত যৌনকামনা থেকে জন্মায়, তা নয়। যখন ব্যক্তির বর্তমান জীবনযাত্রায় সহনাতীত কোন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা বা একান্ত জটিল সমস্যার চাপে তার স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধান নষ্ট হয়ে যায় তখনই তার শৈশবকালীন আচরণধারা তার মধ্যে পুনরায় দেখা দেয়। এই শৈশবকালীন সঙ্গতিবিধানের প্রয়াসগুলি বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপর্যাপ্ত হওয়ায় সেগুলি তার কোন কাজেই লাগে না এবং তার বর্তমান সঙ্গতিবিধান আরও দুরূহ ও অক্ষম হয়ে ওঠে।

অতএব ইউঙের মতে মনোব্যাধির চিকিৎসায় অচেতনের বিশ্লেষণের কোনও প্রয়োজন নেই। যে প্রত্যক্ষ কারণ থেকে ব্যক্তির মনোব্যাধি দেখা দিয়েছে সেই প্রত্যক্ষ কারণটি দূর করাই হল মনোব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র উপায়। 'তার পথ থেকে জীবনের বাধাটা দূর করে দাও দেখবে তার ব্যাধি সেরে গেছে'— এই হল ইউঙের কথা। সেই জন্য ইউঙের মনোব্যাধি চিকিৎসার পদ্ধতির মূলকথা হল ব্যক্তির বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে পরীক্ষা করা এবং যে প্রত্যক্ষ কারণ থেকে তার মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দিয়েছে সেই কারণটি দূর করা।

এ্যাডলারের মতবাদ (Theory of Adler)

ফ্রয়েডের আর একজন প্রাক্তন সহকর্মী প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী এ্যাডলার (Adler) মনোব্যাধির কারণের তৃতীয় একটি সংব্যাখ্যান দিয়েছেন।

এ্যাডলারও ইউঙের মত অচেতনের অবদমিত কামনাকে মনোব্যাধির কারণ বলে বর্ণনা করেন না। এমন কি তিনি লিবিডোর প্রত্যাবর্তনকেও—যা ইউঙও মেনে নিয়েছেন—মনোব্যাধির কারণ বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে মনোব্যাধির কারণ পাওয়া যাবে ব্যক্তির হীনমন্যতার অনুভূতির মধ্যে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোনও না কোনও প্রকারের হীনতার বোধ আছে। এই হীনতার বোধকে পরিপূরণ করার জন্য ব্যক্তি তার সামনে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অবাস্তব একটি লক্ষ্য সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু নিজের প্রকৃত সামর্থ্যের অভাবের জন্য এই লক্ষ্যে

পৌছান তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে তার এই স্থিরীকৃত লক্ষ্য এবং তার প্রকৃত সামর্থ্য এ দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান দেখা দেয়। তার ফলে তার মানসিক সাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মধ্যে মনোব্যাধি সৃষ্ট হয়। এ্যাডলারের মতে মনোব্যাধির মূল কারণ ব্যক্তির জীবনযাত্রার ধারার (style of life) অসঙ্গতির মধ্যেই নিহিত। এই জীবনযাত্রার ধারা যদি তার সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণই থাকে না। কিন্তু যদি কোন কারণে এই জীবনযাত্রার ধারা তার সামর্থ্যের চেয়ে অতিরিক্ত হয়ে ওঠে তাহলে তার মধ্যে ব্যর্থতা দেখা দেয় এবং মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মনোব্যাধির সংব্যাখ্যানে এ্যাডলার অচেতন, লিবিডোর সংবন্ধন, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ফ্রয়েডীয় ধারণাগুলিকে একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এ্যাডলারের মতে মনোব্যাধির চিকিৎসায় ব্যক্তিকে তার স্থিরীকৃত জীবনযাত্রার ধারার মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে সেটি দেখিয়ে দিতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার লক্ষ্য তার প্রকৃত সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং যাতে সে সামর্থ্যানুগ ও বাস্তবধর্মী একটি লক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।

মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ে আধুনিক ব্যাখ্যা

মনোব্যাধির প্রকৃতি ও কারণ নির্ণয়ে ফ্রয়েডের পূর্বস্থরিত্ব সকলে বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেও মনোব্যাধির রহস্য নিয়ে ফ্রয়েডের পরেই বহু প্রতিভাবান চিকিৎসক গবেষণা করেছেন। তার ফলে মনোব্যাধি সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েডের অনেক ধারণা বা অভিমত আধুনিক কালের অনেক মনোবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। তার ফলে মনোব্যাধির কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা উভয় ক্ষেত্রেই নতুন পদ্ধতি ও পন্থার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে মনোব্যাধির কারণ নির্ণয় বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডোত্তর মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসকেরা যথেষ্ট নতুনত্ব ও পরিবর্তন আনলেও উভয় ক্ষেত্রেই মৌলিক সংগঠনটি ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এক কথায় ফ্রয়েডোত্তর চিকিৎসা-পদ্ধতি ফ্রয়েডীয় ধারার সংস্কার করেছে মাত্র, তাকে পরিত্যাগ করেনি।

আধুনিক ব্যাখ্যায় মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ে চারটি বিষয়ের অনুসন্ধান করতে হবে। সেগুলি হল (১) পূর্বগামী কারণ (Predisposing factors)

২। শৈশবের বিকাশমূলক ধারা (Developmental Pattern of Childhood) ৩। সংঘটক কারণ (Precipitating Cause) ৪। কৃষ্টিমূলক কারণ (Cultural Factors)। এই চারটি কারণের মধ্যে শৈশবের বিকাশমূলক ধারা রূপ কারণ এবং সংঘটক কারণ—এ ছুটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় এই ছুটি কারণেরই উল্লেখ করা হয়েছিল।[১] মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা বলতে ফ্রয়েডপন্থীরা যা বুঝিয়েছেন 'শৈশবের বিকাশধারা' বলতে সেই কারণটিকেই বোঝান হয়েছে। মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ে আধুনিক ব্যাখ্যাতে যে নতুন কারণটির উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল কৃষ্টিমূলক কারণ। কৃষ্টিমূলক কারণটি আধুনিক সংযোজন। বর্তমান সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক পরিবেশের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হলেও মৌলিকতার দিক দিয়ে অন্যান্য কারণের মত এই কারণটি অত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১। পূর্বগামী কারণ (Predisposing Factors)

পূর্বগামী কারণ বলতে বর্তমানে জীবতত্ত্বমূলক বা শরীরতত্ত্বমূলক কারণকেই বোঝায়। এগুলি ব্যক্তির মধ্যে কতখানি মনোব্যাধি সৃষ্টি করতে সমর্থ সে সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে জন্মের সময় শিশু এমন কোন শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মাতে পারে, যা থেকে তার মধ্যে মনোব্যাধি সৃষ্টির প্রবণতা দেখা দিতে পারে। বলাবাহুল্য এ ধরনের কারণ শিশুর বংশধারার অন্তর্গত।

মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ে শরীরতত্ত্বমূলক কারণের উপর মনশ্চিকিৎসকেরা বিশেষ গুরুত্ব দেন না। কেননা অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীদের মতেই মনোব্যাধির ক্ষেত্রে ব্যক্তির বংশধারার বিশেষ কোন প্রভাব নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে বংশধারাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে মানবদেহের জননকোষের ক্রোমোজমের মধ্যে যে জিন পাওয়া যায় সেগুলির সংগঠন পরীক্ষা করে এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে জিনের মধ্যে যে DNA নামে রাসায়নিক উপাদানটি আছে তার মধ্যে যদি কোন বিকৃতি দেখা যায় তাহলে ব্যক্তির মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দেবার খুবই সম্ভাবনা থাকে।[২] এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে মোঙ্গলিজম্, ক্রেটিনিজম্ প্রভৃতি গুরুতর মনোবিকারের ক্ষেত্রগুলিতে জিনের অভ্যন্তরস্থ DNA'র বিকৃতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

সাধারণ অনুসন্ধান থেকেও দেখা গেছে যে পিতামাতার মধ্যে যদি মনোব্যাধি

১। পৃঃ ৯৬ ২। পৃঃ ৬২

থেকে থাকে তাহলে সেই বংশে পরবর্তীকালে মনোব্যাধিগ্রস্তদের সংখ্যা বেশী হয়। এর দ্বারা মনোব্যাধির সৃষ্টিতে বংশধারার প্রভাব যে কিছুটা কার্যকরী এ কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু সাধারণভাবে মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ন বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বংশধারামূলক কারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার মত যথেষ্ট প্রমাণ এখনও মনোবিজ্ঞানীদের হাতে এসে পৌছয় নি।

ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় পূর্বগামী কারণকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতি ও মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা। তার মধ্যে মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতিটি এই পর্যায়ে পড়ে। মনোব্যাধিমূলক প্রবণতাটি শৈশবের বিকাশধারার সঙ্গে অভিন্ন।

২। শৈশবের বিকাশধারা

(Childhood Developmental Pattern)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শৈশবের বিকাশধারার উপরই মনোব্যাধির কারণ নির্ণয়ে সত্যকারের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে শিশু জন্মের পর যে ভাবে মানুষ হয় এবং তার শৈশবে পিতামাতার সঙ্গে তার যে ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার উপরই তার মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। যদি শিশুর সঙ্গে তার পিতামাতার সম্পর্ক সন্তোষজনক না হয় তাহলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তার ফলে সে তার পরিবেশের ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন করে অর্থাৎ সে তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তিকে ভুল বোঝে। এই মানসিক অসঙ্গতিরই নাম দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীভূত মনোব্যাধিমূলক প্রক্রিয়া (Nuclear neurotic process)। এই প্রক্রিয়া যদি প্রলম্বিত হয় তাহলে শিশুর মনে ভবিষ্যতে মনোব্যাধি সৃষ্টির অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী হয়ে থাকে। সাধারণত দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক অবস্থার পুঞ্জীভূত ফলরূপে এই মনোব্যাধিমূলক প্রক্রিয়াটি সুরু হয়ে থাকে, কিন্তু আবার কখনও কখনও কোন শৈশবকালীন ভীতিকর আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা থেকেও এই প্রক্রিয়ার সূচনা হতে পারে।

শিশুর মানসিক সাম্য সবচেয়ে বেশী নষ্ট করে দেয় পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যজন বা গুরুতর শাস্তির ভয়। তার ফলে শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা, ভয় প্রভৃতি মনোভাব জেগে থাকে। অনেক সময় পিতামাতা যদি শিশুকে অবহেলা করেন তাহলে তার মধ্যে পিতামাতার প্রতি বৈরীভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পিতামাতার মনোযোগ হারাবার আশঙ্কায় কিংবা তাঁদের প্রতিহিংসার ভয়ে শিশু তার মনের

বৈরীভাব প্রকাশ করে না। ফলে বৈরীভাব থেকে সৃষ্টি হয় দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা তার বৈরীভাবকে বাড়িয়ে দেয় এবং এই বর্ধিত বৈরীভাব তার মধ্যে অধিকতর দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে। এইভাবে এক অন্তহীন চক্রের সৃষ্টি হয়। শিশু ও পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে অনেক সময় পিতামাতার অজ্ঞাতসারে যৌনাকর্ষণের উপাদান থাকতে পারে এবং তা থেকে শিশুর যৌন কামনা উদ্দীপিত হতে পারে। এ থেকে শিশুর মধ্যে অপরাধের অনুভূতি, শাস্তির ভয়, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতির সৃষ্টি হতে পারে। আধুনিক মনশ্চিকিৎসকগণ এই ধরনের শিশুর বিকাশমূলক অসংগতিগুলিকে পরবর্তী জীবনে মনোব্যাধি সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করেন এবং মনোব্যাধির কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য শিশুর শৈশবকালীন বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য বলে গণ্য করেন।

দেখা যাচ্ছে যে ফ্রয়েড যাকে পূর্বগামী কারণ বলে বর্ণনা করেছেন আধুনিক মনশ্চিকিৎসকগণ তাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম, শরীরতত্ত্বমূলক কারণ এবং দ্বিতীয়, শিশুর শৈশবকালীন বিকাশ ধারা। ফ্রয়েডও মনোব্যাধির পূর্বগামী কারণকে মনোব্যাধিমূলক সংগঠন (Neurotic Constitution) নাম দিয়েছেন এবং তাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, প্রথম মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতি (Neurotic Temperament) এবং দ্বিতীয় মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা (Neurotic Disposition)। আধুনিক সংব্যাখ্যানে যাকে শরীরতত্ত্বমূলক কারণ বলা হয়েছে তার সংগে ফ্রয়েডের এই মনোব্যাধিমূলক মনঃপ্রকৃতি অভিন্ন। আবার যাকে মনোব্যাধিমূলক প্রবণতা বলা হয়েছে তার সংগে শৈশবকালীন বিকাশধারার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

৩। প্রত্যক্ষ বা সংঘটক কারণ (Precipitating Cause)

ব্যক্তির মধ্যে মনোব্যাধি সৃষ্টির অনুকূল মানসিক অবস্থা থাকলেও প্রত্যক্ষ বা সংঘটক কারণ ছাড়া নিউরসিস বাস্তবে দেখা দেয় না। মনোব্যাধির সংঘটক কারণ নানা প্রকারের হতে পারে। বহু বিভিন্ন প্রকৃতির মনোব্যাধির ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে আধুনিক মনশ্চিকিৎসকেরা কয়েকটি প্রধান সংঘটক কারণের উল্লেখ করেছেন। যথা—

প্রথমত, শৈশবে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করেছিল এমন কোনো অভিজ্ঞতার

পুনরাবির্ভাব বা কোনও কারণবশত তার তীব্রতার অতিরিক্ত মাত্রাবৃদ্ধি ব্যক্তির মধ্যে মনোব্যাধি সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণরূপে কাজ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির অহংসত্তার প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে যাওয়া বা পরিবেশের চাপে ভেঙে পড়ার ভয় তার মধ্যে মনোব্যাধি সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ হতে পারে। যেমন, এমন কোন বিপজ্জনক ইচ্ছা ব্যক্তির মনে উদয় হতে পারে যা বাস্তবের বিরুদ্ধে তার অহংসত্তার প্রতিরক্ষা ভেঙে আত্মপ্রকাশ করার উপক্রম করেছে। তার ফলে তার অহংসত্তার গুরুতর মূল্যহানি হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। কিংবা এমন কোনও অত্যন্ত অস্বাভাবিকপ্রকৃতির চাপমূলক বা আঘাতাত্মক গুরুতর অভিজ্ঞতা ব্যক্তির জীবনে ঘটল যা তার অহংসত্তার প্রতিরোধ ভেঙে ফেলে তার আভ্যন্তরীণ সাম্য নষ্ট করে ফেলতে পারে।

তৃতীয়ত, এমন ঘটনা বা পরিস্থিতি ব্যক্তির জীবনে দেখা দিতে পারে যার সম্মুখীন হবার জন্য ব্যক্তিকে তার প্রতিরক্ষা কৌশলগুলির মাত্রা বা তীব্রতা অতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে তুলতে হতে পারে এবং এই ধরনের বাড়ানোর ফলে ব্যক্তির সহের সীমা পার হয়ে যেতে পারে। যেমন কোনও বিশেষ লক্ষ্যে (যে লক্ষ্যটি বাস্তব বা অবাস্তব দুই-ই হতে পারে) পৌছনোর অসামর্থ্যের ফলে ব্যক্তি তার অক্ষমতা বা ব্যর্থতার অনুভূতি থেকে অহংসত্তাকে বাঁচানোর জন্য তার প্রতিরক্ষা কৌশলের মাত্রা বা তীব্রতা ক্রমশ বাড়িয়ে চলে এবং শেষে এই মাত্রাতিশয্য তার কাছে এতই বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে যে ব্যক্তির পক্ষে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা আর সম্ভব হয় না। আবার ব্যক্তির জীবনে এমন কোনও অত্যন্ত জটিল বা অসম্ভব প্রকৃতির পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যার সম্মুখীন হবার জন্য তার মধ্যে অতিরিক্ত প্রতিরক্ষামূলক আচরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এই আচরণের প্রকৃতি ও মাত্রা তার কাছে এমনই এক গুরুতর বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে যে তার ফলে তার মধ্যে মনোব্যাধিমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

৪। কৃষ্টিমূলক কারণ (Cultural Factors)

আধুনিক পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন কৃষ্টিমূলক দলের মধ্যে মনোব্যাধির প্রসার পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে বিভিন্ন সামাজিক স্তর, বংশগত উৎপত্তি, কিংবা জাতিগত শ্রেণীবিভাজন অনুযায়ী মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আচরণগত প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এ থেকে মনোবিজ্ঞানীরা

সিদ্ধান্ত করেন যে মনোব্যাধির প্রকৃতি নির্ণয়ে কৃষ্টিমূলক বিষয়গুলিরও যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা আছে। একথা অবশ্য সত্য যে সকল রকম কৃষ্টিমূলক দলেই সকল শ্রেণীর মনোব্যাধিরই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন কৃষ্টিমূলক দলে শিশুর সঙ্গে পিতামাতার সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পাওয়া যায়। তার ফলে মনোব্যাধির বিকাশের প্রকৃতিও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া ব্যক্তি যে কৃষ্টিমূলক পরিবেশে বাস করে সেই পরিবেশে বিভিন্ন মানের মধ্যে সংঘাতের প্রকৃতি ও তীব্রতা ব্যক্তির মনোব্যাধির মাত্রা ও প্রকৃতি দুই-ই নির্ণয় করে থাকে। কখনও কখনও ব্যক্তিকে একাধিক কৃষ্টির মধ্যে বাস করতে হয়, যার ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই তাকে মানগত সংঘাতের মধ্যে পড়তে হয় এবং এই সংঘাত তার মনোব্যাধিমূলক আচরণের প্রকৃতি ও গতিপথ নির্ণয় করে। এককথায় বলা চলে যে মনোব্যাধির সৃষ্টিতে কৃষ্টিমূলক সংগঠনের কোনও প্রভাব না থাকলেও মনোব্যাধির লক্ষণের সৃষ্টি ও স্বরূপ নিরূপণে কৃষ্টিমূলক সংগঠনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে।

মনোব্যাধির সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী
(General Characteristics of Neurosis)

বিভিন্ন মনোব্যাধির কতকগুলি এমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য মনোব্যাধির মধ্যে দেখা যায় না। এগুলিকে আমরা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করব। কিন্তু প্রায় সব মনোব্যাধিরই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই রকম কতকগুলি মনোব্যাধির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আমরা নীচে আলোচনা করব।

১। দুশ্চিন্তা (Anxiety)

সমস্ত মনশ্চিকিৎসকই আজ একমত যে মনোব্যাধিমাত্রেরই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল দুশ্চিন্তা। মনোব্যাধির সকল ক্ষেত্রেই গুরুতর ভয়ের অনুভূতি, কোনও দুর্ঘটনা ঘটার ভীতিকর প্রত্যাশা, একটা অস্বস্তিকর সংশয় একান্ত অবশ্যম্ভাবী ভাবেই থাকবে। মনোব্যাধিমূলক দুশ্চিন্তা মূলত ভীতিমূলক হলেও সাধারণ ও স্বাভাবিক ভয় থেকে তা প্রকৃতির দিক দিয়ে যথেষ্ট পৃথক। সাধারণ ভয় হল সত্যকারের বিপদ বা বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্দেশ্যে ব্যক্তির মনের পরিমাপমত মানসিক প্রতিক্রিয়া। আর মনোব্যাধিমূলক দুশ্চিন্তা হল সত্যকারের যা বিপদ বাস্তবে আছে তার তুলনায় অনেক বেশী মাত্রার ভীতিমূলক

প্রতিক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রে আবার এই ভয় অস্পষ্ট ও সাধারণধর্মী হয়ে থাকে। এই ধরনের দুশ্চিন্তাকে ভাসমান বা অসীমিত (free floating or unbound) দুশ্চিন্তা বলা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা সুনির্ধারিত পথে প্রবাহিত হয় কিংবা কোন সুনির্দিষ্ট দৈহিক লক্ষণে প্রকাশ পায় কিংবা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে।

মনোব্যাধিমূলক দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়ে থাকে নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে। এই নিরাপত্তাহীনতার বোধ আবার মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে খুব সামান্য বা স্বল্পমাত্রার পারিবেশিক চাপ থেকে সৃষ্টি হতে পারে। তার কারণ হল যে যদিও বাস্তবে পরিবেশটি তেমন গুরুতর প্রকৃতির নয় তবুও মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সেটিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করতে পারে। বাস্তবে গুরুতর না হলেও পরিস্থিতিটি মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবার কারণ হল যে সেই পরিস্থিতিটি তার মনোব্যাধিমূলক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেবার উপক্রম করে। যেমন যদি কোন বিশেষ পরিস্থিতি মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মনে যৌন প্রকৃতির বা আক্রমণধর্মী তীব্র প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে তবে ঐ পরিস্থিতিটি অতি সাধারণ হলেও ঐ ব্যক্তির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তার মধ্যে মনোব্যাধির জন্ম দেয়। এছাড়া হঠাৎ চাকরী চলে যাওয়া, গুরুতর অর্থনাশ, সাধারণের কাছে সম্মানহানি প্রভৃতি ঘটনাও ব্যক্তিকে অপরের দৃষ্টিতে হেয় করে তোলে এবং তার ফলে তার মনে নিরাপত্তাহীনতার বোধের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাই পরে তার দুশ্চিন্তার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

২। সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করার অক্ষমতা

(Inability to work to capacity)

মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির আর একটি বড় লক্ষণ হল যে তার সামর্থ্য বা সাধ্যানুযায়ী কাজ করতে সে সক্ষম হয় না। অনেক সময় উচ্চস্তরের বুদ্ধি বা প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কাজেকর্মে শোচনীয় ব্যর্থতা দেখা যায়। নানারূপ শারীরিক অক্ষমতা, ভীতি, লাজুকতা, আত্মমগ্নতা, অপরের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কাজের মান নীচু হয়ে পড়ে। কখনও কখনও নিজের অক্ষমতা বা ব্যর্থতার অনুভূতি ঢাকার জন্য ব্যক্তি পরিপূরক আচরণের সাহায্য নেয় এবং কোন সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই কাজে সে হয়তো সাফল্য বা কৃতিত্ব দেখাতে পারে কিন্তু জীবনের অন্যান্য দিক তার কাছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে যায়। যে সাফল্য

সে পায় সেটি বিশেষ কাজের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হলেও জীবনের সর্বাত্মক সাফল্য থেকে সে বঞ্চিতই থেকে যায়।

৩। অপরিবর্তনীয় ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ
(Rigid and Repetitive Behaviours)

মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে জীবন-সমস্যাগুলির সঙ্গে নতুন করে সে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ হয় না। ইতিপূর্বে সে যে আচরণ করে এসেছিল সে আচরণ বর্তমানের পরিবর্তিত পরিবেশে অনুপযোগী হয়ে উঠলেও সে যন্ত্রের মত সেই আচরণই সম্পন্ন করে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে সে একই অপরিবর্তনীয় আচরণ করে চলেছে যদিও কোনও ক্ষেত্রেই তার সঙ্গতিবিধান সুষ্ঠু বা সন্তোষজনক হচ্ছে না। মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির এই অপরিবর্তনীয় আচরণকে কখনও কখনও মনোব্যাধিমূলক নির্বুদ্ধিতা (neurotic stupidity) বলে বর্ণনা করা হয়। বাধ্যতাধর্মী আচরণ (Compulsive behaviour) হল এই ধরনের অপরিবর্তনীয় বা পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া এই ধরনের আচরণের অন্যান্য উদাহরণ হল নির্বিচারে সকলের উপর নির্ভর করা, সব সময়ে সকলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা, সত্যকারের বিপদের আশঙ্কা না থাকলেও দুশ্চিন্তা বোধ করা ইত্যাদি। এই ধরনের অপরিবর্তনীয় আচরণ সম্পন্ন করার একটা ব্যাখ্যা হল যে মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যাধি প্রকৃতপক্ষে সদাপরিবর্তনশীল বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্যে আচরণটি সম্পন্ন করে না। তার মনের মধ্যে যে অচেতন চাহিদার জটিল সংগঠনটি সে তার জীবনের সব পরিস্থিতিতে বহন করে নিয়ে যায় সেই জটিল সংগঠনের উদ্দেশ্যেই তার সকল আচরণ সে সম্পন্ন করে থাকে।

৪। অহংকেন্দ্রিকতা (Egocentricity)

মনোব্যাধির আর একটি সাধারণ লক্ষণ হল যে ব্যক্তির সকল অনুভূতি ও চিন্তা তার অহম্‌কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সে স্বাভাবিক ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী আত্মসচেতন। সে সব সময়েই নিজেকে এবং নিজের পরিবেশকে অপর এবং অপরের পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করে। সে অতিরিক্ত মাত্রায় স্বার্থপর হয় এবং নিজের স্বার্থতৃপ্তির জন্য অপরের কাছে প্রায়ই অযৌক্তিক দাবী করে থাকে। এই দাবী পূর্ণ করার জন্য অনেক সময় নানারকম লক্ষণও তার মধ্যে প্রকাশ পায়। যেমন, অপরের কোনও কাজ বন্ধ করার জন্য তার মধ্যে শারীরিক

ব্যাধি দেখা দিতে পারে বা কাউকে আটকে রাখার জন্য তার মধ্যে অহেতুক ভয়ের (phobia) সৃষ্টি হতে পারে।

৫। অতি-অনুভূতিশীলতা (Hypersensitivity)

মনোব্যাধিগ্রস্তের মানসিক উত্তেজনা খুব চরম মাত্রায় থাকে বলে এই ধরনের ব্যক্তিরা প্রায়ই তাদের সব আচরণে আতিশয্য প্রকাশ করে থাকে। মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মনে সব সময়ে স্বল্পমাত্রায় বিরক্তি ভরে থাকে, সে কোনও রকম সমালোচনা সহ্য করতে পারে না, প্রশংসা বা তোষামোদে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, যে কোন রকম শারীরিক অস্বস্তিতে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে এবং সব রকম পারিবেশিক চাপে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

৬। মানসিক অপরিণতি (Immaturity)

সাধারণত মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেই প্রক্ষোভ ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে অপরিণত থেকে যায়। তাদের অপরিণত প্রক্ষোভের সাধারণ লক্ষণগুলি হল পরনির্ভরতা, সামাজিক অনুমোদন ও প্রীতিলাভের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মুখভার করা, ঠোঁট ফোলানো, বদমেজাজ দেখানো প্রভৃতি শিশুসুলভ প্রতিক্রিয়া এবং সময় সময় মিথ্যা বাহাদুরী নেবার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

৭। শারীরিক লক্ষণ (Somatic Symptoms)

মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই শারীরিক ব্যাধি বা অক্ষমতার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তার ফলে সে নিজেকে অসুস্থ বলে মনে করে। এই ধরনের শারীরিক লক্ষণ মানসিক কারণে জন্মায় বলে শরীরের যে কোনও অংশে তা প্রকাশ পেতে পারে, যে কোনও ইন্দ্রিয় অক্ষম হয়ে উঠতে পারে এবং অনেক সময়ে শরীরের কোনও কোনও মাংসপেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েও পড়ে। অনেক সময় শারীরিক লক্ষণগুলি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হতে পারে, আবার কখনও বা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতিরও হয়ে থাকে।

কিন্তু এই শারীরিক ব্যাধিগুলি প্রক্ষোভজাত হলেও এগুলি কল্পিত বা অবাস্তব নয়। এমন শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে যেগুলির রীতিমত ডাক্তারী মতে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে এসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা করলেই রোগ সারবে না, অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতিরই প্রকৃত নিরাময় প্রয়োজন। সাধারণত যে সব শারীরিক লক্ষণ মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে, সেগুলির মধ্যে থাকে ব্যক্তির জীবনে পূর্বে ঘটা কোনও আঘাত

বা অসুস্থতা, পরিবারের অন্য কোনও ব্যক্তির কোনও ব্যাধি, শরীরের দুর্বল অঙ্গের অসুস্থতা, ব্যক্তির কাছে প্রতীকমূলক মূল্য আছে এমন লক্ষণ ইত্যাদি।

৮। অসুখিতা (Unhappiness)

মনোব্যাধির আর একটি সর্বজনীন লক্ষণ হল মনে সুখের অভাব। মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সর্বদাই অসুখী। সে সব সময়েই নিজেকে একা মনে করে এবং ভাবে যে জীবনের উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে সে বঞ্চিত। অবসন্নতা, হতাশা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাহীনতা ইত্যাদি হল তার মনের সাধারণ অবস্থা। জীবনে সুখ বা আনন্দ বলে কোন বস্তুই সে উপভোগ করে না।

৯। অচেতন প্রেষণা (Unconscious Motivation)

মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণ পূর্ণভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তার অচেতন প্রেষণার দ্বারা। অবশ্য স্বাভাবিক মানুষের আচরণ-নিয়ন্ত্রণেও অচেতন প্রেষণা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে, কিন্তু মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অচেতন প্রেষণাই তার জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধানে তার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলার জন্য নানারকম অচেতন প্রতিরক্ষা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় এবং তার বাস্তব জগতের পরিকল্পনাটিও বহুপ্রকারের অচেতন ভয় এবং শত্রুতার অনুভূতির দ্বারা সর্বদা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বস্তুত মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার বাহ্যিক আচরণ ও বাস্তবজগতের অভিজ্ঞতার উপর অচেতন মনের সীমাহীন প্রভাবই তার ব্যাধিসৃষ্টির মূল কারণ।

প্রশ্ন :

1. What is neurosis? Discuss its nature and causes.
2. Enumerate the general characteristics of neurosis. Why is it caused?
3. Discuss the theories of Freud, Jung and Adler about the origin and treament of neurosis.

এগার

মনোব্যাধিমূলক আচরণের শ্রেণীবিভাগ

(Types of Neurotic Behaviours)

মনোব্যাধিকে এতদিন চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে আসা হয়েছে। যথা, ১। হিষ্টিরিয়া (Hysteria), ২। সাইকাস্থেনিয়া (Psychasthenia), ৩। নিউরাস্থেনিয়া (Neurasthenia) ও ৪। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা (Anxiety State)। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্তও এই চারশ্রেণীর বিভাগটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে নানা নতুন তথ্য হস্তগত হওয়ায় মনশ্চিকিৎসকেরা মনোব্যাধির আরও ব্যাপক শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তার ফলে অ্যামেরিকান সাইকিয়াট্রিক এ্যাসোসিয়েসন বা APA সাম্প্রতিককালে মনোব্যাধির একটি নতুন শ্রেণীবিভাগ দিয়েছেন। এই নতুন বিভাজনে মনোব্যাধিমূলক আচরণকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১। দুশ্চিন্তামূলক প্রতিক্রিয়া (Anxiety Reaction), ২। রূপান্তরমূলক প্রতিক্রিয়া (Conversion Reaction), ৩। বিচ্ছিন্নতামূলক প্রতিক্রিয়া (Dissociative Reaction), ৪। ভীতিমূলক প্রতিক্রিয়া (Phobic Reaction), ৫। বাধ্যতাধর্মী চিন্তা ও আচরণ (Obsessive-Compulsive Reaction) এবং ৬। বিষণ্ণতামূলক প্রতিক্রিয়া (Depressive Reaction)।

কিন্তু এই ব্যাপকতর বিভাগেও মনোব্যাধির সব রকম আচরণকে অঙ্গীভূত করা সম্ভব হয় নি। এই ছয় শ্রেণীর এক শ্রেণীতেও পড়ে না এমন মনোব্যাধিও দেখা যায়। সেইজন্য অনেক আধুনিক মনশ্চিকিৎসক অন্তত আর একটি শ্রেণীকে এই শ্রেণীবিভাগের অঙ্গীভূত করেন, সেটি হল ক্লান্তিমূলক আচরণ (Asthenic Reaction)। আমরা নীচে মনোব্যাধির এই বিভিন্ন শ্রেণীগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

১। দুশ্চিন্তামূলক প্রতিক্রিয়া (Anxiety Reaction)

দুশ্চিন্তামূলক অবস্থার প্রধান লক্ষণ হল এক তীব্র দুশ্চিন্তা ও অনির্দিষ্ট ভয়, যার কোনও যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব ভিত্তি বা কারণ নেই। ভয় অবশ্য সব রকম

মনোব্যাধিরই সাধারণ লক্ষণ কিন্তু মনোব্যাধিমূলক দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রে ভয় এবং দুশ্চিন্তা অত্যন্ত তীব্র হয় এবং মনকে সম্পূর্ণ ব্যাপ্ত করে থাকে। তার ফলে ব্যক্তি সর্বদাই উদ্বিগ্ন ও অসুখী হয়, সহজেই অধীর হয়ে পড়ে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা অতীতের দোষ ত্রুটি নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থার একটি লক্ষণ হল যে সাধারণ অবস্থায় দুশ্চিন্তা অল্প-মাত্রায় সর্বদা জাগ্রত থাকলেও মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন সামান্য কোন পারিবেশিক চাপে স্বল্পমাত্রার দুশ্চিন্তা অতি তীব্র ও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। এই ধরনের আক্রমণের সময় হৃদ্‌স্পন্দন, কম্পন, শ্বাসপ্রশ্বাসে ব্যাঘাত এবং প্রচুর ঘর্মক্ষরণ ইত্যাদি শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করার দরকার পড়ে। কোন কোন সময় দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর অস্পষ্ট ভয়ও প্রকাশ পেতে পারে।

মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির অচেতন অবস্থায় অনুভূত কোন ভীতির উত্তরে সম্পন্ন প্রতিক্রিয়ারূপে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। যে কোনও রকম পারিবেশিক অবস্থা থেকেই এই ধরনের ভীতি ব্যক্তির অচেতনে জাগতে পারে। যেমন, একঘেয়ে অসন্তোষজনক জীবন পরিস্থিতি, উদ্দেশ্যসিদ্ধি বা সামাজিক মর্যাদার হানিকর অবস্থা, কিংবা নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় ভয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি এই ধরনের দুশ্চিন্তা মনে জাগাতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য জীবনব্যাপী নিরাপত্তাহীনতা ও অপরিণতির বোধ থেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। শৈশবে অতিরিক্ত মনোযোগ বা পরিত্যজনের ফলে ব্যক্তির মনে যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়েছিল পরিণত জীবনে পারিবেশিক চাপে, যে সব চাপ স্বাভাবিক মানুষ অতি সহজেই সহ্য করতে পারে, —সেই সব দুশ্চিন্তা ব্যক্তির মধ্যে নতুন করে জেগে ওঠে।

মনোব্যাধিমূলক আচরণের মধ্যে দুশ্চিন্তামূলক প্রতিক্রিয়া সব চেয়ে বেশী ক্ষেত্রে দেখা গেলেও চিকিৎসার দ্বারা এর নিরাময় করাও সহজেই সম্ভব হতে দেখা গেছে। খুব জটিল ধরনের দুশ্চিন্তামূলক লক্ষণগুলি মনশ্চিকিৎসার সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রেই সারান সম্ভব হলেও এই ধরনের মনোব্যাধির কেন্দ্রে পৌছতে হলে সুদীর্ঘ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন।

২। রূপান্তরমূলক প্রতিক্রিয়া (Conversion Reaction)

বর্তমান শ্রেণীবিভাগে যে মনোব্যাধিকে রূপান্তরমূলক প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা

করা হয়েছে সেটি এতদিন হিষ্টিরিয়া বা রূপান্তরমূলক হিষ্টিরিয়া বলে বর্ণিত হয়ে এসেছে। এই মনোব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি এমন একটি অসুবিধা বা সঙ্কটের সম্মুখীন হয় যেটিকে সে গ্রহণ করতে পারে না। তখন সে তার শরীরে একটি শারীরিক ব্যাধির সৃষ্টি করে এবং তার দ্বারা সে ঐ অসুবিধা বা সংকটকে এড়িয়ে যায়। এই শারীরিক ব্যাধি থেকে যে অক্ষমতা বা দুর্বলতা দেখা দেয় তার ফলে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপনে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ শারীরিক ব্যাধি বা অক্ষমতা তার কাছে কাম্য হয়ে ওঠে, কেননা তার দ্বারাই সে বাস্তব থেকে পালাতে সমর্থ হয়।

পূর্বেই বলেছি রূপান্তরমূলক প্রতিক্রিয়ার অন্তর্গত মনোব্যাধিটির নাম হল হিষ্টিরিয়া। যেহেতু এই নামটি এখনও চিকিৎসক মহলে বিশেষভাবে প্রচলিত সে জন্য বর্তমান আলোচনায় এই নামটিই ব্যবহার করব।

হিষ্টিরিয়া (Hysteria)

নিউরসিসের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ব্যাধিটি হল হিষ্টিরিয়া। হিষ্টিরিয়াকে এক ধরনের গুরুতর মানসিক বা প্রক্ষোভমূলক অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করা যায়। ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ইচ্ছা বা আবেগ সৃষ্টি হয় যা সে তার অচেতনে অবদমিত করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে সেটিকে সে সম্পূর্ণ ভুলেও যায়। কিন্তু তা থেকে তার মধ্যে দেখা দেয় কতকগুলি জটিল ও গুরুতর লক্ষণ বা অস্বাভাবিক আচরণ। হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, একেবারে কথা না বলা, গা হাত পা কাঁপা, হাত পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া, স্মৃতিভ্রংশ হওয়া, কাঁদা, লাফালাফি করা ইত্যাদি। এই সব লক্ষণ রোগীর জানা কোন না কোন দৈহিক ব্যাধি বা আঘাত থেকেই সাধারণত জন্মে থাকে। কিন্তু হিষ্টিরিয়ার রোগী সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই সেই রোগের লক্ষণগুলি তার মধ্যে সৃষ্টি করে থাকে।

যারা কাজে ফাঁকি দিতে চায় বা দায়িত্ব এড়াতে চায় তারাও এই ধরনের রোগের লক্ষণগুলি নিজেদের মধ্যে তৈরী করে থাকে। কিন্তু হিষ্টিরিয়া রোগীর সঙ্গে তাদের তফাৎ হল এই যে হিষ্টিরিয়া রোগী এই রোগের লক্ষণগুলি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতসারে। সে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে যে এইগুলি তার কোন বিশেষ রোগ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিষ্টিরিয়া

রোগের লক্ষণগুলি কোন দৈহিক রোগ থেকে সৃষ্ট নয়। সেগুলি তার অচেতনে নিহিত কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করার প্রচেষ্টা মাত্র। এই রোগের লক্ষণগুলি রোগীর তৈরী করা হলেও এগুলি এমনই নিখুঁত প্রকৃতির হয়ে থাকে যে অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসক ছাড়া সেগুলি যে কৃত্রিম তা কেউ বুঝতে পারে না।

হিষ্টিরিয়ার শ্রেণীবিভাগ (Types of Hysteria)

হিষ্টিরিয়া প্রধানত দু শ্রেণীর হয়ে থাকে। ১। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়া (Conversion Hysteria) এবং ২। দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়া (Anxiety Hysteria)। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়াতে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব নিজের মধ্যে কোন একটি সমাধানে পৌঁছতে না পেরে একটি বিশেষ দৈহিক ব্যাধির লক্ষণে রূপান্তরিত হয়। যখন কোন অপ্রীতিকর কাজ করতে ব্যক্তির খুব অনিচ্ছা হয় তখন সেই কাজটি এড়াবার জন্য তার মধ্যে সত্যকারের দৈহিক রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তার পর যখন সেই কাজটি করার আর সময় বা প্রয়োজনীয়তা থাকে না তখন সেই লক্ষণগুলি আপনা থেকেই চলে যায়। যেমন, অফিসে কাজে যেতে যে ব্যক্তির খুব অনিচ্ছা সে ব্যক্তির ঠিক অফিসে যাবার সময়টিতে মাথা ধরল, আর যেই অফিসে যাবার সময় চলে গেল আশ্চর্যজনকভাবে তখনই মাথা ধরাও সেরে গেল। যে ছেলে স্কুলে যেতে চাইছে না তার স্কুলে যাবার সময় হঠাৎ পেটে ব্যথা দেখা দিল কিংবা জ্বর হল। কিন্তু স্কুলে যাবার সময় চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে তার সেই রোগ সেরে গেল। এখানে ব্যক্তির বা ছেলেটির ব্যাধির লক্ষণগুলি হিষ্টিরিয়াধর্মী। সময় সময় রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়া খুব জটিল ও কঠিন আকার ধারণ করতে পারে। সম্পূর্ণ বধিরতা, বাক্‌রুদ্ধতা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি গুরুতর ব্যাধির লক্ষণগুলি হিষ্টিরিয়ার লক্ষণরূপে দেখা দিতে পারে। ফ্রয়েডের উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে রোগিণী তার অসুস্থ পিতার সেবা করতে করতে এমনই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত তার হাতটি পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে পড়েছিল। অপ্রীতিকর সেবা করা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত এই শারীরিক ব্যাধির আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার প্রধান লক্ষণ হল যে রোগী সব সময় নিজের কোন ক্ষতি হবার এক অমূলক ভয়ে ভীত হয়ে থাকে। এই মনোব্যাধিমূলক ভয় নানারূপ হতে পারে, যেমন বদ্ধ জায়গার ভয়, খোলা জায়গার ভয়, উঁচু জায়গা

থেকে পড়ে যাবার ভয়, অসুস্থ হবার ভয়, অপারেশনের ভয়, দুর্ঘটনার ভয়, নির্জনতার ভয় ইত্যাদি। এগুলি প্রকৃত পক্ষে তার শৈশবের অবদমিত প্রাথমিক ভয়ের পুনঃপ্রকাশ। আধুনিক শ্রেণীবিভাগে হিষ্টিরিয়ার এই বিভাগটি দুশ্চিন্তামূলক প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হিষ্টিরিয়ার পরোক্ষ বা পূর্বগামী কারণ (Predisposing Causes)

রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়াতে রোগী যেমন অপরের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মাথা ব্যথা বা হাতে পক্ষাঘাত বা অন্য কোন শারীরিক লক্ষণের সৃষ্টি করে তেমনি দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার রোগীও অপরের মনোযোগ ও দৃষ্টি পাবার উদ্দেশ্যে মনোবিকারমূলক ভয়ের আশ্রয় নেয়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রক্রিয়াগুলি অচেতনধর্মী। দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার রোগী কোন অপ্রীতিকর কাজ বা পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে অসুস্থ হতে চায়। এই ব্যাপারে রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার রোগীর সংগে তার খুবই মিল আছে। কিন্তু রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার রোগী সত্য সত্যই অসুস্থতার সৃষ্টি করে এবং সেই অসুস্থতার সাহায্যেই সে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছয়। কিন্তু দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার রোগীর ইচ্ছা থাকলেও সে নিজের মধ্যে রোগের সৃষ্টি করতে পারে না। তার কারণ হল, যে রোগটি সে সৃষ্টি করতে চায় সেই রোগটি তার ছেলেবেলায় সত্য সত্যই হয়েছিল এবং রোগের ফলকে সে ভয় করে। ফলে তার মধ্যে দুটি বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এক হল রোগের ইচ্ছা আর এক হল রোগের ভয়। এই থেকেই তার মনে সৃষ্টি হয় নিজের ইচ্ছাকে ভয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে রোগী তার শৈশবের ভয়কে তার বর্তমান সমস্যার সমাধানের উপকরণরূপে ব্যবহার করছে। এই শৈশবের ভয়টি বহু বর্ষ ধরে অবদমিত হয়ে তার অচেতনে নির্বাসিত হয়ে বাস করছিল এবং তার মনও স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী ও ভীতিশূন্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরিবেশের চাপে সেই অচেতনের বন্ধ দ্বার ভেঙ্গে যায় এবং তার মধ্যে থেকে তার শৈশবের সেই ভয় বেরিয়ে আসে। এখানে অতি শৈশবকালীন অচেতনে অবদমিত ভয়কে আমরা পরোক্ষ কারণ বলতে পারি এবং পরিবেশের চাপ বা আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ কারণ বলতে পারি।

শারীরিক অসহায়তা বা অক্ষমতা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে নিছক জৈবিক ঘটনা মাত্র এবং সেগুলির নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু হিষ্টিরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে এই শারীরিক অসহায়তা এবং অক্ষমতাই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন প্রাণীর ক্ষেত্রে বিপদের সময় চলৎশক্তিবিহীন হয়ে যাওয়াটা একটা স্বাভাবিক রিফ্লেক্স মাত্র, কিন্তু হিষ্টিরিয়া রোগী সেই

চলৎশক্তিহীনতার দ্বারাই অপরের সহানুভূতি অর্জন করে থাকে। এক কথায় যে ব্যক্তি অসুখের ভান করে কাজে ফাঁকি দেয় সে ব্যক্তির সংগে হিষ্টিরিয়া রোগীর আচরণ এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। তবে তফাতের মধ্যে হল যে কাজের ভয়ে যে ব্যক্তি অসুখের ভান করে সে অসুখের লক্ষণগুলি সচেতন ভাবে তার মধ্যে সৃষ্টি করে থাকে কিন্তু হিষ্টিরিয়ার রোগী অচেতনভাবেই ব্যাধির লক্ষণগুলি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে থাকে। অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া হল এক ধরনের কাজ বা দায়িত্বকে ফাঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টা। তবে সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অচেতনধর্মী। সাধারণ কাজে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ বা দায়িত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধটা হয় বাহ্যিক কিন্তু হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে সেই প্রতিরোধই হয় আভ্যন্তরীণ। হিষ্টিরিয়ার রোগী বাহ্যত তার সেই কাজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুই করে না। তার কারণ হল তার সেই প্রতিরোধ আভ্যন্তরীণ হওয়ায় সে সেই প্রতিরোধ সম্বন্ধে কোন কিছুই জানে না এবং তার কোনও বাহ্যিক ভয় বা প্রচেষ্টাও থাকে না।

মনোবিকারের দিক দিয়ে রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়া হল প্রাপ্য ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার অনুভূতি থেকে সৃষ্ট হওয়া এক ধরনের মনোবিকারমূলক প্রতিক্রিয়া মাত্র। যেমন, একটি শিশু তার মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু যখন তার গলার অসুখ দেখা দিয়েছে তখনই সে সেই মায়েরই মনোযোগ ও যত্ন পেয়েছে। এই শিশু তার শৈশবের ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করতে বাধ্য হল। কিন্তু বড় হয়ে যখন তার জীবনে আবার ঐ রকম ভালবাসার ব্যর্থতা দেখা দিল তখন সে সেই ছেলেবেলার 'গলার অসুখের' আশ্রয় নিল এবং শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে বাক্‌রুদ্ধতা দেখা দিল।

অবশ্য সমস্ত ভালবাসার কামনা থেকেই যে মনোব্যাধি সৃষ্টি হয়ে থাকে তা নয়। যখন ব্যক্তি তার ভালবাসার কামনাকে অতিরঞ্জিত করে তোলে তখনই তার মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দেয়। এই অতিরঞ্জিত ভালবাসার কামনা যখন নতুন ভাই বা বোনের জন্ম বা মা-বাবার মৃত্যু প্রভৃতি কোনও বিশেষ কারণের জন্য অতৃপ্ত থেকে যায় তখন তা শিশুর মনে অবদমিত হয়ে যায়। এই অবদমিত কামনার প্রতিক্রিয়ারূপে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্ম-অনুকম্পা, রাগ এবং দুশ্চিন্তা। কিন্তু এই মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি অস্বাভাবিক হলেও এগুলির সৃষ্টি থেকেই সব সময়েই মনোব্যাধি দেখা দেয় না। মনোব্যাধি তখনই দেখা দেয় যখন এই প্রতিক্রিয়ামূলক বৈশিষ্ট্যগুলিও ঐ কামনার সঙ্গে সঙ্গে অবদমিত হয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে

কেবলমাত্র অবদমিতই হয় তাই নয় সেই সঙ্গে ব্যক্তি নিজের মধ্যে একটা অধিসত্তার (Super-Ego) গঠন করে নেয়। এই অধিসত্তাটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল তার নিজের জৈবিক চাহিদা এবং সামাজিক অনুশাসন, এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ সম্পন্ন করে যাতে সে চলতে পারে তা দেখা। এই অধিসত্তাটির কাজ দ্বিবিধ। প্রথম, তার চারপাশের যে সব ব্যক্তির উপর তার সাফল্য নির্ভর করছে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা বজায় রাখা। আর দ্বিতীয়, নিজের আত্ম-অনুকম্পা, আক্রমণধর্মিতা, যৌনকামনা প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দাবিয়ে রাখা। আর তাছাড়া যদি সম্ভব হয় তাহলে এই অবদমিত মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমাজ-অনুমোদিত পন্থায় মুক্ত হতে সাহায্য করা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে হিষ্টিরিয়া রোগীর অধিসত্তা যেমন একদিকে সামাজিক দাবীগুলি মিটিয়ে চলে তেমনই ব্যক্তির মৌলিক অবদমিত চাহিদাগুলিকেও যথা সম্ভব তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই অধিসত্তা স্বার্থহীনতা, নিষ্ঠা এবং সহযোগিতার রূপে প্রকাশ পায়। এই শ্রেণীর হিষ্টিরিয়াতে ব্যক্তির অবদমিত ভালবাসার ইচ্ছাই সব চেয়ে প্রবল থাকে এবং অধিসত্তা সেই অবদমিত ভালবাসার চাহিদাটির প্রতিক্রিয়ারূপে ঐ মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়াতে ব্যক্তির মধ্যে কোনও আদিম বা অতিশৈশবকালীন ভয়ই প্রবল থাকে এবং সেই ভয়ের প্রতিক্রিয়ারূপে অধিসত্তা সাফল্য, শক্তি, বাহাদুরি, আত্ম-নির্ভরতা ইত্যাদি মনোভাবেরই প্রকাশ করে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে হিষ্টিরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে অধিসত্তা হল আপোষমূলক। একদিকে সে যেমন সামাজিক দাবী মেটাবার চেষ্টা করে তেমনই অপর দিকে ব্যক্তির নিজের মৌলিক অবদমিত চাহিদাগুলিকেও অভিব্যক্ত করে। হিষ্টিরিয়া রোগীর অধিসত্তা এবং স্বাভাবিক ব্যক্তির অধিসত্তার মধ্যে তফাৎ এখানেই। স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে অধিসত্তা হল একটি পরিচালক শক্তি বিশেষ, আপোষধর্মী শক্তি নয়। আমাদের স্বভাবজ প্রবণতাগুলিকে দমন করা অধিসত্তার কাজ নয়। অধিসত্তার কাজ হল সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা। অধিসত্তার এই ভূমিকা যুক্তিভিত্তিক এবং আমাদের স্বাভাবিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অধিসত্তা হল অস্বাভাবিক, অতিস্ফীত এবং অসুস্থ।

হিষ্টিরিয়ার সংঘটক কারণ (Precipitating Causes)

হিষ্টিরিয়ার যে কারণগুলির আলোচনা করা হল সেগুলিকে হিষ্টিরিয়ার পরোক্ষ

বা পূর্বগামী কারণ বলা যেতে পারে। হিষ্টিরিয়া সংগঠিত হওয়ার জন্য এগুলি অপরিহার্য। কিন্তু কেবলমাত্র পরোক্ষ কারণ থাকলেই হিষ্টিরিয়া হতে পারে না। সমস্ত মনোব্যাধির ক্ষেত্রেই দুরকম কারণ থাকা দরকার। পরোক্ষ বা পূর্বগামী কারণ (Predisposing Cause) এবং প্রত্যক্ষ বা সংঘটক কারণ (Precipitating Cause)। যে বর্তমান ঘটনার জন্য স্বাভাবিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং হিষ্টিরিয়া দেখা দেয় সেগুলিকেই প্রত্যক্ষ কারণ বলা হয়। প্রত্যক্ষ কারণ নানারকমের হতে পারে। যেমন—

প্রথমত, যে সব ঘটনা ও পরিস্থিতি ব্যক্তির অহংসত্তার অবদমিত ও সুপ্ত প্রবণতাগুলিকে সক্রিয় করে তোলে সেগুলি তার মধ্যে হিষ্টিরিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই অবদমিত প্রবণতাটি হল প্রত্যাখ্যাত ভালবাসা কিংবা আত্ম-অনুকম্পা। দুশ্চিন্তামূলক হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এটি হল শৈশবকালীন ভয়।

দ্বিতীয়ত, যে সব ঘটনা বা পরিস্থিতি ব্যক্তির অধিসত্তাকে দুর্বল করে তোলে বা তার সংগঠনটিকে নষ্ট করে দেয় তাও হিষ্টিরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণরূপে কাজ করে থাকে। মনোব্যাধিগ্রস্ত রোগীর ক্ষেত্রে অধিসত্তা হল অস্বাভাবিক ও অসত্য এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে দমন করাই তার কাজ। কিন্তু যখন এই অবদমিত প্রবণতাগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে কিংবা বাইরের প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপ অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন এই অতিরঞ্জিত সংগঠনটি ভেঙ্গে পড়ে। এই জন্যই এ্যাডলার বলেছেন যে সমস্ত মনোব্যাধি ঘটার কারণই হল ব্যক্তির মিথ্যা আদর্শ। মনোব্যাধিগ্রস্তের ক্ষেত্রে তার অধিসত্তা একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অবাস্তব আদর্শের অধিকারী হয় এবং বাইরের পরিবেশের প্রতিকূল চাপের জন্যই হোক বা তার আদর্শের অতিরঞ্জিত অবাস্তব প্রকৃতির জন্যই হোক ব্যক্তি যখনই তার সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে না, তখনই তার সেই অধিসত্তা ভেঙে পড়ে এবং তার মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দেয়।

হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা (Treatment of Hysteria)

হিষ্টিরিয়া রোগীকে প্রথমেই খুব ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। তার অতীত জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করে সেগুলিকে সংগ্রথিত করে তার পূর্ণ ইতিহাসটি রচনা করতে হবে। যদি রোগ গুরুতর আকার ধারণ করে তাহলে অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। হিষ্টিরিয়া রোগীর প্রকৃত বাধা বা অসুবিধা কোথায় তা যাতে সে ঠিকমত জানতে পারে এবং ব্যাধিটির প্রকৃত স্বরূপ

যাতে সে যথাযথ নির্ধারণ করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে। যে সমস্যাটি তার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কারণের কাজ করছে সেই সমস্যাটির যাতে সে নিজে নিজে সমাধান করতে পারে তার জন্য তাকে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতে হবে। হিষ্টিরিয়া রোগীর আত্মবিশ্বাস যাতে সুদৃঢ় হয়ে ওঠে তার জন্য তার মধ্যে ভরসা, উৎসাহ ও মনোবল সৃষ্টি করতে হবে। হিষ্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসা করার পথে একটি প্রধান বিঘ্ন হল যে রোগী নিজে তার লক্ষণগুলি দূর করতে বা ব্যাধি সারাতে মোটেই উদ্‌গ্রীব হয় না। হিষ্টিরিয়া রোগ নিয়ে গবেষণায় অগ্রগামীদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক জ্যানে (Janet) 'উদাসীন মহিলা' নামক একটি বইতে হিষ্টিরিয়া রোগের এই লক্ষণটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে হিষ্টিরিয়া রোগী তার লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন নয় এবং ফলে সেগুলি সারাবার জন্য সে মোটেই ব্যস্ত নয়। যেমন, রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়াতে রোগীর একটি হাত পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেলে সে বিনা দ্বিধায় বলে যে হাতটা কেটে ফেলা হোক। এক কথায় হিষ্টিরিয়া রোগী তার রোগ সারাবার মত কোনরূপ প্রেষণাই অনুভব করে না। বরং তার রোগ যাতে বজায় থাকে সেইটাই তার চেষ্টা হয়। এর কারণ অতি স্পষ্ট। যেগুলিকে আমরা রোগের লক্ষণ বলে মনে করি প্রকৃতপক্ষে হিষ্টিরিয়া রোগী তার অন্তর্নিহিত কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানের পন্থা হিসেবে ঐ লক্ষণগুলিকে বেছে নিয়েছে। ঐ লক্ষণগুলি প্রকাশের মধ্যে দিয়েই আংশিকভাবে হলেও তার অতৃপ্ত চাহিদাটির তৃপ্তি হয় এবং তার রুদ্ধ প্রক্ষোভটি মুক্তিলাভ করে। অতএব তার কাছে ঐ লক্ষণগুলি দূর করার কোন প্রয়োজন বা মূল্য থাকে না। হিষ্টিরিয়া রোগীর এই উদাসীনতা এবং অসহযোগিতার জন্যই বহুক্ষেত্রে রোগ সারান শক্ত হয়ে পড়ে।

হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসার একটি বহু প্রচলিত পন্থা হল অনুভাবন (Suggestion)। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে মনোব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনুভাবনীয়তার মাত্রা বেশী থাকে। এই রোগীদের কাছে সামাজিক সমর্থন ও স্বীকৃতির মূল্য খুব বেশী হওয়ার জন্য যদি কর্তৃত্বের সংগে তাদের কিছু বলা হয় তা হলে তৎক্ষণাৎ তারা সেটা বিশ্বাস করে। অবশ্য অনুভাবন প্রক্রিয়াটিই মনশ্চিকিৎসকেরা নানাভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসক রোগীকে এমন সব পিল বা ট্যাবলেট খেতে দেন যেগুলির ওষুধ হিসাবে কোন মূল্য নেই। কিন্তু গম্ভীরভাবে তিনি তাঁকে আশ্বাস দেন যে সেগুলি খেলে তার অসুখ সেরে যাবে। দেখা গেছে যে এ ধরনের চিকিৎসাতেও অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া

যায়। কিন্তু অনুভাবনের মাধ্যমে কেবলমাত্র বাহ্যিক লক্ষণগুলিকেই দূর করা যায় ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনও মীমাংসাই করা যায় না।

হিষ্টিরিয়া রোগে আর একটি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেটি হল রোগীর কাছে তার রোগের লক্ষণগুলিকে অতৃপ্তিকর করে তোলা। যেমন, চিকিৎসক রোগীর খুব তিক্ত আস্বাদযুক্ত কোন ঔষধ বা বেদনাদায়ক কোন ইন্‌জেকশান দিয়ে জানালেন যে যতদিন না তার লক্ষণগুলি চলে যাচ্ছে ততদিন এই চিকিৎসা চলতে থাকবে এবং দিন দিন পদ্ধতিটি আরও কষ্টকর হয়ে উঠবে। এই ধরনের ভীতিকর বা কষ্টকর চিকিৎসা কিছুদিন চলার পর দেখা গেছে যে হিষ্টিরিয়া রোগীর লক্ষণগুলি হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করায় ফল পাওয়া গেলেও পদ্ধতিটি মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। কেননা এই পদ্ধতিতে রোগীর মনের মধ্যে একটি নতুন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হয় এবং পূর্বের অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখলেও পরে অন্তর্দ্বন্দ্বটি তার সেই স্থান অধিকার করে।

হিষ্টিরিয়ার প্রকৃষ্ট চিকিৎসা হল তার অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বটি উন্মোচন করা এবং সেটির সমাধানের ব্যবস্থা করা। কেবলমাত্র লক্ষণগুলি দূর করলেই প্রকৃতপক্ষে হিষ্টিরিয়া নিরাময় হয় না। যে সব পদ্ধতিতে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণগুলিকেই কেবলমাত্র দূর করা বা দাবিয়ে রাখা হয় সে সব পদ্ধতিগুলি কখনই হিষ্টিরিয়ার স্থায়ী নিরাময় আনতে পারে না। এই জন্য হিষ্টিরিয়ার পূর্ণ নিরাময় আনতে দীর্ঘ সময়, সতর্কতা ও যত্নের প্রয়োজন। যে অবদমিত কামনা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য ব্যক্তির মধ্যে সংগতিবিধানে অসামর্থ্য বা অসুবিধা দেখা দিয়েছে সেই মানসিক পরিস্থিতির সঙ্গে যাতে ব্যক্তি ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং পরিবেশের সংগে সুষ্ঠু সংগতিবিধানের জন্য নতুন আচরণ ও অভ্যাসের ধারা সংগঠিত করতে পারে তারই আয়োজন করা হিষ্টিরিয়া চিকিৎসার মৌলিক পদ্ধতি। এর জন্য রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে এমন একটি পারস্পরিক বিশ্বাস ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হবে যে রোগী বিনা দ্বিধা ও সঙ্কোচে তার মনের মধ্যে নিহিত তথ্যরাশি চিকিৎসকের কাছে উন্মুক্ত করে দিতে পারবে।

৩। বিচ্ছিন্নতামূলক প্রতিক্রিয়া (Dissociative Reaction)

এতদিন সেই বিচ্ছিন্নতামূলক মনোব্যাধিকে হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হত। বস্তুত হিষ্টিরিয়ার সংগে বিচ্ছিন্নতার অনেক মিল আছে। হিষ্টিরিয়াতে সংকটজনক পরিস্থিতির সংগে সংগতিবিধান করতে সমর্থ না

হওয়ার জন্য ব্যক্তি অসুস্থতার আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতামূলক মনোব্যাধিতে ব্যক্তি ঐ একই কারণে বিস্মৃতি বা অচেতনতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। সব রকম বিচ্ছিন্নতামূলক মনোব্যাধিতেই বাস্তবের সংগে সচেতন সংযোগ ব্যাহত বা নষ্ট হয়ে যায় এবং তা থেকে নানারকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে যেমন স্মৃতি-ভ্রংশতা, আত্মবিস্মৃতি, দীর্ঘস্থায়ী বিস্মৃতি এবং ব্যক্তিসত্তার বহুধাভবন, স্বপ্নচারিতা ইত্যাদি।

স্মৃতিভ্রংশতার (Amnesia) ক্ষেত্রে ব্যক্তি আত্মসচেতনতাকে অবদমিত করে এবং তার পূর্ববর্তী সত্তাসম্পর্কিত তথ্যগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভুলে যায়। সম্মোহন প্রক্রিয়া বা সম্মোহনকারী ওষুধের সাহায্যে এই ধরনের মনোব্যাধিমূলক বিস্মৃতি দূর করা যায়। দীর্ঘস্থায়ী বিস্মৃতির (Fugue) ক্ষেত্রে ব্যক্তি অনেক সময় তার পুরানো ঘর বাড়ী পরিবেশ ছেড়ে নতুন পরিবেশে নতুন ভাবে জীবন কাটায়।

বহু ব্যক্তিসত্তা (Multiple Personality) বিচ্ছিন্নতামূলক মনোব্যাধির একটি দৃষ্টান্ত। এই মনোব্যাধিতে রোগী দুই বা তার বেশী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি করে থাকে। এই ব্যক্তিসত্তাগুলির সব কটি যে সব সময় সম্পূর্ণ বা সুপরিণত হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই এবং সেগুলি সম্বন্ধে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সব সময় সচেতন নাও হতে পারে। যদিও উপন্যাস নাটকে বহু-ব্যক্তিসত্তা সম্পন্ন অনেক চরিত্রের কাহিনী পাওয়া যায়, বাস্তবে কিন্তু এ ধরনের ক্ষেত্র খুব কমই দেখা যায়। আজ পর্যন্ত যতগুলি বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তার সংখ্যা ১০০র বেশী হবে না।

স্বপ্নচারিতা (Somnambulism) আর একটি বিচ্ছিন্নতামূলক মনোব্যাধির দৃষ্টান্ত। এই ব্যাধিতে রোগী ঘুমন্ত অবস্থায় সমাজবিরোধী ও অননুমোদিত অচেতনের প্রক্ষোভবেগকে বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ করে থাকে।

সাধারণ বা স্বল্পমাত্রার বিচ্ছিন্নতামূলক মনোব্যাধির চিকিৎসায় অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই সম্মোহনের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে কোনও গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী এবং সযত্ন মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দরকার পড়ে। মুক্তঅনুষঙ্গ বা ঐ ধরনের কোনও পদ্ধতির সাহায্যে অচেতনের বিশ্লেষণ করে মূল অন্তর্দ্বন্দ্বের সন্ধান ও সমাধান করতে পারলে নিরাময় স্থায়ী হয়।

৪। ভীতিমূলক প্রতিক্রিয়া (Phobic Reaction)

কোন বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রতি যদি ব্যক্তির মনে অহেতুক ভয় দেখা দেয় তাহলে তাকে ফোবিয়া (Phobia) বলে। পরিবেশের যে কোন কল্পিত দিককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে ফোবিয়া দেখা দিতে পারে। এই জন্য বহু প্রকৃতির ফোবিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—উচ্চস্থানের ভয় (Acrophobia), খোলা জায়গার ভয় (Agoraphobia), বদ্ধ জায়গার ভয় (Claustrophobia), রক্তের ভয় (Hematophobia), নির্জনস্থানের ভয় (Monophobia), অন্ধকারের ভয় (Nictophobia), ভীড়ের ভয় (Ochlophobia), জীবন্ত কবরস্থ হবার ভয় (Taphophobia) ইত্যাদি। সাধারণভাবে এই ভয়গুলি অল্পমাত্রায় অনেক স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেই থাকে, কিন্তু যখন এই ভয়গুলি অহেতুক ও ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অদম্য হয়ে ওঠে তখনই এগুলি মনোব্যাধির পর্যায়ে ওঠে।

ফোবিয়া বা অকারণভীতির কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে যেসব মনোব্যাধির প্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তি অতিশৈশবে লাজুকতা, ভীতি এবং অক্ষমতার বোধের দ্বারা পীড়িত হয়ে এসেছে তাদেরই মধ্যে পরে ফোবিয়া দেখা দেয়। আধুনিক মনশ্চিকিৎসকদের মধ্যে ফোবিয়া সৃষ্টি হবার কারণ হল চারটি—প্রথমত কোন সাধারণ প্রকৃতির ভয় প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে যাতে ব্যক্তি ঐ প্রতীককে এড়িয়ে যাবার মধ্যে দিয়ে ভয়ের কারণটিকেও এড়িয়ে যেতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি তার নিরাপত্তাহীনতার এবং অনিশ্চয়তার অনুভূতিকে উচ্চ স্থানের ভয়ে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারে। এর ফলে সে উচ্চস্থানকে এড়িয়ে যাবার মধ্যে দিয়ে তার নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চয়তার অনুভূতিকে এড়িয়ে যেতে পারে। এই ভয় বা দুশ্চিন্তার রূপান্তর নানা ভাবে ঘটতে পারে। যে বস্তু দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে সে বস্তু থেকে দুশ্চিন্তাকে সরিয়ে নিয়ে ব্যক্তি অন্য একটি বস্তুতে সংযুক্ত করে দিতে পারে এবং তার ফলে এই দ্বিতীয় বস্তুটি ব্যক্তির মনে ফোবিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। ফোবিয়া সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াটি ফ্রয়েড তাঁর প্রসিদ্ধ হান্সের (Hans) কেস থেকেই আবিষ্কার করেন। হান্স তার মাকে মনে মনে কামনা করেছিল এবং তার ফলে সে তার বাবার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সেই থেকে বাবাকে সে ভয় করতে সুরু করল। কিন্তু কিছু দিন পরে হান্স এই বাবার প্রতি ভয়কে সঞ্চালিত করল ঘোড়াতে এবং দেখা গেল যে সে ভীষণ ভাবে ঘোড়াকে ভয় করতে সুরু করেছে এবং সর্বদাই

ঘোড়া তাকে কামড়ে দেবে এই ভয়ে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকত। এক কথায় ঘোড়াকে ঘিরে তার মধ্যে ফোবিয়া দেখা দিল। ফ্রয়েডের মতে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে অসুস্থ যৌনসম্বন্ধ থেকেই ফোবিয়া সৃষ্টি হয়। যেমন কেউ যদি তার দাম্পত্যজীবন ঘটিত সমস্যার সমাধান না ঘটাতে পেরে থাকে তবে তার মধ্যে ফোবিয়া দেখা দিতে পারে। তাছাড়া তীব্রচাপ সম্পন্ন পরিবেশ থেকেও ফোবিয়ার সৃষ্টি হয়। যেমন, অদক্ষতার জন্য যার চাকরী যাবার সম্ভাবনা হয়েছে তার মধ্যে এলিভেটার ফোবিয়া দেখা দিতে পারে, যার ফলে তার পক্ষে অফিসে গিয়ে পৌছনই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এক ভদ্রলোক একটি ছোট ঘরে একবার একটি দোকান করেছিলেন। কিন্তু ব্যবসা ভাল ভাবে না চলার জন্য তাঁর দোকানটি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। তখন থেকেই দোকানের মধ্যে বসলেই তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসত এবং ঐ ঘরে নড়তে চড়তে তাঁর ভীষণ অসুবিধা বোধ হত। এক কথায় তাঁর মধ্যে বন্ধ ঘরের ভয় (Claustrophobia) সৃষ্টি হল। কিন্তু দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলেই তাঁর ভয় চলে যেত।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় ব্যক্তির নিজস্ব অচেতনের বিপদজ্জনক বা অবাঞ্ছিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কৌশলরূপে ফোবিয়া দেখা দেয়। কোন অবদমিত আক্রমণধর্মী বা যৌনমূলক কামনা যখন উগ্র হয়ে ওঠে তখন তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যক্তি কোন বিশেষ ফোবিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি মনে মনে তার স্ত্রীকে জলে ডুবিয়ে মারবার ইচ্ছা করেছিল। তারপর থেকেই দেখা গেল যে ভদ্রলোকর মধ্যে লেক, স্নানাগার বা কোন জলাশয় দেখলেই মনে ভয় জাগতে সুরু করেছে। কোন মহিলার অচেতনে অবৈধ যৌন সম্পর্ক লাভের ইচ্ছা জাগার পর থেকে তার মধ্যে বাইরে একা বেরোনর ব্যাপারে একটা তীব্র ভয় দেখা দিল। এখানে ঐ ভয় তাকে তার অসামাজিক কামনা থেকে রক্ষা করল।

তৃতীয়ত, অতি শৈশবে কোন তীব্র অনুবর্তনমূলক (conditioning) অভিজ্ঞতা থেকে ফোবিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। কোন শিশুকে যদি ছেলেবেলায় কোন দুর্দান্ত কুকুর সাংঘাতিকভাবে কামড়ায় তাহলে পরবর্তী জীবনেও তার মনে কুকুরের প্রতি একটা গুরুতর ভয় থেকে যেতে পারে। মা যদি মাকড়সা দেখলে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে যান তাহলে তাঁর ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও তাঁর কাছ থেকে মাকড়সার প্রতি ভীতি জন্মাতে পারে।

সব শেষে অনেক সময় ব্যক্তি যে কাজ নিন্দনীয় বলে মনে করে যদি সে

গোপনে সেই কাজ করে তাহলে তা থেকে তার মনে অপরাধবোধের সৃষ্টি হতে পারে এবং কালক্রমে সেই অপরাধবোধ থেকে ফোবিয়ার জন্ম হওয়া সম্ভব। যেমন, অননুমোদিত যৌন সম্পর্ক থেকে যে অপরাধবোধ ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় তা থেকে খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তির মনে যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ভীতির সৃষ্টি হয়। অন্যান্য মনোব্যাধির মত ফোবিয়ার ক্ষেত্রেও ব্যক্তির কতকগুলি গৌণ লাভ হয়ে থাকে। যেমন, বর্ধিত মনোযোগ, সহানুভূতি, সহায়তা, অপরের উপর আংশিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইত্যাদি। অন্যান্য মনোব্যাধির মত ফোবিয়ার চিকিৎসাতেও ফোবিয়ার সৃষ্টিকারী প্রকৃত কারণটিকে খুঁজে বার করতে হয়। যদি শৈশবের কোন আঘাতমূলক অভিজ্ঞতা থেকে ফোবিয়া হয়ে থাকে তবে সেটির অবলুপ্তি ঘটানই ফোবিয়ার চিকিৎসার প্রধান উপায়। যে সব ফোবিয়া বেশী দিনের পুরানো নয় সেগুলিকে দূর করতে হলে অল্প স্বল্প মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি ফোবিয়ার কারণ খুব দীর্ঘস্থায়ী এবং গভীর অচেতনে নিহিত থাকে তাহলে তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

৫। বাধ্যতাধর্মী প্রতিক্রিয়া
(Obsessive-compulsive Reaction)

বাধ্যতামূলক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এমন কোন চিন্তা করতে বাধ্য হয় যা সে চিন্তা করতে চায় না বা এমন কোন কাজ করতে বাধ্য হয় যা সে সম্পন্ন করতে চায় না। নিজের আচরণের অযৌক্তিকতাও সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে কিন্তু তবু ঐ চিন্তা বা কাজ সে না করেও পারে না। এই ধরনের বাধ্যতাধর্মী প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে এবং মনোব্যাধিগ্রস্তদের মোট সংখ্যার শতকরা ২০ জন থেকে ৩০ জন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অবসেসান বা বাধ্যতাধর্মী চিন্তা বলতে বোঝায় এমন একটি অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক চিন্তা যা ক্রমাগত জোর করে ব্যক্তির সচেতন স্তরে প্রবেশ করে। স্বল্পমাত্রায় অস্থায়ী অবসেসান সব স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেই কোন না কোনরূপে দেখা যায়। যেমন, রাত্রিরে শোবার সময় দরজা বন্ধ করার চিন্তা, কোন গানের সুর বার বার মনে হওয়া কিংবা কুসংস্কারজাত কোন দুশ্চিন্তা মনে আসা ইত্যাদি। কিন্তু মনোব্যাধিমূলক অবসেসান অনেক গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থার চিন্তাকে সব সময় অধিকার করে থাকে। কমপালসান বা বাধ্যতাধর্মী আচরণ বলতে

স্ত্রী ঐ সন্তানের জন্মের সময় ভীষণ কষ্ট ভোগ করেছিল এবং সেই থেকে সে পুনরায় সন্তানবতী হবার ভয়ে স্বামীকে আর যৌনমিলন করতে দিত না।

চতুর্থত, কোন নীতিবিগর্হিত ইচ্ছা কিংবা কোনও নিষিদ্ধ কাজের জন্য অপরাধবোধ এবং আত্ম-ধিক্কার থেকে কখনও কখনও বাধ্যতামূলক চিন্তা ও আচরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে অমার্জনীয় চিন্তা ও আচরণের জন্য ব্যক্তির মনে সাধারণত তীব্র শাস্তির ভীতি থাকে। এ থেকে যে বাধ্যতাধর্মী চিন্তা বা আচরণের সৃষ্টি হয় তা সাধারণত আত্মগ্লানিতে পূর্ণ থাকে।

স্বামীকে অন্যায়ভাবে অবহেলা এবং তার প্রতি অবিশ্বস্ততার জন্য এক মহিলার মনে তীব্র অপরাধবোধ দেখা দেয়। তাই থেকে তার মধ্যে বাধ্যতাধর্মী চিন্তা ও আচরণের সৃষ্টি হয়। সে বারবার মনে করত যে তার হাতের রান্না খেলে লোকে মারা যাবে। বারবার সে জলে হাত ধুত, জলের কল বন্ধ করে বারবার সে ফিরে এসে দেখত যে জলের কল বন্ধ হয়েছে কিনা ইত্যাদি বাধ্যতাধর্মী সে আচরণ করত।

পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বাধ্যতাধর্মী আচরণের দ্বারা তার মনের নিষিদ্ধ কামনা বা অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত বা পরিষ্কৃত করে তোলে। একবার এক মহিলার মনে তার মেয়ের প্রতি অতি তীব্র শত্রুতামূলক মনোভাব জাগে এবং বাধ্য হয়ে তিনি তা অবদমিত করেন। এই নিষিদ্ধ কামনা থেকে নিজেকে নির্মুক্ত করার জন্য তাঁর মধ্যে একটি বাধ্যতাধর্মী আচরণ দেখা দিল। প্রায়ই তিনি ক্রুসের চিহ্ন করে বলতেন, "ঈশ্বর আমার প্রিয় ছোট মেয়েকে বাঁচান।"

যৌনঘটিত এবং অন্যান্য নীতিবিরুদ্ধ আচরণ থেকে জাত অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য বাধ্যতাধর্মী হাতধোওয়া বহুক্ষেত্রে দেখা যায়। রাজা ডানকানকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর লেডি ম্যাকবেথের বারবার হাত ধোওয়া একটি বাধ্যতাধর্মী আচরণের উদাহরণ।

সাধারণত দেখা গেছে যে বাধ্যতাধর্মী প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অচেতন আক্রমণ-ধর্মী মনোভাবের চাপই বেশী থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে অবদমিত যৌন কামনা থেকে বাধ্যতাধর্মী আচরণের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই ধরনের মনোব্যাধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের আভ্যন্তরীণ বিপজ্জনক কামনা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে কঠিন ও অনমনীয় প্রতিরক্ষণ তৈরী করে এবং পাছে কোনভাবে সে দুর্বলতার পাত্র হয়ে পড়ে সেইজন্য তার অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কামনার বিষয় বস্তু থেকে সব রকম প্রক্ষোভ বা অনুভূতিকে সে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

কোন রকম অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগও তাকে পীড়িত করে না। ফলে এই সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

যেহেতু রোগী তার অন্তর্দ্বন্দ্ব বা দুর্বলতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিরক্ষা খাড়া করতে পারে, সেইজন্য সে তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে তার সচেতনে প্রকাশ করতেও ইতস্তত করে না।

বাধ্যতাধর্মী চিন্তা বা আচরণের নিরাময়ের জন্য দীর্ঘ ও প্রলম্বিত চিকিৎসার প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ চিকিৎসার ফলেও রোগের লক্ষণ পরিবর্তিত করা বা তার তীব্রতা হ্রাস করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় না।

৬। বিষণ্ণতামূলক প্রতিক্রিয়া (Depressive Reaction)

বিষণ্ণতা মনোব্যাধি এবং মনোবিকার উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে মনোব্যাধিমূলক বিষণ্ণতা এবং মনোবিকারমূলক বিষণ্ণতা উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইনভলুসেনাল মেলানকলিয়া এবং ম্যানিক ডিপ্রেসিভ প্রভৃতি মনোবিকারের ক্ষেত্রে বিষণ্ণতা অপরিহার্য লক্ষণ। তবে মনোব্যাধিমূলক বিষণ্ণতার ক্ষেত্রে পূর্বগামী ঘটনারূপে সব সময় একটা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা বা পরিস্থিতি (যেমন, কোন প্রিয়জন বিয়োগ কিংবা অন্য কোনও মানসিক আঘাত) থাকেই এবং তার অব্যবহিত পরেই বিষণ্ণতার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু মনোবিকারে (যেমন ইনভলুসেনাল মেলানকলিয়া এবং ম্যানিক ডিপ্রেসিভের ক্ষেত্রে) এই ধরনের কোন পূর্বগামী দুঃখের ঘটনা থাকে না। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে বিষণ্ণতার সঙ্গে প্রায়ই নানা বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস যুক্ত থাকে।

মনোব্যাধিমূলক বিষণ্ণতার ক্ষেত্রে কোন বেদনাদায়ক বা কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে ব্যক্তির মধ্যে যে বিষণ্ণতার সৃষ্টি হয় তা পরিস্থিতিটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও ব্যক্তির মনে থেকে যায়। এই বিষণ্ণতা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস ধরে চললেও শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। মনোব্যাধির মোট ক্ষেত্রগুলির মধ্যে শত-করা ২০ থেকে ৩০টি ক্ষেত্রে মনোব্যাধিমূলক বিষণ্ণতা দেখা যায়।

মনোব্যাধিমূলক বিষণ্ণতার লক্ষণগুলির মধ্যে হতাশা, উৎসাহের অভাব এবং দুঃখই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে থাকে তীব্র মাত্রার দুশ্চিন্তা এবং আশঙ্কা, কাজে অনাসক্তি, আত্মবিশ্বাসের অবনতি এবং সব রকম উদ্যমের অভাব। রোগী প্রায়ই মনোযোগের অভাবের অভিযোগ করে। রাত্রে প্রায়ই সে নিদ্রাহীনতায়

ভোগে এবং মাঝে মাঝে দৈহিক অসুস্থতা, উত্তেজনাকর অনুভূতি, অস্থিরতা, অসন্তোষ, এবং শত্রুতার অনুভূতিও সে বোধ করে থাকে।

প্রিয়জনের মৃত্যু, কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয়, প্রেমে হতাশা, নীতিবিরুদ্ধ কামনা থেকে জাত অপরাধবোধ প্রভৃতি কারণ থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিষণ্ণতা খুব স্বাভাবিকভাবেই জেগে থাকে। কিন্তু মনোব্যাধিমূলক বিষণ্ণতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এই বিষণ্ণতাকেই অত্যন্ত বাড়িয়ে তোলে এবং স্বাভাবিক মানুষের মত তা থেকে সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। মনোব্যাধিমূলক বিষণ্ণতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অহংসত্তা দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং বিশেষ লক্ষণরূপে অনমনীয় বিবেক ও অপরাধবোধের প্রবণতা তার মধ্যে দেখা যায়। অন্তর্বৃত্ততা (introversion) ও অস্থিরমতিত্বও প্রায় ক্ষেত্রেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয়।

মনোব্যাধিমূলক বিষণ্ণতার রোগীর ক্ষেত্রে অনেক সময় অচেতনে অবদমিত অবস্থায় প্রিয়জনের প্রতি শত্রুতার মনোভাব দেখা যায়। এই অবদমিত শত্রুতার বোধ নানাপ্রকার শত্রুতামূলক কল্পনার রূপে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় এবং তার অপরাধবোধকে বাড়িয়ে তোলে।

বিষণ্ণতার মনোব্যাধিগ্রস্ত রোগী অনেক সময় নিজের অবস্থার জন্য অপরের সহানুভূতি এবং সমর্থন পাবার চেষ্টা করে। একবার একজন এই ধরনের রোগী ডাক্তারকে টেলিফোন করে জানায় যে সে আত্মহত্যা করতে চলেছে। পরে সে বলে যে ডাক্তার যাতে তার রোগের উপর আরও গুরুত্ব দেন সেজন্য সে ঐ কথা বলেছিল।

মনোব্যাধিমূলক বিষণ্ণতার চিকিৎসায় নানা প্রকারের মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। তার মধ্যে ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে চিকিৎসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৭। ক্লান্তিমূলক প্রতিক্রিয়া ঃ নিউরাস্থেনিয়া (Aesthenic Reaction : Neurasthenia)

এ-পি-এ র শ্রেণীবিভাগে এস্থেনিক প্রতিক্রিয়া নামে কোন মনোব্যাধির উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু গিলফোর্ড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এটি একটি স্বতন্ত্র মনোব্যাধি। পূর্বতন শ্রেণীবিভাগে এটি নিউরাস্থেনিয়া নামে পরিচিত ছিল।

নিউরাস্থেনিয়ার লক্ষণ হল দীর্ঘস্থায়ী মানসিক এবং শারীরিক ক্লান্তি, তীব্র-

মাত্রায় বিরক্তি এবং অস্পষ্ট ব্যথা। এ ছাড়া অস্থিরতা, পরিবেশের প্রতি আগ্রহহীনতা, শারীরিক অক্ষমতা প্রভৃতিও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা নানারকম চাপ অনুভব করে চলেছি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির চাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে আধুনিক মানুষকে বাঁচতে হয়। এই চাপ যারা ঠিকমত সহ্য করে পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করে চলতে পারে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু নানা কারণে অনেকেই এই বহুমুখী মানসিক চাপ সহ্য করতে পারে না এবং তার ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের তীব্র স্নায়ুমূলক দুর্বলতা দেখা দেয়। এরই নাম নিউরাসথেনিয়া। এই স্নায়ুমূলক দুর্বলতার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে থাকে তীব্র ও ছেদহীন এক ক্লান্তির অনুভূতি।

নিউরাসথেনিয়ায় ক্লান্তির অনুভূতিটি ব্যক্তির মধ্যে সব সময়েই বর্তমান থাকে। ব্যক্তি সব সময়েই নিজেকে অবসাদগ্রস্ত ও নিস্তেজ বলে মনে করে। সেই সঙ্গে হীনমন্যতার ভাব এবং ব্যর্থতার ভয়ও সর্বদাই তার মনকে পীড়াগ্রস্ত করে। তাছাড়া এ রোগেতে কতকগুলি শারীরিক লক্ষণও দেখা দেয়। যেমন, রোগী তার সমস্ত শরীরে চলমান বেদনা ও ব্যথা অনুভব করে। বিশেষ করে সে কোমরে পিঠে তীব্র ব্যথা অনুভব করে। মাথা ধরা এই রোগের একটি সাধারণ লক্ষণ। প্রক্ষোভমূলক অবসন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্তর্বৃত্ততা (introversion), মনোযোগের অভাব, মানসিক চাঞ্চল্য প্রভৃতি এ রোগের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ রোগে যাঁরা ভোগেন তাঁরা সব সময়েই নিজেদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যথা সম্বন্ধে অভিযোগ করে থাকেন। এই অসুখ-অসুখ বাতিককে হাইপোকনড্রিয়া (Hypochondria) বলা হয়।

নিউরাসথেনিয়ার কারণ হল মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। কোনও প্রক্ষোভ অবদমিত হয়ে অচেতনে অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ গ্রহণ করে এবং নানা রকমের মানসিক লক্ষণের মাধ্যমে তা আত্মপ্রকাশ করে। অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকেই যে এ রোগ জন্মায় তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম কাজ করার দুশ্চিন্তা থেকেই এই রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক দিন ধরে দুশ্চিন্তা, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ব্যর্থতার জন্য যে প্রক্ষোভমূলক চাপ ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে, নিউরাসথেনিয়া তাই থেকে জন্মায়। শারীরিক ক্লান্তি অনেক সময় প্রত্যক্ষ কারণরূপে কাজ করলেও প্রকৃতপক্ষে কোনও অপ্রীতিকর কাজ বা দায়িত্ব এড়াবার প্রচেষ্টাই এই মানসিক ক্লান্তির রূপ গ্রহণ করে থাকে।

নিউরাসথেনিয়ার চিকিৎসার পদ্ধতি হল ব্যক্তির মধ্যে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বটির স্বরূপ

খুঁজে বার করা এবং সেটির যাতে ব্যক্তি সুষ্ঠু সমাধান করে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই রোগের চিকিৎসার একটা বড় অঙ্গ হল যে রোগীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং কেন সে সঙ্গতিসাধনে অক্ষম হচ্ছে তার প্রকৃত কারণটি নির্ণয় করতে তাকে সাহায্য করা।

প্রশ্ন :

1. What is neurosis ? How many types of neurosis are there ?
2. Describe different types of neurosis, their characteristics and treatments.
3. What is hysteria ? Discuss its causes and treatment.
4. What is obsession ? Why is it caused ?
5. Describe the nature of compulsion. What are its causes of origin ?
6. What is dissociative reaction ? How is it caused ?
7. What is Neurasthenia ? Discuss its causes and treatment.
8. Discuss the different types of phobia. What are their causes ? How can they be removed ?

বার

মানব মন ও আচরণের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা

(Freudian Interpretation of Human Mind & Behaviour)

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) শাস্ত্রটির অতি ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। বস্তুত ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত মানবমনের নতুন তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করেই অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের বহু মৌলিক সূত্র ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

মনঃসমীক্ষণের জন্ম

মনঃসমীক্ষণ মূলতঃ মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হলেও পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এর বিরাট পার্থক্য। এক দিক দিয়ে এটিকে মানব আচরণের বিজ্ঞান বলা চলতে পারে, যদিও, আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীদের (Behaviourist) সঙ্গে কোন দিক দিয়েই এর কোন মিল পাওয়া যায় না। বরং আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতিবিধানের মনোবিজ্ঞান (Psychology of adjustment) নাম দেওয়া যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন পারিবেশিক পরিস্থিতিতে মানুষ কি ভাবে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে তার বৈজ্ঞানিক কারণ-নির্ণয় করা মনঃসমীক্ষণের প্রধান কাজ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল এই যে সাধারণ মনোবিজ্ঞানে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথকভাবে তাদের বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেইভাবে তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণে মানব আচরণকে তার পারিবেশিক শক্তিগুলির সমাবেশেই বিচার করা হয় এবং তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার সংব্যাখ্যান দেওয়া হয়।

ভিয়েনাবাসী মনোব্যাধির চিকিৎসক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এই আধুনিক মনোবিজ্ঞানটির জনক। বস্তুতঃ মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি থেকেই মনঃসমীক্ষণ জন্ম লাভ করেছে এবং এর পুষ্টি ও বিকাশও ঘটেছে ঐ মনোব্যাধির চিকিৎসাগারেই। হিষ্টিরিয়া ও অন্যান্য মানসিক ব্যাধিতে চিকিৎসা করতে গিয়ে

ফ্রয়েড মানব মনের গভীর অন্তঃস্থলে এমন সব অকল্পনীয় বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলেন, যার ফলে মানব আচরণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এক নতুন সংব্যাখ্যান নিয়ে তাঁর সামনে দেখা দিল। এই ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে ফ্রয়েড প্রবর্তিত করলেন এক অভিনব মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতি এবং গড়ে তুললেন তাঁর অধুনা প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণের চমকপ্রদ সৌধটি।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে ফ্রয়েড তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার সাহায্যে মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন তত্ত্বগুলির সুসংহত রূপ দিয়ে যান। তাঁর তত্ত্বগুলি প্রকৃতিতে এতই নতুন এবং প্রচলিত ধারণার এতই বিরোধী যে এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে বহু দিক থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে ফ্রয়েড যে কেবলমাত্র তাঁর এই নতুন তত্ত্বগুলিকে সপ্রমাণিত করে গেছেন তাই নয়, মানব-আচরণের সংব্যাখ্যানের সম্পূর্ণ অভিনব এক পন্থারও নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবিতদশাতেই তিনি নিজে তাঁর তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বহু অনুগামীও তাঁর তত্ত্বগুলির মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন করে নিজেদের প্রয়োজন মত স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের শাখার সৃষ্টি করেছে।

ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে মনের বিকাশ

মানব-মন সম্বন্ধে বহু প্রাচীনকাল থেকেই নানা বিচিত্র ধারণা ও মতবাদ চলে এসেছে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই ছিল নিছক জল্পনা-কল্পনা প্রসূত। পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সাম্প্রতিককালে মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত গবেষণা সুরু হয় এবং চিন্তন, শিখন, স্মরণ, বিস্মরণ প্রভৃতি মনের আচরণগুলি সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই সব গবেষণা যতই সূক্ষ্ম এবং জটিল হোক না কেন, সেগুলি কোনমতেই মানব মনের বাহিক স্তর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে নি। বস্তুত এতদিন মনোবিজ্ঞানের সমস্ত অনুসন্ধান ও তথ্য-আবিষ্কার মানব মনের উপর তলায় সীমাবদ্ধ ছিল তার গভীর অন্তঃস্থলে যে অসীম ও চমকপ্রদ রহস্য নিহিত ছিল তা মানুষের নিজের কাছেই অজ্ঞাত ও অমীমাংসিত রয়ে গেছল। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণই প্রথম মানব মনের এই অজ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয় এবং বহু অপ্রত্যাশিত ও অকল্পিত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে।

সহজাত প্রবৃত্তি ও আভ্যন্তরীণ শক্তি

ফ্রয়েডের মতে মানুষের সমস্ত আচরণের মূলে আছে তার সহজাত কতকগুলি প্রবৃত্তি বা আভ্যন্তরীণ শক্তি। এগুলি জন্ম থেকেই তার মনের মধ্যে নিহিত থাকে এবং সারাজীবন ধরে তার সমস্ত আচরণকে পরিচালিত করে। এই প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক হলেও ব্যক্তি সচেতনভাবে সেগুলির সঙ্গে পরিচিত নয়। কেননা সেগুলি সাধারণত বাস করে তার মনের অচেতন স্তরে। বিশেষ বিশেষ মানসিক পরিস্থিতিতে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং যতক্ষণ না সেগুলি তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারছে ততক্ষণ সেগুলির তৃপ্তি হয় না। অনেক সময় আবার প্রবৃত্তিগুলি প্রত্যক্ষভাবে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। সে সব ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিগুলি তাদের লক্ষ্য পরিবর্তিত করে নেয় এবং সেই নতুন বা পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌছে তাদের কাম্য তৃপ্তি পরোক্ষভাবে আদায় করে। আবার অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোন দিক দিয়েই প্রবৃত্তিগুলি তাদের কাম্য তৃপ্তি পায় না। সে ক্ষেত্রে তারা অবদমিত হয়ে মনের মধ্যে বাস করে এবং সময় ও সুযোগ বুঝে ব্যক্তির সচেতন মনে আবির্ভূত হয়ে ব্যক্তির বাহিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রবৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি নিয়ে ব্যক্তিকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার প্রধান কারণ হল যে প্রবৃত্তিগুলি সাধারণভাবে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচরণমূলক ও নৈতিক মানগুলির বিরোধী এবং প্রায়ই তাদের তৃপ্তি দিতে গেলে আমাদের প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের বিরোধিতা করতে হয়। কিন্তু আমাদের সচেতন-সত্তা এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে কোনরূপ সংঘর্ষ চায় না বলে এই অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলির কোনও তৃপ্তি সে জ্ঞাতসারে দিতে পারে না।

প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি (Eros and Thanatos)

ফ্রয়েড এই সহজাত আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। একটির তিনি নাম দিয়েছেন প্রাণশক্তি (Eros) বা জীবনপ্রবৃত্তি (Life Instinct)। এটি হল জীবন এবং ভালবাসার শক্তি। ফ্রয়েড ভালবাসা কথাটিকে ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে ভালবাসা বলতে বোঝায় নিজের এবং অপরের প্রতি ভালবাসা, আত্মসংরক্ষণ এবং জাতি সংরক্ষণের চাহিদা। এরস বা প্রাণশক্তির পাশাপাশি রয়েছে আর একটি আদিম প্রবৃত্তি। এটি প্রকৃতিতে এরসের বিপরীতধর্মী। ফ্রয়েড এটির নাম দিয়েছেন মরণশক্তি (Thanatos) বা মরণপ্রবৃত্তি (Death

Instinct)। এরস যেমন প্রাণীকে বেঁচে থাকার শক্তি জোগায় তেমনই থ্যানাটস প্রাণীকে তার অপরিহার্য গন্তব্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যেমন আছে বাঁচার ইচ্ছা, তেমনই তার পাশাপাশি আছে তার মৃত্যুর ইচ্ছা। এই দুয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। মরণশক্তি আবার দুরকম রূপ নিতে পারে, যখন এই শক্তিটি অন্তর্মুখী হয় তখন তা আত্মনির্যাতন, আত্মহত্যা ইত্যাদির রূপ নেয়, আবার যখন এটি বহির্মুখী হয়ে ওঠে তা তখন ধ্বংস বা হননের রূপে অভিব্যক্ত হয়। নিষ্ঠুরতা, আক্রমণমূলক আচরণ, বিনাশ বা ধ্বংসের প্রচেষ্টা ইত্যাদি মারণাত্মক প্রবণতাগুলি মরণশক্তিরই বহির্মুখী প্রকাশ।

ফ্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বার্গসঁ প্রভৃতির মত জীবনীশক্তিবাদী (Vitalist) এবং অন্যান্য জীবনীশক্তিবাদীর সঙ্গে তাঁর মতের মৌলিক মিলও যথেষ্টই আছে। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর জীবন প্রেষণার (Elan Vital) পরিকল্পনা বা বার্নাড শ'র জীবনশক্তির (Life Force) পরিকল্পনার সমগোত্রীয় হল ফ্রয়েডের এই প্রাণশক্তির পরিকল্পনা। কিন্তু ফ্রয়েড বার্গসঁ বা বার্নাড শ'র মত কেবলমাত্র একটি জীবনীশক্তির পরিকল্পনা করেননি। তিনি মানব-মনের অন্তরস্থ শক্তিকে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তিরূপে কল্পনা করেছেন। ফ্রয়েডের এই মানবমনের মৌলিক শক্তিকে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তিরূপে পরিকল্পনা করার মধ্যে সত্যই অভিনবত্ব আছে। এর দ্বারা মানব মনের মধ্যে যে একটা সুগভীর ও অনপনেয় অন্তর্বিরোধিতা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে তারই একটা সন্তোষজনক সংব্যাখ্যান পাওয়া যায়।

লিবিডোর প্রকৃতি (Nature of Libido)

ফ্রয়েড এই প্রাণশক্তি বা জীবন প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত মুলশক্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডো (Libido)। এই লিবিডো হল তেজ ও উদ্যমের আধার। ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় এই লিবিডোই হল ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, বৃদ্ধি এবং পরিণতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক। এটি একটি পুরোপুরি মানসিক বা অতি-দৈহিক শক্তি। দেহগত শক্তি, পুষ্টি বা অন্যান্য দৈহিক শক্তির সঙ্গে এটিকে এক বলে মনে করলে ভুল হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান পরিমাণ বা সমান প্রকৃতির লিবিডো নিয়ে জন্মায় না। কারও এই মানসিক তেজোভাণ্ডার থাকে কম, আবার কারও থাকে বেশী।

তা ছাড়া সকলের ক্ষেত্রে লিবিডোর ক্রমবিকাশ একভাবে সম্পন্ন হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে লিবিডোর বিকাশ ভিন্ন ভাবে সংঘটিত হয়। ব্যক্তিভেদে লিবিডোর বিকাশ-প্রচেষ্টা নানা বিভিন্ন পথ ধরে এগোতে পারে। লিবিডোর এই বিভিন্ন গতিপথের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা। অতএব ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর পরিমাণ, তার গতিধারা এবং সবশেষে তার উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া এই নানা বিষয়ের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক পরিণতি এবং তার ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও সংগঠন।

ফ্রয়েডের মতে লিবিডো প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ যৌনধর্মী। অর্থাৎ লিবিডোর সকল বিকাশ-প্রচেষ্টার মূলেই আছে ব্যক্তির কোন না কোন যৌনকামনা তৃপ্তির প্রয়াস। ফ্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান বহু যুগের প্রতিষ্ঠিত মানব-চিন্তার জগতে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে প্রাণীর বিকাশ বা বৃদ্ধির মূলগত যে শক্তি সেটি প্রাণীর যৌনকামনার অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। লিবিডোকে যৌনধর্মী বলার অর্থ হল মানুষের সমস্ত আচরণ, কর্মপ্রয়াস ও পরিকল্পনার মূলেই তার যৌনকামনা আছে বলে বর্ণনা করা। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশু থেকে সুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই সমস্ত আচরণই এক ধরনের যৌন-প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য যৌনতাকে ফ্রয়েড প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি যৌনতা বলতে সকল রকম আসক্তিকেই বুঝিয়েছেন। যৌনতার অন্তর্গত হল ব্যক্তির সুখ-অন্বেষণের সর্ববিধ প্রচেষ্টা। আত্মপ্রীতি, পিতামাতা-বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আকর্ষণ, মানবজাতির প্রতি প্রেম এবং ভালবাসা বলতে যত বিভিন্ন রকম আসক্তিকে বোঝায় সে সকলই ফ্রয়েডের এই যৌনতার পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তা বলে যৌনতার সঙ্কীর্ণতম অর্থটিও এখানে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। নরনারীর দৈহিক মিলন বা প্রজনন-প্রক্রিয়াটিও যে লিবিডোর অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লিবিডোর ক্রমবিকাশ (Development of Libido)

ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় লিবিডো একটি প্রবহমান তেজ বা শক্তির প্রবাহ। জন্মের মুহূর্ত থেকে এর চলা সুরু এবং নানা পথ ধরে এটি তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ বা মনের ক্রমপরিণতি দুইই এই লিবিডোর অগ্রগতির সমার্থক। ফ্রয়েডের মতে এই লিবিডোর ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর আছে। যথা—

প্রথম, শৈশব স্তর, জন্ম থেকে পাঁচ-ছ বৎসর পর্যন্ত।

দ্বিতীয়, প্রসুপ্তি কাল (latent period), পাঁচ ছয় বৎসর থেকে বার বা তের বৎসর বয়স পর্যন্ত।

তৃতীয়, যৌবনাগম, যার স্থায়িত্ব ১৮ থেকে ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

ফ্রয়েডের মতে এই স্তর তিনটির মধ্যে দিয়ে শিশুর মন ধীরে ধীরে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় এবং যৌবনাগমের শেষে তার লিবিডো পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই সময় তার মনের বিকাশও শেষ হয়। ফ্রয়েডের মতে এই তিনটি স্তরের মধ্যে শৈশবের গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। এই সময় লিবিডোর মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায় এবং লিবিডো নানা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

১। শৈশব স্তর (Infancy Stage)

ফ্রয়েডের তত্ত্বগুলির মধ্যে সব চেয়ে চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি হল তাঁর শিশু যৌনতার (Infantile Sexuality) মতবাদটি। প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বিশ্বাস ও মতবাদকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দেন যে ছোট শিশুর মধ্যেও প্রবল ও বিচিত্র যৌন অনুভূতি আছে। শৈশবকালীন যৌনতা নানা বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। সাধারণত শৈশব স্তরে যৌনতা বিকাশের তিনটি পর্যায়ের নাম করা যায়, প্রথম, মৌখিক পর্যায়, দ্বিতীয়, পায়ু পর্যায় এবং তৃতীয়, লৈঙ্গিক পর্যায়। এই তিনটি পর্যায়ে শৈশবকালীন যৌনতার বিকাশ শেষ হয়।

ক। মৌখিক পর্যায় (Oral Phase)

জন্মের সময় শিশুর লিবিডো থাকে অসংহত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। তখন লিবিডোর কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকে না। কিন্তু খুব শীঘ্রই লিবিডো তার নিজস্ব আশ্রয় বা অবস্থান খুঁজে নেয়। কিন্তু লিবিডোর এই অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে না। শিশু যত বড় হয় ততই তার লিবিডোও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলে। লিবিডোর অবস্থান সর্ব প্রথমে থাকে শিশুর মুখে। এই পর্যায়টিকেই বলে মৌখিক-রতি (Oral-erotic) পর্যায়। এই সময় শিশু তার মুখের নানা রকম ব্যবহার থেকেই অধিকাংশ আনন্দ পেয়ে থাকে। প্রথম প্রথম চোষা এবং পরে কামড়ান, চেবানো ইত্যাদি কাজ থেকে সে লিবিডোর তৃপ্তি আহরণ করে। এই মৌখিক-রতিরই শেষের দিকে আসে মৌখিক-ধর্ষণমূলক (Oral-sadistic) পর্যায়। এই পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধ্বংসমূলক মনোভাব। শিশু এই সময় ধ্বংসপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং জিনিষপত্র ভাঙা, নষ্ট করা ইত্যাদি কাজের

মধ্যে দিয়ে তার লিবিডোর তৃপ্তি খুঁজে পায়। এই সময়ে সে যা হাতের কাছে পায় তাই ভাঙা বা নষ্ট করার চেষ্টা করে।

খ। পায়ু পর্যায় (Anal Phase)

মৌখিক-রতি পর্যায়ের পরে আসে পায়ু-রতি (Anal-erotic) পর্যায়। এই পর্যায়ে লিবিডো শিশুর মুখ ত্যাগ করে তার পায়ুদেশে আশ্রয় নেয় এবং এই সময় পায়ুদেশের সঞ্চালনে শিশু বেশ তৃপ্তি লাভ করে। এই পর্যায়ে প্রথম প্রথম মল-নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় শিশু আনন্দ পায়। কিন্তু শেষের দিকে দেহের মধ্যে মল-সংরক্ষণে তার লিবিডো-তৃপ্তি ঘটতে দেখা যায়। ফ্রয়েডের মতে পরবর্তী জীবনে অনেক ব্যক্তির মধ্যে যে কৃপণতা বা অতিরিক্ত মাত্রায় সঞ্চয় প্রবণতা দেখা যায় তা এই পর্যায়ের লিবিডোর সংবন্ধন থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ। লৈঙ্গিক পর্যায় (Phallic Phase)

পায়ু-পর্যায়ের পর আসে লৈঙ্গিক (Phallic) পর্যায়। এই সময় যৌন-ইন্দ্রিয়ের সুখদানের ক্ষমতা শিশু আবিষ্কার করে। এই পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর যৌনতা অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। এই লৈঙ্গিক পর্যায় থেকে তার লিবিডো স্বাভাবিক গতিপথ অনুসরণ করে।

শৈশবকালীন যৌনতার বিকাশ এই স্তরে এসে শেষ হয়। একে যৌনপ্রবৃত্তির বিকাশের 'প্রথম তরঙ্গ' (First Wave) নাম দেওয়া যায়।

লিবিডোর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার আসক্তির বিষয় বা পাত্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথম প্রথম লিবিডোর আসক্তি থাকে বিষয়বিহীন অবস্থায় এবং কেবলমাত্র নিজের দৈহিক সুখানুভূতিতে তার তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। এখানেই লিবিডোর স্বতঃরতি (Auto-erotic) স্তরের সুরু।

এই সময় কোন বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃপ্তি সংযুক্ত থাকে না, নিছক দেহগত সুখই তখন শিশুর কাম্য। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে তার অহংসত্তার বিকাশ হতে সুরু করে তখন তার লিবিডো অহমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি হল স্বতঃরতি স্তরেরই পরিণত রূপ। একে প্রাথমিক নার্সিসাসত্ব বা আত্মরতি (Primary Narcissism) বলা হয়। নার্সিসাসত্ব কথাটা এসেছে গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র নার্সিসাসের কাহিনী থেকে। নার্সিসাস জলেতে নিজের ছায়া দেখে তাকেই ভালবেসে ফেলেছিল। অতএব নার্সিসাসত্ব মানে হল নিজের প্রতি যৌন অনুভূতি

বা আত্মরতি। এই স্তরে শিশুর আসক্তি তার নিজের সত্তায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং শিশু তখন নিজেই নিজের আসক্তির পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রাথমিক আত্মরতি অহংসত্তার বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং সারা জীবনই ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। যদিও অতিরিক্ত আত্মরতি কখনই কাম্য নয়, তবু কিছুটা আত্মরতি ব্যক্তির সুদৃঢ় ব্যক্তিসত্তাগঠনে সর্বদাই অত্যাবশ্যক। এই প্রাথমিক নার্সিসাসত্বের স্তরে যাদের লিবিডোর সংবন্ধন বা প্রত্যাবৃত্তি ঘটে তারা অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। যৌবনাগমে নার্সিসাসত্বের দ্বিতীয় স্তর দেখা দেয়। এই সময় প্রাপ্তযৌবন বালক-বালিকারা নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে শেখে।

লিবিডো-আসক্তির তৃতীয় স্তরে লিবিডো অহংকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের বিষয়ে সংযুক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বস্তু হল তার পিতামাতা। এর সুরু হয় লৈঙ্গিক পর্যায়ে। পিতামাতার প্রতি শিশুর আসক্তি থেকেই জন্মায় ঈডিপাস কমপ্লেক্স।

লৈঙ্গিক স্তরে এসে লিবিডোর লক্ষ্যহীন ইতস্ততঃ ঘোরা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে তার স্বাভাবিক অগ্রগতির পথটি খুঁজে পায়। এ সময় থেকেই সুরু হয় তার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ।

শৈশবকালীন যৌনতার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল ঈডিপাস কমপ্লেক্স। আত্মরতি স্তরের শেষে শিশুর লিবিডো নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে হয় বাবা, নয় মার প্রতি উদ্দিষ্ট হয়। ছেলে নিজেকে বাবার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে মাকে নিজের আসক্তির পাত্রী করে তোলে। আর মেয়ে নিজেকে মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে বাবাকে নিজের আসক্তির পাত্র বলে ভাবে। ফ্রয়েড শিশুর এই মনোভাবটিরই নাম দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স। প্রসুপ্তি কালের সুরুতে এই ভাবে মা-বাবাকে আসক্তির পাত্র মনে করাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এবং মা-বাবার প্রতি যৌনমূলক আসক্তি যৌনবিমুক্ত ভালবাসায় (desexualised love) ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়। এই ঈডিপাস কমপ্লেক্স থেকেই জন্ম নেয় শিশুর অধিসত্তা বা সুপার ইগো। পিতামাতার অনুশাসন ও কর্তৃত্ব শিশুর নিজের সত্তার উপর প্রতিফলিত হয়ে তার মধ্যে নীতি ও আচরণের একটা মাপকাঠির সৃষ্টি করে।

২। প্রসুপ্তি কাল (Latent Period)

শৈশবকালের পর যৌনতার প্রসুপ্তি আসে। এই কালটির স্থায়িত্ব হল যৌবনাগম পর্যন্ত। এ সময় যৌনপ্রবৃত্তিটির কোনরূপ বাহ্যিক প্রকাশ থাকে না বলে

এই কালটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রসুপ্তিকাল। বাহ্যিক অভিব্যক্তি না থাকলেও শিশুর মধ্যে যৌনতার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। শিশুর শৈশবকালীন বিভিন্ন যৌনপ্রবণতাগুলির প্রভাব তার আচরণকে এই সময় তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত করে এবং তার মধ্যে বহু অচেতন আচরণধারার জন্ম দেয়।

৩। যৌবনাগম (Adolescence)

প্রসুপ্তিকালের পর আসে যৌবনাগম। এই সময় যৌনপ্রকৃতির বিকাশের 'দ্বিতীয় তরঙ্গে'র (Second Wave) সুরু হল বলা যেতে পারে। আর এইটিই হল যৌনপ্রবৃত্তির বিকাশের শেষ স্তর।

শৈশবকালের শেষে লিবিডো লৈঙ্গিক স্তরে এসে পৌছয়। কিন্তু লৈঙ্গিক স্তরেই লিবিডোর সংগঠন সম্পূর্ণ হয় না। লিবিডোর পরিণতি ও সংগঠন পূর্ণতা লাভ করে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে। এই সময় লিবিডো তার বিভিন্ন ও অস্বাভাবিক অবস্থানগুলি ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে জননেন্দ্রিয়ে এসে আশ্রয় নেয়। এই স্তরকে উপস্থ (Genital) স্তর বলা হয়। এখানেই লিবিডোর বৈচিত্র্যময় যাত্রার শেষ হয় এবং তার চরম ও স্বাভাবিক লক্ষ্য প্রজননক্রিয়ার প্রচেষ্টায় এসে তার সংগঠন সুসংহত হয়।

ফ্রয়েড পুনরাবৃত্তির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যৌবনাগম শৈশবকালেরই পুনরাবৃত্তি। শৈশবকালে শিশু যে সব বৈচিত্র্যময় যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল সে সবগুলিই আবার ঘুরে ফিরে তার যৌবনাগমে দেখা দেয় এবং তার পরিণত বয়সের যৌনজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শৈশব-কালীন ভালবাসার সম্পর্কগুলি এবং বহু বিভিন্নমুখী আবেগ আবার তার মধ্যে জেগে ওঠে এবং তার ফলে অধিসত্তার সঙ্গে তার সত্তার নতুন করে আবার সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation of Libido)

লিবিডোর অগ্রগতির যে বিবরণ দেওয়া হল সেটি হল লিবিডোর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের বিবরণ। স্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে উপরের বর্ণিত প্রত্যেকটি স্তর বা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে লিবিডো প্রবাহিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা স্বাভাবিক যৌন আসক্তি ও প্রচেষ্টায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। কিন্তু নানারকম বৈষম্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে লিবিডো এই প্রত্যেকটি স্তর বা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সমানভাবে অগ্রসর হয় না। অনেক ক্ষেত্রে লিবিডো তার চলার পথে কোন একটি বিশেষ স্তর বা পর্যায়ে

আটকা পড়ে যায় এবং তার ফলে লিবিডোর সাধারণ অগ্রগতি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়ে ওঠে। এই ধরনের শৈশবকালীন কোন যৌনমূলক আবেগ-কেন্দ্রে লিবিডোর আটকা পড়ে যাওয়ার নামকে সংবন্ধন (Fixation) বলা হয়।

কোন বিশেষ একটি আবেগ-কেন্দ্রে যদি লিবিডো সংবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটিই তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। অবশ্য ব্যক্তির সম্পূর্ণ লিবিডোটি কখনও কোন একটি স্থানে সংবদ্ধ হয় না। মোট লিবিডোর কিছুটা অংশ ঐ সংবন্ধন ক্ষেত্রে বন্দী হয়ে থাকে এবং বাকীটুকু তার স্বাভাবিক পরিণতির পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু এই সংবন্ধনের ফলে লিবিডো বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যে অংশটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে তার গতিধারা দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে ওঠে। এই লিবিডো বিভাগের ফলে তার ব্যক্তিসত্তার পরিণতি এবং মানসিক সংগঠন সবই ভবিষ্যতে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

লিবিডোর সংবন্ধনের উপর ব্যক্তির ভবিষ্যৎ মানসিক স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে। যে সব ব্যক্তি পরে কোন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে এই লিবিডোর সংবন্ধন অনেকখানি দায়ী হয়। কেননা মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে লিবিডো তার অগ্রগতির পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই ধরনের শৈশবকালীন সংবন্ধনের কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মানসিক ব্যাধির কারণ সম্পর্কে ফ্রয়েডের মত হল যে লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি এবং লিবিডোর সংবন্ধন এই দু'টি ঘটনাই প্রধানত দায়ী। লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি বলতে কোন বিশেষ যৌন কামনার ব্যর্থতাকেই বোঝান হয়ে থাকে। পারিবেশিক কারণের প্রতিকূলতার জন্য ব্যক্তির কোন প্রবল কামনা যখন বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন লিবিডোর সম্মুখগতি বন্ধ হয়ে যায় এবং জীবনের প্রারম্ভে যে সব আবেগমূলক কেন্দ্রে লিবিডো সংবদ্ধ হয়ে আছে সেই সব কেন্দ্রগুলিতে লিবিডো প্রত্যাবৃত্ত করে। এই থেকেই ব্যক্তির মনোব্যাধি সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর সংবন্ধন ব্যক্তির মানসিক ও আচরণমূলক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং মানসিক অসুস্থতা বা মনোব্যাধির একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি (Regression of Libido)

লিবিডোর সংবন্ধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হল আর একটি ঘটনা। সেটির নাম লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি (Regression)। সহজ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে লিবিডো বিনা বাধায় সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং তার ব্যক্তিসত্তা ও মনের

সংগঠনও সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যখন লিবিডো তার চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে লিবিডো তার সামনের দিকে চলা বন্ধ করে গতিপথ বদলে পেছন দিকে চলতে সুরু করে। একেই লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি বলে। পরিণত বয়সে কোন গুরুতর মানসিক আঘাত বা দুঃসহ ব্যর্থতার ফলে সম্মুখে প্রবাহমান লিবিডো পশ্চাৎমুখী হয়ে তার পুরানো শৈশবের অবস্থানগুলিতে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়। মনোব্যাধির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে লিবিডো যখন কোন পারিবেশিক কারণের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শৈশবকালীন সংবন্ধনের স্থলগুলিতে আশ্রয় নেয় তখনই মনোব্যাধি দেখা দেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোব্যাধির সৃষ্টিতে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তিও **একটি** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সংবন্ধনের সঙ্গে প্রত্যাবৃত্তির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কেবল তাই নয় বহুদিক দিয়ে এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। লিবিডোর সংবন্ধন যত দৃঢ় হবে প্রত্যাবৃত্তিও তত সহজে ঘটবে। লিবিডোর ক্রমবিকাশের সময় সংবন্ধনের কেন্দ্রগুলি যদি শক্তিশালী হয় তাহলে বাইরের প্রতিবন্ধকে যখনই লিবিডো বাধাপ্রাপ্ত হবে তখনই এই শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্রগুলিতে লিবিডো প্রত্যাবৃত্ত করবে। যে সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে শৈশবকালীন সংবন্ধন কম তাদের লিবিডো সহজে প্রত্যাবৃত্ত হয় না এবং তারা সেই কারণে মনোব্যাধিতে কম আক্রান্ত হয়।

লিবিডোর বিকাশের দিক দিয়ে প্রত্যাবৃত্তি দু'রকমের হতে পারে। প্রথম, লিবিডোর প্রাথমিক আসক্তির বস্তুগুলিতে প্রত্যাবৃত্তি। দ্বিতীয়, সমগ্র যৌন সংগঠনটির শৈশবকালীন স্তরে প্রত্যাবৃত্তি।

লিবিডোর প্রাথমিক আসক্তির বস্তু বলতে শিশুর নিজের মা-বাবাকেই বুঝিয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রত্যাবৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি শৈশবকালীন যৌন আসক্তি আবার ফিরে আসে। হিষ্টিরিয়া রোগে এই ধরনের প্রাথমিক আসক্তির বস্তুতেই রোগীর লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি ঘটে। সেখানে শৈশবকালীন যৌন সংগঠনে লিবিডোর কোনরূপ প্রত্যাবর্তন ঘটে না। হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনের কোন দুরূহ পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিবিধান করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে, এমন কি শিশু-সুলভ আচরণও করতে সুরু করেছে। তার লিবিডো বর্তমান বাস্তবের কাছে হার মেনে শৈশবের কল্পনাময় ও অবাস্তব সুখের দিনগুলিতে ফিরে গেছে। হিষ্টিরিয়াতে শৈশবকালীন আসক্তির পাত্র-পাত্রীতে ব্যক্তির লিবিডো প্রত্যাবৃত্ত হয়

এবং রোগীর জল্পনা-কল্পনা আকাঙ্ক্ষা-বাসনা সমস্তই তার মা বা বাবাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হয়। কিন্তু যৌন সংগঠনের দিক দিয়ে তার কোন প্রত্যাবৃত্তি ঘটে না। অর্থাৎ এদিক দিয়ে সে পরিণত স্তরেই অবস্থান করে।

কিন্তু কোনও কোনও মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সমগ্র যৌনসংগঠনটিই শৈশবকালীন স্তরেতে প্রত্যাবৃত্ত করে থাকে। যেমন, অবসেসন (Obsession) বা বাধ্যতাধর্মী চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তির লিবিডো শৈশবের ধর্ষণমূলক পায়ুরতির স্তরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তখন তার ভালবাসার অভিব্যক্তি ধর্ষণমূলক বা নিপীড়নমূলক আবেগের রূপ গ্রহণ করে। অবসেসনের রোগী যখন ভাবে 'আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই' তখন সে প্রকৃতপক্ষে বলতে চায় যে 'আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই'।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোব্যাধির সৃষ্টির ক্ষেত্রে লিবিডোর সংবন্ধন এবং প্রত্যাবৃত্তি দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। মনোব্যাধির প্রত্যক্ষ কারণটি যদিও লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি, তবু সংবন্ধন এবং প্রত্যাবৃত্তি ছাড়া মনোব্যাধি সত্যকারের ঘটে উঠতে পারে না। বস্তুত প্রতিনিয়তই আমাদের জীবনে নানাভাবে লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি ঘটছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলের ক্ষেত্রে মনোব্যাধি দেখা দেয় না এবং বাস্তব জীবনে অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্যকারের মনোব্যাধি ঘটে থাকে। তার কারণ হল, যে সব ব্যক্তির শৈশবে লিবিডোর বিকাশের সময় কোন আবেগকেন্দ্রে লিবিডোর সংবন্ধন ঘটে থাকে তাদেরই পরিণত বয়সে যদি কোন কারণে লিবিডো বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলেই লিবিডোর ঐ আবেগকেন্দ্রে প্রত্যাবৃত্তি ঘটে এবং তখনই মনোব্যাধি দেখা দেয়।

ফ্রয়েডীয় মানসিক সংগঠন
(Freudian Structure of Mind)

বহু বর্ষের গবেষণার ফলে ফ্রয়েড মানব মনের পূর্ণ সংগঠনটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আমাদের এত কাছে অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এত বড় একটি রাজ্য যে ছিল তা সহজে বিশ্বাস করা শক্ত।

চেতন, প্রাক্‌চেতন ও অচেতন
(Conscious, Preconscious and Unconscious)

ফ্রয়েডের পূর্বে চেতন মন ছাড়া অন্য কোন মনের কথা মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা বা আলোচনায় স্থান পায় নি। ফ্রয়েডই প্রথম দেখালেন যে মনের অজ্ঞাত অংশটি জ্ঞাত অংশের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ত নয়ই বরং মানব-আচরণের প্রকৃতি

ও গতি নির্ধারণে অচেতন মনই চেতন মনের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী। তাঁর পরিকল্পনায় মনের তিনটি স্তর আছে; যথা—চেতন, প্রাক্‌চেতন ও অচেতন।

১। চেতন (Conscious)

আমাদের যে মনটি বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখে এবং যে মনটির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সচেতন, মনের সেই অংশটিকে চেতন (Conscious) বলা হয়। এই চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র এবং প্রায় অচেতনের সাত ভাগের একভাগের মত। তাছাড়া চেতন প্রক্রিয়ার একটা বড় অংশ অচেতন প্রক্রিয়ারই প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে থাকে।

২। প্রাক্‌চেতন (Preconscious)

চেতনের ঠিক নিচেই হল প্রাক্‌চেতন। এটি যদিও সাধারণ অবস্থায় আমাদের সচেতনতার বাইরে কিন্তু চেষ্টা করলে এই স্তরের বিষয়বস্তুগুলি চেতন মনে আনা যায়। যে সকল ঘটনা আমাদের মনে নেই অথচ চেষ্টা করলে আমরা মনে করতে পারি সেই ঘটনাগুলির অবস্থান হল প্রাক্‌চেতন। অবশ্য প্রাক্‌চেতনের সমস্ত ঘটনাই যে সহজে মনে করা যায় তা নয়, প্রাক্‌চেতনের এমন অনেক ঘটনা আছে যা মনে করতে আমাদের যথেষ্ট কষ্ট বা অসুবিধা হতে পারে।

৩। অচেতন (Unconscious)

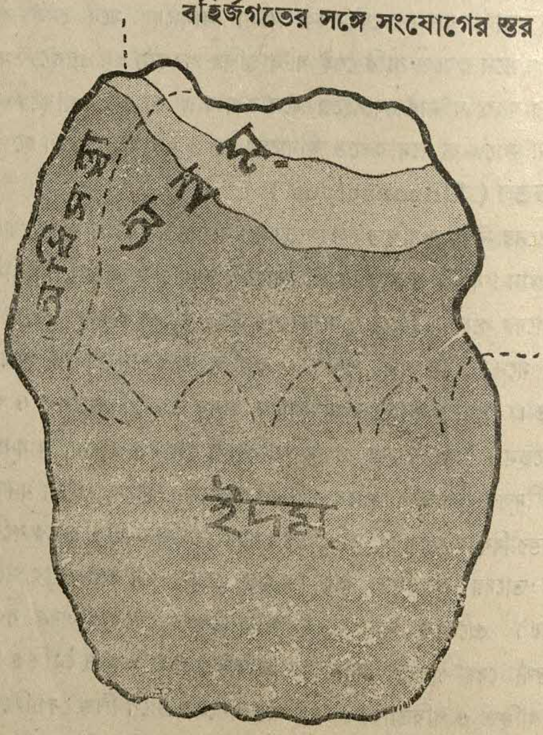
প্রাক্‌চেতনের নীচে অবস্থিত হল অচেতন। মনের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই অচেতনের অবস্থান। যদিও অচেতনের প্রক্রিয়াগুলি আমাদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে তবুও আমাদের সচেতন চিন্তা ও আচরণের উপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

চেতন মনে যেমন আছে শৃঙ্খলা ও সংহতি, অচেতনে তেমনই আছে বিশৃঙ্খলা ও অসংহতি। ফ্রয়েড অচেতন প্রক্রিয়াকে অসঙ্গতিপূর্ণ, শিশুসুলভ ও আদিম বলে বর্ণনা করেছেন। অচেতনের প্রধান আদিবাসী হল নগ্ন কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দল। এগুলি আসে দুটি উৎস থেকে—প্রথম, চেতন মন থেকে এবং দ্বিতীয়, উত্তরাধিকার সূত্রে। পরিবেশের সঙ্গে দৈনন্দিন প্রতিক্রিয়ার ফলে বহু চিন্তা বা কামনা তাদের অবাঞ্ছিত প্রকৃতির জন্য চেতন মন ত্যাগ করে অচেতনে এসে আশ্রয় নেয়। প্রত্যেক মানবমনেই অতি শৈশব থেকেই এমন সব চিন্তা ও কামনা দেখা দেয় যেগুলি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের বিচারে অবাঞ্ছিত ও পরিত্যাজ্য। এই অনুশাসনের চাপে শিশু সেগুলিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। ফলে এই অবদমিত চিন্তা ও বাসনাগুলি তার সচেতন মন থেকে নির্বাসিত হয়ে অচেতন বাসা বাঁধে। এগুলি অচেতনে অতৃপ্ত কামনা বাসনার

রূপে বাস করে এবং ব্যক্তির আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তৃপ্তি খোঁজে। আর দ্বিতীয় স্তরের চিন্তা ও কামনাগুলি হল সহজাত, জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী, কখনও তারা চেতনের স্তরে ওঠে না। তারা চিরকালই অচেতনে নিহিত থাকে এবং নানাভাবে ব্যক্তির সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে। এই শ্রেণীর অচেতন সত্তাগুলির ইউঙ (Jung) নাম দিয়েছেন জাতিগত অচেতন (Racial Unconscious or Archetype)। এগুলি মানুষের আদিম পূর্বপুরুষদের মন থেকে বংশধারার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

ইদম্, অহম্ ও অধিসত্তা (Id, Ego and Super-Ego)

মনের এই তিনটি বিভিন্ন স্তর ছাড়া ফ্রয়েড মনের আরও তিনটি বিশেষ অধিবাসীর পরিকল্পনা করেছেন। সে তিনটি হল ইদম্, অহম্ এবং অধিসত্তা।



[মানসিক সংগঠনের ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনা]

ইদম্ হল পূর্ণমাত্রায় অচেতন। এটি লিবিডোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং ব্যক্তির

সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কামনার পেছনে শক্তি জুগিয়ে থাকে। এ ছাড়া চেতন মনে যত অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক ইচ্ছা জেগে থাকে সেগুলিও অবদমিত হয়ে ইদমে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ইদম্‌ প্রকৃতিতে অতি আদিম, বন্য। সে পুরোপুরি অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি (Pleasure Principle)। অর্থাৎ সে চায় দুঃখকে এড়িয়ে যেতে এবং কেবলমাত্র সুখকে পেতে। সে সমাজ, শিক্ষা, নীতি কোন কিছুরই ধার ধারে না। ইদম্‌ মূর্তিমতী কামনা, মানুষের নগ্ন বাসনার প্রতিচ্ছবি। তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, বিচারবুদ্ধি নেই, নৈতিক ভালমন্দের জ্ঞান নেই। আদিম মানব মনের সে প্রতীক। সে চায় নিছক আনন্দ, তার কামনা-বাসনার নির্বাধ পরিতৃপ্তি—তা সে ভালই হোক, মন্দই হোক, সমাজ অনুমোদিতই হোক, আর সমাজবিরোধীই হোক, সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই।

ইদম্‌ ব্যক্তির কামনা বাসনার আধার হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। ফলে সে সরাসরি নিজের কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে একমাত্র পারে ইগো বা অহম্‌। অতএব ইদম্‌ আমাদের সমস্ত কামনার উৎস হলেও তার সেই কামনার তৃপ্তির জন্য তাকে পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় ইগো বা অহমের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার উপর।

অহম্‌ (Ego)

অহমের কিছুটা চেতন, আবার কিছুটা অচেতন। জন্মের সময় অহম্‌ থাকে অতি দুর্বল। কিন্তু শিশু যত বড় হয় ততই বাস্তবের সংস্পর্শে এসে অহম্‌ পুষ্ট হতে থাকে। অহমের চেতন অংশটা বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে, আর তার অচেতন অংশটি ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। ইদম্‌ অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি কিন্তু অহম্‌ পরিচালিত হয় বাস্তব নীতির (Reality Principle) দ্বারা। অহম্‌ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যুক্তিধর্মী। সে ভালভাবেই বোঝে যে তাকে সমাজে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে। সেজন্য বাস্তবের অনুশাসন মেনে চলাই তার নীতি এবং এই নীতির জন্যই সে ইদমের সমস্ত দাবী পূর্ণ করতে পারে না। বস্তুতঃ ইদমের তৃপ্তি মানে অহমের নিজেরই তৃপ্তি, কিন্তু বাস্তবের চাপে অহম্‌ বাধ্য হয় ইদমকে দাবিয়ে রাখতে এবং তার কামনাকে অতৃপ্ত রাখতে। তবে যদি অহম্‌ বোঝে যে ইদমের কোন বিশেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলে তাকে সমাজের কাছে সমালোচনা বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না তখন সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে সে দ্বিধা করে না। কিন্তু ইদমের অধিকাংশ কামনাই এত

তের

কমপ্লেক্স (Complex)

কমপ্লেক্স কথাটির সাধারণ অর্থ হল মানসিক জটিলতা। মনোবিজ্ঞানে কমপ্লেক্স কথাটি ব্যবহার করা হয় বিশেষ এক ধরনের মানসিক সংগঠনকে বোঝাতে। যখন কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনের মধ্যে একটা স্থায়ী জটিল সংগঠনের সৃষ্টি হয় তখন তাকে কমপ্লেক্স বলা হয়। এই বিশেষ মানসিক সংগঠনটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যথা—

প্রথম, এটি প্রক্ষোভাত্মক, অর্থাৎ কোন কমপ্লেক্স সক্রিয় হয়ে উঠলে ব্যক্তি বিশেষ একটি প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে। কমপ্লেক্স মাত্রের সঙ্গেই কোনও না কোন প্রক্ষোভ জড়িত থাকে এবং কোনও কারণে কমপ্লেক্সটিতে বিন্দুমাত্র আঘাত পড়লেই ব্যক্তির মধ্যে সেই প্রক্ষোভটি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়, কমপ্লেক্স মাত্রেই ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক। ব্যক্তির বহু আচরণ কমপ্লেক্সের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন কমপ্লেক্স জাগে তখন ব্যক্তির আচরণ বিশেষ একটি গতিপথ অনুসরণ করে।

তৃতীয়, ফ্রয়েডের মতে কমপ্লেক্সের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হল এর অচেতনধর্মিতা। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের কমপ্লেক্স সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতন থাকে না এবং কমপ্লেক্সের প্রভাবে সে যে আচরণ করে তার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধেও তার কোন সচেতনতা থাকে না। অনেক মনোবিজ্ঞানী অবশ্য সচেতন মনের প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকেও কমপ্লেক্স নাম দিয়ে থাকেন। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে অচেতনধর্মিতা কমপ্লেক্স মাত্রেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

কমপ্লেক্সের সৃষ্টি (Origin of Complex)

চতুর্থ, কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয় অবদমন থেকে। যখন ব্যক্তির মনে এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছা দেখা দেয় যেটা তার অর্জিত শিক্ষা বা সামাজিক মান বা ধর্মবোধের বিচারে অবাঞ্ছনীয় বলে প্রমাণিত হয় তখন সে সেটিকে তার অচেতন মনে অবদমিত করে এবং তার ফলে সেটি সে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কিন্তু এই চিন্তা বা ইচ্ছা ব্যক্তির অচেতনের গভীর তলদেশে কমপ্লেক্স বা একটি আবেগধর্মী জটিল

সংগঠনের রূপ নিয়ে বাস করে এবং যখনই সুযোগ পায় তখনই সেটি তার সচেতন স্তরে উঠে এসে তার আচরণকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

যে কোন বিষয় বা ঘটনাকে ঘিরেই কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন একটি শিশু বার কয়েক অঙ্কে ফেল করায় অঙ্ককে ঘিরে তার মধ্যে একটা কমপ্লেক্স তৈরী হল। ফলে যখনই অঙ্কের প্রসঙ্গ ওঠে বা সে নিজে অঙ্ক করার চেষ্টা করে তখনই তার মধ্যে ভীতিকর একটা অনুভূতি দেখা দেয় এবং তাই থেকে অঙ্ক সংশ্লিষ্ট তার সমস্ত আচরণই উল্লেখযোগ্যরূপে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

পঞ্চম, ব্যক্তির অচেতনে নির্বাসিত অবস্থায় থাকলেও কমপ্লেক্স তার কর্মক্ষমতা বিন্দুমাত্র হারায় না এবং প্রক্ষোভ-নিষিক্ত অবস্থায় প্রবল এক শক্তির আধাররূপে তার অচেতনের অন্তঃস্থলে অভিব্যক্ত হবার সুযোগের প্রতীক্ষা করে। কমপ্লেক্স মাত্রেরই পশ্চাতে কোন না কোন মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকেই। সেইজন্য যখনই কমপ্লেক্সের প্রভাবে কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ আচরণ করে তখনই তার সেই আচরণে তার মনের সেই গুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্বটি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এইজন্য কমপ্লেক্স থেকে জাত আচরণ কখনও স্বাভাবিক প্রকৃতির হয় না।

ষষ্ঠ, এ থেকে আমরা কমপ্লেক্সের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। কমপ্লেক্সের মধ্যে সব সময়েই একটা অবাঞ্ছনীয়তা থাকবেই। কেননা সচেতন সত্তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছা বা চিন্তা থেকেই কমপ্লেক্স জন্মে থাকে। এই কারণেই কমপ্লেক্সের সচেতন মনে প্রবেশাধিকার নেই, তাকে চিরকালই অচেতনে বাস করতে হয়। বস্তুত ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে কমপ্লেক্সকে তার অচেতন অবস্থান থেকে সচেতন মনে টেনে আনতে পারলে কমপ্লেক্সের মৃত্যু হয়।

কমপ্লেক্স ব্যক্তিগত হতে পারে, আবার সর্বজনীনও হতে পারে। উপরে বর্ণিত ব্যক্তিগত কমপ্লেক্স ছাড়াও সকলের মধ্যে সমানভাবে দেখা যায় এমন কতকগুলি সর্বজনীন কমপ্লেক্সেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে হীনমন্যতার কমপ্লেক্সটি (Inferiority Complex) উল্লেখযোগ্য। যখন কোন ত্রুটি বা অক্ষমতা বা অসাফল্যের জন্য ব্যক্তি নিজেকে ছোট বা হেয় বলে মনে করে তখন তাকে হীনমন্যতার কমপ্লেক্স বলা হয়। তেমনই অপর পক্ষে এর বিপরীত মনোভাব থেকে জাত কমপ্লেক্সটিকে আত্মশ্লাঘার কমপ্লেক্স (Superiority Complex) নাম দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ফ্রয়েড আরও কয়েকটি সর্বজনীন কমপ্লেক্সের নাম করেছেন। সেগুলির মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্স, কাষ্ট্রেসন কমপ্লেক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

ঈডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex)

শিশুর লিবিডো যখন প্রথম নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে বাইরের বিষয় বা পাত্রের দিকে পরিচালিত হয়, তখন তার প্রথম আসক্তির বস্তু হন তার মা কিংবা বাবা। লিবিডোর পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তি ক্রমশ যৌনমূলক হয়ে ওঠে। ছেলে তখন নিজেকে তার বাবার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে এবং মাকে তার যৌন আবেগ পরিতৃপ্তির বিষয়বস্তু করে তোলে। তেমনই মেয়ে নিজেকে তার মার সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরে নেয় এবং বাবাকে তার যৌন আবেগ পরিতৃপ্তির বিষয়বস্তু করে তোলে। কিন্তু খুব শীঘ্রই শিশু বুঝতে পারে যে তার এই যৌন আসক্তি অনুচিত ও অননুমোদিত এবং বিশেষ করে তার এই আসক্তির ব্যাপারে তার মা বা বাবাই হলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে সে তখন সেটিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। নানা ঘটনা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে ছেলে বুঝে নেয় যে মার প্রতি যৌন আসক্তি প্রকাশের অধিকারটা আছে সম্পূর্ণ তার পিতারই এবং সেইজন্য মার প্রতি তার নিজের যৌন কামনাটি একান্ত অসঙ্গত। তেমনই অপরপক্ষে মেয়েও বোঝে যে বাবার প্রতি যৌনমূলক অধিকার আছে একমাত্র মায়েরই এবং তাঁর প্রতি তার আসক্তি অন্যায় ও নিন্দনীয়।

ফলে শিশু তার কামনাকে অচেতনে অবদমিত করে এবং এই অবদমিত কামনাটি কমপ্লেক্সের রূপে সেখানে বাসা বাঁধে। ফ্রয়েড এই বিশেষ কমপ্লেক্সটির নাম দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সটির নামকরণ হয়েছে গ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে। ঈডিপাস ছিল থিব্‌সের রাজার ছেলে। ছেলের হাতে নিজের মৃত্যু হবে এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে রাজা জন্মের সময় ছেলেকে হত্যা করার আদেশ দেন। ঘাতক ছেলেটিকে একটি পাহাড়ে ফেলে আসে এবং একজন রাখাল তাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে। বড় হয়ে ঈডিপাস বিরাট একজন যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত একদিন তার নিজের বাবার রাজ্যই আক্রমণ করে। যুদ্ধে ঈডিপাস নিজের বাবাকে হত্যা করে ও সে দেশের প্রথামত নিজের মাকে বিবাহ করে, অবশ্য এ সবই সে করে তার মা বাবার আসল পরিচয় না জেনে।

অতএব ঈডিপাস কমপ্লেক্স বলতে বোঝায় মার প্রতি ছেলের যৌনমূলক আসক্তিকে। মনে রাখতে হবে যে শিশুর এই যৌনমূলক ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ তার অচেতনে নিহিত থাকে। শৈশবে যখন এই বাসনাটি তার মধ্যে জাগে তখন সে পরিবেশের চাপে সেটিকে অচেতনে দমিত করে। ফলে তার চেতন মনে তার

মার প্রতি কোনরূপ যৌনমূলক আসক্তির কথা সে জ্ঞাত নয়। মার প্রতি তার এই আসক্তি বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ পায় মার আদর ও মনোযোগ চাওয়া কিংবা মার কাছে শোওয়া প্রভৃতি ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে। প্রথম প্রথম মনে করা হত যে শিশুর এই আসক্তি বোধ করি তার মায়ের দৈহিক সত্তার প্রতি উদ্দিষ্ট, কিন্তু পরে দেখা গেছে যে শিশু তার অচেতন মনের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে তার মার একটি প্রতিরূপ তৈরী করে নেয় এবং তার সমস্ত আসক্তি গড়ে ওঠে তার অচেতনের সেই মাতৃমূর্তিকে (Imago) ঘিরেই। মায়ের প্রতি তার এই যৌন আসক্তি যত বেড়ে চলে ততই পিতাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয় এবং শেষ পর্যন্ত পিতার প্রতি বিদ্বেষ, তার দৈহিক ক্ষতি এমন কি তাঁর মৃত্যুকামনাও শিশুর চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি ঠিক সেই রকম আসক্তি দেখা দেয় মেয়ের ক্ষেত্রে তার পিতার প্রতি। মেয়ে তার বাবার সঙ্গ কামনা করে এবং মাকে তার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ফ্রয়েড মায়ের এই মনোভাবকে প্রথমে ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স (Electra Complex) নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ছেলেমেয়ে উভয়েরই এই মনোভাবকে ঈডিপাস কমপ্লেক্স নাম দিয়েই বোঝান হয়ে থাকে।

শিশু যত বড় হয় তত ঈডিপাস কমপ্লেক্সের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা মীমাংসা ধীরে ধীরে তার মধ্যে দেখা দেয়। মার প্রতি তার আসক্তিকে সে যৌনবর্জিত করে তোলে এবং যত সে বড় হয় তত তার যৌনমূলক ভালবাসা যৌনহীন ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। বাবার প্রতিও বিরাগ ক্রমশ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য শিশুর অচেতন মনে পিতার প্রতি তার প্রাথমিক বিদ্বেষও থেকে যায়। ফলে পিতার প্রতি শিশুর মনোভাবকে ভালবাসা ও বিদ্বেষের মিশ্রিত এক দ্বৈত অনুভূতি (ambivalence) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

কাষ্ট্রেসন কম্প্লেক্স (Castration Complex)

মায়ের প্রতি যৌন আসক্তি শিশুর মনে পিতার সম্বন্ধে একটা বিরাট ভীতির সৃষ্টি করে। শিশু মনে করে মার প্রতি তার এই আসক্তির জন্য পিতা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন এমন কি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার যৌনাঙ্গ ছেদন করতে পারেন। বাবার প্রতি শিশুর এই ভীতিমূলক মনোভাবকে কাষ্ট্রেসন কমপ্লেক্স (Castration Complex) নাম দেওয়া হয়েছে।

কমপ্লেক্স ও অধিসত্তা (Complex and Super Ego)

অধিসত্তার অনেকখানি ঈডিপাস কম্‌প্লেসের দান। এই ঈডিপাস কম্‌প্লেক্স থেকে ধীরে ধীরে শিশুর অধিসত্তা গঠিত হতে থাকে। যে সব নৈতিক অনুশাসন, করণীয় অকরণীয় ও পাপ-পুণ্যের বোধ ঈডিপাস কম্‌প্লেক্স থেকে শিশুর মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় সেগুলিই পরে অধিসত্তার আকার ধারণ করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের নৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনের মান নির্ধারিত করে। পিতার সম্বন্ধে শিশুর ভীতিবোধ তাকে পিতার প্রতি অনুগত ও বাধ্য করে তোলে। পরে যখন শিশু বড় হয় তখন তার উপর ঈডিপাস কমপ্লেক্সের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যায় এবং পিতার সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ভীতিবোধও লোপ পায়। কিন্তু পেছনে থেকে যায় একটা সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও নৈতিক আদর্শের প্রতি স্বতঃপ্রসূত আনুগত্য। তারই নাম অধিসত্তা। প্রচলিত ভাষণে তাকেই আমরা বিবেক বলে থাকি।

প্রশ্ন :

1. What is a Complex ? How is a Complex formed ? Discuss the origin and structure of Oedipus Complex.

চোদ্দ

মনোবিকারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

(Nature and Characteristics of Psychosis)

তীব্র মনোবিজ্ঞানমূলক চাপ কিংবা মস্তিষ্কঘটিত অসুস্থতা কিংবা দুইয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে মনোবিকার সৃষ্টি হতে পারে। এইজন্য মনোবিকারকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে, আচরণমূলক (functional) এবং অঙ্গগত (organic)। সেই সব মনোবিকারকে আচরণমূলক বলা হয় যেগুলির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণিত কোন মস্তিষ্কের রোগ পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে যে মনোবিকারগুলির ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোনও মস্তিষ্কের বিকৃতি বা ত্রুটি দেখা যায় সেগুলিকে অঙ্গগত মনোবিকার বলা হয়ে থাকে। APA-শ্রেণীবিভাগে আচরণগত মনোবিকারকে মনোজাত (Psychogenic) মানসিক অসুস্থতার পর্যায়ে ফেলা হয়েছে এবং অঙ্গগত মনোবিকারকে 'মস্তিষ্কের ক্ষতি বা ত্রুটিজাত মানসিক অসুস্থতা'র (Mental Diseases due to Brain Damages) শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

আচরণমূলক মনোবিকার (Functional Psychosis)

এর মধ্যে আচরণগত মনোবিকারকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। সেগুলি হল—

১। **সিজোফ্রেনিক প্রতিক্রিয়া** (Schizophrenic Reactions)
২। **প্যারানয়েড প্রতিক্রিয়া** (Paranoid Reactions)
৩। **অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া** (Affective Reactions)
৪। **শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়া** (Involutional Reactions)

সিজোফ্রেনিক প্রতিক্রিয়া বলতে সেই সব মনোবিকারকে বোঝায় যেগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাস্তব থেকে অপসরণ, প্রক্ষোভের মন্দীভবন, চিন্তার ব্যাহতি, বিভ্রান্তি, অলীক প্রত্যক্ষণ, অপরিবর্তনীয় একঘেয়ে আচরণ ইত্যাদি।

প্যারানয়েড প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নিপীড়ন, বিরাটত্ব

প্রভৃতির বিভ্রান্তি, যদিও অন্যান্য দিক দিয়ে ব্যক্তির স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তা মোটামুটি ভাবে অক্ষুণ্ণই থাকে।

অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ হল ব্যক্তির চিন্তা, আচরণ ও মেজাজের চরম পরিবর্তন। এই শ্রেণীতে দুটি প্রধান উপশ্রেণী পড়ে, যথা—ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ প্রতিক্রিয়া এবং মনোবিকারমূলক বিষণ্ণতা।

শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা, উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা দেখা যায়। এই সব ব্যাধিতে পূর্বতন মনোবিকারের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না এবং বিশেষ শরীরতত্ত্বমূলক পরিবর্তনের সময়ই এই ধরনের মনোবিকার দেখা দেয়।

অঙ্গগত মনোবিকার (Organic Psychosis)

অঙ্গগত মনোবিকারেরও অনেকগুলি উপশ্রেণী আছে। সেগুলি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হবে না।

মনোবিকারের দুটি সাধারণ লক্ষণ

যদিও বিভিন্ন মনোবিকারের নিজস্ব স্বতন্ত্র কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তবু এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে যা প্রায় সব রকম মনোবিকারের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তার মধ্যে বিভ্রান্তি (Delusion) ও অলীক প্রত্যক্ষণ (Hallucination) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভ্রান্তি (Delusion)

বিভ্রান্তির অর্থ হল মিথ্যা বিশ্বাস। বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যা বিশ্বাস করবে তা যদি স্পষ্টত অবাস্তব হয় বা যদি তার বিপরীত প্রমাণও পাওয়া যায় এমন কি তার সেই বিশ্বাসের জন্য যদি তার সামাজিক সঙ্গতিবিধানে অসুবিধাও হয় তবু সে জোরের সঙ্গে তার সেই বিশ্বাসকে সমর্থন করে যাবে।

বিভ্রান্তি নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন, (ক) পাপ ও অপরাধের বিভ্রান্তি—ব্যক্তি মনে করে যে সে অমার্জনীয় অপরাধ করে অপরের বিপদ ঘটিয়েছে। (খ) ব্যাধিগ্রস্ততার বিভ্রান্তি (Hypochondrical delusion)—ব্যক্তি মনে করে নানা কঠিন ও বীভৎস রোগে সে ভুগছে, যেমন তার গা পচে যাচ্ছে, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে বা তাকে কে যেন খেয়ে ফেলছে। (গ) শূন্যতা-

মূলক বিভ্রান্তি (Nihilistic delusion)—ব্যক্তি মনে করে যে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং সে একটা ছায়া জগতে বাস করছে। (ঘ) উৎপীড়নের বিভ্রান্তি (Delusion of persecution)—ব্যক্তি মনে করে যে সকলে তাকে উৎপীড়িত করছে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, ভয় দেখাচ্ছে ইত্যাদি। (ঙ) বিরাটত্বের বিভ্রান্তি (Delusion of grandeur)—ব্যক্তি মনে করে যে সে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, নাম করা বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ, অবতার বা কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

অলীক প্রত্যক্ষণ (Hallucination)

অলীক প্রত্যক্ষণে ব্যক্তি বাহ্যিক কোনরূপ বাস্তব উদ্দীপক ছাড়াই নানা প্রকারের অদ্ভুত বস্তু এবং ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তাকে কি করতে হবে সেই নির্দেশ দিয়ে বা তার কাজের সমালোচনা করে কণ্ঠস্বর সে শুনতে পারে, কখনও বা ঈশ্বরের কাছ থেকে সে বাণী লাভ করতে পারে, কিংবা কোন অলৌকিক শক্তি তাকে মানবজাতিকে বাঁচাবার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

কণ্ঠস্বর শোনার অলীক প্রত্যক্ষণ মনোবিকারের সাধারণ লক্ষণ হলেও দেখা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, আস্বাদ নেওয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই ধরনের অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটা সম্ভব। রোগী আকাশে দেবদূতকে উড়ে যেতে দেখতে পারে, ঘরে বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ পেতে পারে, তার খাবারে বিষের স্বাদ পেতে পারে, তার চামড়ার নীচে ছোট ছোট অসংখ্য পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে এ অনুভব করতে পারে ইত্যাদি।

নানা ধরনের শারীরিক ও মনোবৈজ্ঞানিক কারণ থেকে এই ধরনের অলীক প্রত্যক্ষণ দেখা দিতে পারে। প্রচণ্ড ক্লান্তি, মাদকদ্রব্য, জ্বর থেকে জাত প্রলাপ, মস্তিকের অসুস্থতা এবং অহংসত্তার প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার অতিরঞ্জন প্রভৃতি কারণরূপে কাজ করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক কারণবশত অলীক প্রত্যক্ষণ ঘটলেও ব্যক্তির মানসিক সংগঠন ও ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতির সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

আচরণমূলক মনোবিকারের কারণ (Causes of Functional Neurosis)

আচরণগত মনোবিকারের কোনও সর্বজনীন বা সাধারণ প্রকৃতির কারণ উল্লেখ করা যায় না। এমন কি কোনও একটি বিশেষ মনোবিকারমূলক প্রতিক্রিয়ারও (যেমন সিজোফ্রেনিয়া) সাধারণধর্মী কোনও কারণ নির্ণয় করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শরীরতত্ত্বমূলক, মনোবিজ্ঞানমূলক এবং সমাজতত্ত্বমূলক

শক্তিগুলির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই বিভিন্ন মনোবিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই জন্যই বিভিন্ন মনোবিকারের ক্ষেত্রে যেমন কারণ বিভিন্ন হয়ে দাঁড়ায় তেমনই বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মনোবিকার ঘটার কারণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

শরীরতত্ত্বমূলক কারণ

যদিও আচরণগত মনোবিকারের ক্ষেত্রে কোনও সুনির্দিষ্ট অঙ্গগত দোষ বা বিকৃতি পাওয়া যায় না, তবু এমন অনেক শরীরতত্ত্বমূলক ঘটনা বা ব্যাপার আছে যা মনোবিকারের সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আধুনিক জননতত্ত্ববিদেরা বিকৃত জিন এবং গর্ভাবস্থায় পারিবেশিক অবস্থা থেকে শিশুর মধ্যে মনোবিকারমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় বলে মনে করে থাকেন। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে এই ধরনের অবস্থা থেকে নবজাতকের মস্তিষ্ক সংগঠনে কোন অতি সূক্ষ্ম এবং স্থায়ী ধরনের অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি দেখা দেয় কিংবা তার জৈবরাসায়নিক প্রণালীতে এমন কোন বিকৃতি ঘটে যার ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়ে যায় এবং তার ফলে শিশুর সঙ্গতিসাধনের শক্তির অবনতি ঘটে। স্বাভাবিক এবং অনুকূল পরিবেশে এ ধরনের দোষ থেকে কোন কুফল দেখা দেয় না, কিন্তু পারিবেশিক চাপ গুরুতর প্রকৃতির হয়ে উঠলে মনোবিকারমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

মনোবিজ্ঞানমূলক কারণ

ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিকারের ক্ষেত্রগুলিতে অস্বাভাবিক এবং বৈষম্যমূলক অতীত অভিজ্ঞতা একপ্রকার নিরবচ্ছিন্নভাবেই বিদ্যমান থাকে। যে সব মনোবিজ্ঞানমূলক ঘটনা বা ব্যাপার মনোবিজ্ঞানের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে সেগুলি হল—(ক) বিকৃত পারিবারিক অবস্থা, শৈশবকালীন মনোবিজ্ঞানমূলক আঘাত প্রভৃতি ঘটনা যা ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা গঠনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (খ) নানাপ্রকার চাপ, ব্যর্থতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব যা ব্যক্তির মধ্যে নিপীড়নের সৃষ্টি করে এবং অহংসত্তার প্রতিরক্ষাকে সুতীব্র করে তোলে। আচরণগত মনোবিকারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা সংঘটক কারণরূপে যে সব চাপ বা আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা কাজ করে সেগুলি সব সময় বাইরে থেকে নির্ণয় করা যায় না। তার কারণ হল সেগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ চিন্তা ও মূল্যায়ন থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে।

সমাজতত্ত্বমূলক কারণ

মনোবিকারের সৃষ্টিতে সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক ঘটনাগুলির ভূমিকা খুবই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির। যদিও সব সমাজেই সব রকম মনোবিকার দেখা যায় তবু মনোবিকারের বিকাশ ও লক্ষণ গঠনে সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক প্রচারের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক বৈষম্যের জন্য মনোবিকারমূলক লক্ষণের গঠন, বিশেষ প্রকৃতির মনোবিকারের প্রাদুর্ভাবের সংখ্যা এবং মনোবিকারের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি ও বিকাশ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকারের লক্ষণের প্রকৃতি সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন গারো বা খাসিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে কারও মনোবিকার হলে সে মনে করবে যে সেখানকার অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরোহিত তাকে যাদু করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সহরের শিক্ষিত সমাজে কারও মনোবিকার ঘটলে সে হয়তো মনে করে যে পুলিশের লোক বা অন্য কোন শক্তিশালী সংস্থা তার পিছু নিয়েছে। মনোবিকার সম্বন্ধে সামাজিক প্রভাবের আর একটি উদাহরণ হল যে আদিম অনগ্রসর সমাজে শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজের চেয়ে মনোবিকারের প্রাদুর্ভাব কম দেখা যায়। আমেরিকার একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে কেনিয়ার আফ্রিকানদের মধ্যে মনোবিকারের সংখ্যা হল প্রতি ১ লক্ষে ৩৭টি, যেখানে আমেরিকায় মনোবিকারের সংখ্যা হল প্রতি ১ লক্ষে ৮৮০টি।

১। সিজোফ্রেনিক প্রতিক্রিয়া
(Schizophrenic Reactions)

১৮৬০ সালে মোরেল (Morel) নামে একজন বেলজিয়ানবাসী চিকিৎসক একটি ১৩ বছরের ছেলের মনোবিকারের চিকিৎসার ভার নেন। এই ছেলেটি এককালে পড়াশোনায় খুবই ভালো ছিল। কিন্তু পরে সে পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমশ নির্জনতাপ্রিয়, উদাসীন ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। প্রায়ই সে তার বাবাকে হত্যা করার কথা বলতো। মোরেল এই রোগের নাম দিলেন ডিমেনসিয়া প্রিকক্স (Dementia Praecox), যার অর্থ হোল অল্পবয়সের মানসিক অবনতি বা মনোবিকার। ক্রেপেলিন (Kraepelin) পরে তার মনোবিকারের শ্রেণীবিন্যাসে এই নামটির ব্যবহার করেন এবং তাই থেকে বহুদিন এই নামটি এই ধরনের

মনোবিকারের রোগ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে এই শ্রেণীর মনোবিকার অল্পবয়সে প্রায়ই হয় না, বরং এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা দেয় পরিণত বয়সে। সেইজন্য ডিমেনসিয়া প্রিককৃস বা যৌবনের মনোবিকার নামটি অপ্রযোজ্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯১১ সালে সুইজারল্যাণ্ডবাসী মনশ্চিকিৎসক ইউজিন ব্লিউয়ার (Eugene Bleuer) সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) বা বিভক্ত-ব্যক্তিসত্তা নামটি প্রবর্তিত করেন। সেই থেকে এই শ্রেণীর রোগগুলিকে বোঝাতে এই নামটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সিজোফ্রেনিয়ার সাধারণ লক্ষণাবলী
(General Characteristics of Schizophrenia)

বর্তমানে সিজোফ্রেনিয়া বলতে এমন একশ্রেণীর মনোবিকারকে বোঝায় যার প্রধান লক্ষণ হোল বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এবং প্রক্ষোভমূলক ও চিন্তামূলক প্রক্রিয়া সম্পাদনে অসুবিধা বা ব্যাঘাত হওয়া। সিজোফ্রেনিয়ার বিশেষধর্মী লক্ষণগুলি যদিও সংখ্যায় অগণিত তবুও কতকগুলি সাধারণ বা সর্বজনীন লক্ষণের উল্লেখ করা যায়[১]। যথা—

১। বাস্তব থেকে অপসরণ: চারপাশের মানুষ ও ঘটনা সম্বন্ধে রোগীর আগ্রহের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি।

২। আত্মকেন্দ্রিকতা: নিজের অবাস্তব কল্পনা এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চিন্তাধারায় মগ্ন থাকা।

৩। প্রক্ষোভের তীক্ষ্ণতানাশ ও বিকৃতি: পরিবেশ বা ঘটনার তুলনায় অনুভূতিমূলক ও প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার অগভীরতা।

৪। বিভ্রান্তি ও অলীক প্রত্যক্ষণ: বিশেষ করে অপরের দ্বারা প্রভাবিত ও উৎপীড়িত হওয়ার বিভ্রান্তি এবং কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়ার অলীকপ্রত্যক্ষণ।

৫। আচরণের অস্বাভাবিকতা: চলাফেরা, অঙ্গভঙ্গী, অভিব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতা, যেমন খিলখিল করে হাসা, নিশ্চুপ হয়ে থাকা, বারবার একটি কাজ করা।

৬। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের হ্রাসপ্রাপ্তি ও শৃঙ্খলাহীনতা: চিন্তাধারার ব্যাহতি, যেমন দীর্ঘকাল কোন চিন্তাধারা অনুসরণে অক্ষমতা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসংরক্ষণের নিয়মাবলী মেনে চলার অভ্যাসের অবনতি এবং নৈতিক মানের পতন।

---

[১] ১৯৫৯ সালের সিজোফ্রেনিয়ার উপর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পর্যবেক্ষণ দলের বিবরণী থেকে গৃহীত।

সিজোফ্রেনিয়া এমন একটি মনোবিকার যা প্রায়ই দেখা যায়। মোট জনসংখ্যার মধ্যে অন্তত শতকরা একজন এই রোগে ভোগে বলে বিশ্বাস করা হয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাবের সংখ্যা প্রায় সমান। সিজোফ্রেনিয়া রোগীর চিকিৎসা করতে হলে দীর্ঘকাল হাসপাতালে রাখা ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এ্যাসোসিয়েশনের শ্রেণীবিভাগে সিজোফ্রেনিয়ার ৯টি টাইপের উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি টাইপই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সেই পাঁচটি শ্রেণীর আলোচনা করব।

১। সিম্পল বা সহজ টাইপ (Simple Type)

২। হেবেফ্রেনিক টাইপ (Hebephrenic Type)

৩। ক্যাটাটনিক টাইপ (Catatonic Type)

৪। প্যারানয়েড টাইপ (Paranoid Type)

৫। চাইল্ডহুড বা শৈশব টাইপ (Childhood Type)

১। সিম্পল বা সহজ টাইপ (Simple Type)

এই শ্রেণীর সিজোফ্রেনিয়ার বিশেষ লক্ষণ হল ধীরে ধীরে আগ্রহের হ্রাসপ্রাপ্তি ও সঙ্কোচন, উচ্চাশার অবলুপ্তি, প্রক্ষোভমূলক উদাসীনতা এবং সামাজিক সংযোগ থেকে অপসরণ। সে নিজের কোন কাজেরই গুরুত্ব দেয় না এবং বাড়ীর লোকে তার সম্বন্ধে কি ধারণা করল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মাঝে মাঝে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং আক্রমণধর্মী হয়েও ওঠে। ক্রমশ সে কথাবার্তা কম বলতে থাকে, নিজের পোষাক ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং নিজের অবাস্তব কল্পনার বাইরে আর কিছুতে মনোযোগ দেয় না। ক্রমে ক্রমে সে কোনও কাজ করার চেষ্টা করে না, কোন দায়িত্বও নেয় না এবং অতি সাধারণ, দায়িত্বহীন, উদাসীন এবং পরনির্ভর জীবনযাপনেই সন্তুষ্ট থাকে।

কোনরকম উপদেশ, উৎসাহদান, বোঝান, অনুনয় কিছুতেই ফল হয় না এবং রোগী একগুঁয়ে ও নেতিমূলক হয়ে ওঠে। এই ধরনের রোগীদের চিন্তামূলক ও প্রাক্ষোভিক অপসরণ দেখা দিলেও তাদের মানসিক প্রক্রিয়া ব্যাহত বা বিপর্যস্ত হয় না।

সাধারণত সিম্পল বা সহজ টাইপের রোগীরা হাসপাতালে খুব কমই ভর্তি হয়। বাড়ীর লোকেরা এই ধরনের রোগীদের দেখাশোনার ভার নিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী নিজেই নিম্নশ্রেণী কেরাণী বৃত্তি বা ঐ জাতীয় কাজ কর্ম করে নিজে

নিজেই জীবন কাটাতে পারে। তারা সাধারণত জীবনে কোনও উন্নতি করার চেষ্টা করে না এবং সকল প্রকার পরিবর্তন বা সংস্কার তারা এড়িয়ে চলে। সাধারণত লোকে এদের অদ্ভুত বা বোঝা বলে মনে করে থাকে। অপরাধী, বারবণিতা, ভবঘুরে প্রভৃতিদের মধ্যে সিম্পল সিজোফ্রেনিয়া রোগগ্রস্ত অনেক পাওয়া যায়।

২। হেবেফ্রেনিক টাইপ (Hebephrenic Type)

হেবেফ্রেনিক শ্রেণীর সিজোফ্রেনিয়া অল্প বয়স থেকেই সুরু হয় এবং ব্যক্তিসত্তার গুরুতর বিপর্যয় এর একটি লক্ষণ। রোগের সূত্রপাতে ব্যক্তির মধ্যে অদ্ভুত আচরণ, ছোটখাট ব্যাপারে আতিশয্য প্রকাশ এবং দার্শনিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার নিয়ে চিন্তা প্রভৃতি দেখা যায়।

রোগের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি প্রক্ষোভের দিক দিয়ে উদাসীন হয়ে পড়ে, তার প্রতিক্রিয়াগুলি শিশুসুলভ হয়ে ওঠে এবং চিন্তা, কাজ ও কথার মধ্যে অযৌক্তিকতা ও শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দেয়। সব সময়ে বোকার মত একটা হাসি তার মুখে লেগে থাকে এবং মাঝে মাঝে সে অর্থহীনভাবে হেসে ওঠে। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে অবান্তর উত্তর দেয়।

কণ্ঠস্বর শোনা এই রোগের একটা বড় লক্ষণ। এই কণ্ঠস্বর তাকে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করার জন্য অভিযুক্ত করে, তার মনে নোংরামি প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং মাঝে মাঝে কুৎসিত ভাবে গালাগালি দেয়। অনেক সময় নানা অবাস্তব কল্পনা তার মনকে অধিকার করে থাকে। সে মনে করে যে শত্রুরা তাকে অনুসরণ করছে, এমন কি তাকে অনেকবার হত্যাও করেছে। হেবেফ্রেনিকের রোগী শালীনতা বা নৈতিক মানও ভুলে যায়, অশ্লীল কথাবার্তা বলে এবং নানা রুচিবিগর্হিত কাজও করে।

হেবেফ্রেনিক রোগী প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের চাপ সহ্য করতে না পেরে শিশুসুলভ আচরণ স্তরে ফিরে গিয়ে নিজের অলীক কল্পনার জগতে নিজেকে অপসৃত করে রাখে। তার ফলে তার প্রক্ষোভের বিকৃতি ও তীক্ষ্ণতানাশ ঘটে। শিশুসুলভ হাসি এবং অর্থহীন কাজকর্মের সাহায্যে সে নিজের মনের পুঞ্জীভূত উত্তেজনার লাঘব করে।

হেবেফ্রেনিক জাতীয় রোগীর ধারণা হয়ে থাকে যে তার প্রতিকূল শক্তিগুলি এতই প্রবল যে তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সংগ্রাম চালিয়ে কোন লাভ নেই এবং সেই

জন্য সে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও শিশুসুলভ আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের মানসিক তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

৩। ক্যাটাটনিক টাইপ (Catatonic Type)

ক্যাটাটনিক জাতীয় প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত আকস্মিকভাবে রোগীর মধ্যে দেখা দেয়, যদিও অনুসন্ধান করলে রোগীর অতীত জীবনে ধীরে ধীরে বাস্তব থেকে অপসরণ ও প্রক্ষোভমূলক উদাসীনতার ইতিহাস পাওয়া যাবে। তবে ক্যাটাটনিক সিজোফ্রেনিয়ায় যদিও বাস্তব থেকে অপসরণের মাত্রা যথেষ্ট বেশী তবু এর নিরাময়ের সম্ভাবনা অন্যান্য শ্রেণীর সিজোফ্রেনিয়ার চেয়ে তুলনায় অধিকতর।

ক্যাটাটনিক সিজোফ্রেনিয়ার রোগী দুটি মানসিক অবস্থার মধ্যে ঘোরাফেরা করে, একটি হল আচ্ছন্ন অবস্থা (stuporous state), অপরটি হল, উত্তেজিত অবস্থা (excited state)। আচ্ছন্ন অবস্থায় রোগী সব রকম সজীবতা হারিয়ে ফেলে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখনও দিনের পর দিন নিশ্চল হয়ে একই ভঙ্গীতে বসে থাকে। এই অবস্থায় সে খাওয়া-দাওয়া করে না, এমন কি মলমূত্র ত্যাগের প্রয়াসকেও নিয়ন্ত্রিত করে না। চরম নেতিমূলক মনোভাব এই রোগের একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

একটি বিস্ময়ের ব্যাপার হল যদিও রোগী আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তবু তার চারপাশের ঘটনা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। কখনও কখনও নেতিমূলক মনোভাবের পরিবর্তে রোগীর মধ্যে অনুভাবনীয়তা (suggestibility) দেখা যায়। সে তখন অপরের অনুকরণ করে (একোপ্রাক্সিয়া : Echopraxia), আপনা-আপনি অপরের আদেশ পালন করে, কিংবা একই কথা বার বার আবৃত্তি করে (একোলালিয়া : Echolalia)। এই সময় তার হাতটা যদি কোন বিশেষ অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়, তাহলে সে সেই অবস্থাতেই বেশ কিছুক্ষণ হাতটি রেখে দেবে। এর নাম মোমের মত নমনীয়তা (cerea flexibilitas)। এই আচ্ছন্ন অবস্থায় রোগী প্রায়ই বিভ্রান্তি ও অলীকপ্রত্যক্ষণে ভোগে। সাধারণত সে মনে করে যে তার শরীরের মধ্যে বিরাট সব অলৌকিক শক্তির যুদ্ধ চলছে এবং সে যে বিভিন্ন নিশ্চল অঙ্গভঙ্গীগুলো করে সেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে সে তার অবাস্তব কল্পনার প্রতীকরূপী বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করে।

উত্তেজনামূলক অবস্থা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দেখা দিতে পারে। এই

সময় রোগী ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সে উত্তেজিতভাবে অর্থহীন কথা বলে, চারদিকে ঘোরাফেরা করে, অসংযত যৌনসম্পর্কে ব্যাপৃত হয় এবং নিজের কিংবা পরের প্রতি গুরুতর আক্রমণধর্মী আচরণ করে। এই উত্তেজিত অবস্থাও কয়েক ঘণ্টা, কয়েকদিন এবং সময় সময় কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে।

৪। প্যারানয়েড টাইপ (Paranoid Type)

প্যারানয়েড শ্রেণীতে সিজোফ্রেনিয়ার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে থাকে উল্লেখন (reference) এবং প্রভাবনের (influence) বিভ্রান্তি, উৎপীড়নের বিভ্রান্তি এবং প্রায়ই বিরাটত্বের বিভ্রান্তি।

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া এবং প্যারানইয়ার[১] মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটি সিজোফ্রেনিয়ার একটি বিশেষ প্রকার, তার সঙ্গে যুক্ত থাকে উপরের উল্লিখিত বিভ্রান্তিগুলি। কিন্তু প্যারানইয়ার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিভ্রান্তিগুলিই থাকে, সিজোফ্রেনিয়ার কোনও লক্ষণ সেখানে প্রকাশ পায় না।

উল্লেখনের বিভ্রান্তিতে রোগী মনে করে যে সকলে তার কথা উল্লেখ করছে বা তাকে নিয়ে আলোচনা করছে। প্রভাবনের বিভ্রান্তিতে রোগী মনে করে যে অন্য লোকেরা তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এই দুটি বিভ্রান্তির সঙ্গে প্যারানয়েড জাতীয় সিজোফ্রেনিয়ার রোগী মনে করে যে সকলে তাকে উৎপীড়িত করার বা বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে এবং সময় সময় তার মনে হয় যে সে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বা কোনও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চরিত্র ইত্যাদি।

সাধারণত প্যারানয়েড রোগী খেয়ালী, বিরক্তিপ্রবণ এবং সন্দিগ্ধচেতা হয়ে থাকে। তাকে উৎপীড়িত করার জন্য সে অপরকে প্রায়ই দোষী করে এবং তার ফলে সে নানা গোলমালেও পড়ে। রোগ যত বেড়ে যায় ততই তার স্বাভাবিক কাজ কর্ম করা সম্ভব হয় না এবং শেষ পর্যন্ত তার জীবনটাই বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। বিপদে পড়ার ভয়ে সে বাড়ীর বাইরে নাও যেতে পারে। তার বিভ্রান্তির জন্য সময় সময় সে দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারে। তার কথাবার্তা ক্রমশ উত্তেজিত ও অসঙ্গত হয়ে ওঠে।

উৎপীড়নের বিভ্রান্তির জন্য সে মনে মনে ভাবে যে সকলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং ক্রমশ সে তার আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব সহকর্মী প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচেতা হয়ে ওঠে। সে অভিযোগ করে যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে, বিষ দেওয়া

[১]পৃঃ ১৬৬

হচ্ছে, তাকে নিয়ে আলোচনা চালান হচ্ছে কিংবা শত্রুরা নানা রকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

কখনও কখনও বিরাটত্বের বিভ্রান্তিতে সে মনে করে যে সে একজন অসামান্য ব্যক্তি। সে নেপোলিয়ন, সিজার বা রুজভেল্ট।

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া রোগের তীব্রতা বেশী হলেও স্থায়ী নয়। কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে ভাল চিকিৎসা করলে সে প্রায়ই সেরে ওঠে। কিন্তু প্যারানয়েড রোগীদের হাসপাতালে পাঠান দুঃসাধ্য কাজ হয়ে ওঠে। কেননা তারা চিকিৎসার প্রচেষ্টাকে বাধা দেয়। অনেক সময় হাসপাতালে যাবার ভয়ে প্যারানয়েড রোগী তার রোগের লক্ষণ লুকিয়ে ফেলে। তার ফলে ভিতরে ভিতরে রোগ বেড়ে যায় এবং ব্যক্তির চিন্তামূলক ও প্রক্ষোভমূলক শক্তির পূর্ণ অবনমন ঘটে।

ফ্রয়েড এবং অনেক সাম্প্রতিক মনঃসমীক্ষকদের মতে প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায় সমরতিমূলক (homosexual) অন্তর্দ্বন্দ্বই মূলত দায়ী। ক্লাফ্ এবং ডেভিস (১৯৬০) ১৫০ জন প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ার পুরুষ রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের মধ্যে সমরতিমূলক চিন্তার প্রাধান্য সম্বন্ধে প্রমাণ পান। মুর এবং সেলজার (১৯৬৩) ১২৮ জন প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ার রোগী পর্যবেক্ষণ করে সমরতিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত পেয়েছেন।

৫। শৈশবকালীন টাইপ (Childhood Type)

শৈশবকালে সত্যকারের সিজোফ্রেনিয়া হয় কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। তবে বর্তমানে বিশেষজ্ঞেরা শৈশবকালীন সিজোফ্রেনিয়ার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন।

শৈশবকালীন সিজোফ্রেনিয়াতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণবিকাশে ব্যাঘাত বা ছেদ ঘটাই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। ব্লেণ্ডার (Blender) শৈশবকালীন সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেন এবং তাঁর মতে ১১ বছর বয়সের আগে শিশুদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে আত্ম-সচেতনতার বোধ জাগতে দেরী হয়, পিতামাতার আদর্শ গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়, বাস্তবের সুসংগঠিত আকৃতি উপলব্ধিতে বাধার সৃষ্টি হয় এবং দুশ্চিন্তার বিরুদ্ধে উপযোগী প্রতিরক্ষাকৌশল গঠন করতে তাদের অহংসত্তা সমর্থ হয় না।

চিকিৎসা

গত ১৫।২০ বৎসর আগেও সিজোফ্রেনিয়ায় কোনও কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। অতি সাম্প্রতিককালেই সিজোফ্রেনিয়ার উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে।

দেখা গেছে যে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলিতেই সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় সুফল পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

১। রোগ সুরু হবার পর যত শীঘ্র চিকিৎসাব্যবস্থা হবে ততই রোগ সারার সম্ভাবনা বেশী হবে। রোগের সুরু থেকে অন্তত ১৮ মাসের মধ্যে চিকিৎসা সুরু হওয়া দরকার।

২। ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে এবং চাপা ভাবে রোগের আক্রমণের চেয়ে আকস্মিক তীব্র আক্রমণে চিকিৎসা অধিকতর ফলবতী হয়।

৩। চাকরি যাওয়া, প্রেমে হতাশা প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট সংঘটক কারণগুলি যেখানে থাকে সেখানে চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়।

৪। রোগী যদি তার রোগ সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে পারে তাহলেও রোগ সারানো সহজ হয়।

৫। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রোগী যদি কোন অনুকূল পরিবেশে ফিরে আসতে পারে তাহলে চিকিৎসার ফল স্থায়ী হয়।

দেখা গেছে সব রকম সিজোফ্রেনিয়ার মধ্যে ক্যাটাটনিক শ্রেণীভুক্ত সিজোফ্রেনিয়া সবচেয়ে বেশী সারে। কোনও কোনও সিজোফ্রেনিয়ার রোগীকে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করা গেলেও অধিকাংশ সিজোফ্রেনিয়ার রোগীকেই হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার হয়।

ইতিপূর্বে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় ইনসুলিন শক থেরাপীই বিশেষ প্রচলিত ছিল। শরীরের মধ্যে অধিক মাত্রায় ইনসুলিন ইঞ্জেকশান প্রবেশ করিয়ে দিলে সর্বশরীরে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। আজকাল ইনসুলিনের পরিবর্তে ইলেকট্রিক শক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ইলেক্ট্রোশক থেরাপীই সবচেয়ে কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতিরূপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। দেখা গেছে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ জন সিজোফ্রেনিয়ার রোগী এই পদ্ধতিতে ভাল হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইনসুলিন ও ইলেকট্রিক শক একসঙ্গেও দেওয়া হয়ে থাকে।

যে সব দীর্ঘস্থায়ী ক্ষেত্রগুলিতে শক থেরাপীতে ফল পাওয়া যায় না সেখানে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের উপর অস্ত্রোপচার পদ্ধতির প্রচলন

হয়েছে। একে প্রি-ফ্রন্টাল লবোটমি (Pre-frontal lobotomy) বলা হয়।

তবে শক থেরাপী জাতীয় চিকিৎসার স্থায়ী মূল্য নেই বলেই অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করে থাকেন। এই ধরনের চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হল রোগীকে বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শকথেরাপীর পর যদি মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা না করা হয় তাহলে স্থায়ী আরোগ্য হয় না।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় আজকাল রাসায়নিক চিকিৎসা (Chemotherapy) বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রেসারপাইন (Reserpine), ফেনোথিয়াজেনেস (Phenothyazenes) প্রভৃতি প্রশমক (tranquillizer) ওষুধের দ্বারা সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলিকে খুব কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়েছে। এগুলির পূর্ণ কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার সময় এখনও না আসলেও একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকারে বিশেষ করে সিজোফ্রেনিয়ার তীব্র ও দুর্দমনীয় ক্ষেত্রগুলিতে এই প্রশমনধর্মী ওষুধগুলি থেকে খুব তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যায়। তাছাড়া এই সব ওষুধের প্রয়োগের ফলে রোগীর মধ্যে লক্ষণগুলি বেশ প্রশমিত হয়ে যায় এবং তখন অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ আরও সহজ ও সুসাধ্য হয়ে ওঠে।

মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা (Psychotherapy)

কোন কোন শ্রেণীর সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণমূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার পরিধি এতই সীমাবদ্ধ যে তা সত্যকারের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা প্রণালীর পর্যায়ে পড়ে না। রজেন (Rosen) এবং ফ্রম রাইখম্যান (From Reichmann) সুদীর্ঘ মনঃসমীক্ষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা করে উল্লেখযোগ্য ফল পেয়েছেন বলে শোনা যায়।

ব্যক্তিগত মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাও সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতির মূল প্রণালী হল রোগীর সঙ্গে একটা নির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং আশ্বাস ও উৎসাহদানের মাধ্যমে তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। এই পদ্ধতিতে পরিবেশের যে চাপের ফলে তার মধ্যে মনোবিকার দেখা দিয়েছে সে চাপকে দূর করা বা যতটা সম্ভব হ্রাস করা হয়ে থাকে। রোগী যাতে নিজের কার্যাবলীর পরিকল্পনা করতে পারে তার জন্য তাকে যথাযথ সাহায্য

দেওয়া হয়ে থাকে। এই ধরনের ব্যক্তিগত মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাসপাতালে যে সব চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় সেগুলির সবই এখানেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

যৌথ মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

সিজোফ্রেনিয়া রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী যৌথ মনশ্চিকিৎসার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে যে সব রোগী বাস্তব থেকে নিজেদের অপসৃত করে নেয় তাদের এমন একটি পরিবেশে রাখা হয় যেখানে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে তারা নানারকম কাজকর্ম শেখে এবং বাস্তবকে চিনতে পারে। যৌথ মনশ্চিকিৎসা প্রবর্তনের ফলে হাসপাতালে সুশিক্ষিত চিকিৎসকের অভাববোধ অনেক কমে গেছে। এই সব যৌথ সমাবেশে সুশিক্ষিত মনশ্চিকিৎসকের পরিচালনায় রোগীরা যেমন নানারকম কাজকর্ম করে তেমনই বহু বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিয়েও থাকে। রোগের নানাবিধ কারণ সম্পর্কে তারা নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করে এবং হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর কি ভাবে চাকুরী খুঁজবে সে সম্পর্কেও আলোচনা করে থাকে।

২। প্যারানয়েড প্রতিক্রিয়া (Paranoid Reactions)

প্যারানয়েড প্রতিক্রিয়া বলতে একধরনের মনোবিকারকে বোঝায় যার প্রধান লক্ষণ হল সন্দেহ। এর সঙ্গে কম বা বেশী মাত্রায় থাকে ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়নের অবনতি। এই রোগের মাত্রা স্বল্প থাকলে ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়ন মোটামুটিভাবে অক্ষুন্নই থাকে, কিন্তু গুরুতর ক্ষেত্রে, যেমন প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ার বেলায়, ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়নের চরম বিপর্যয় ঘটতে পারে। প্যারানয়েড রোগে নানারকম মানসিক ব্যাঘাত দেখা দিতে পারে।

প্যারানয়েড প্রতিক্রিয়াকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়—প্যারানইয়া (Paranoia) এবং প্যারানয়েড অবস্থা (Paranoid State)

প্যারানইয়া (Paranoia)

প্যারানইয়া ব্যাধিতে রোগীর মধ্যে একটি জটিল যুক্তিভিত্তিক ও শৃঙ্খলাসম্পন্ন বিভ্রান্তির সংগঠন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। সাধারণত নিপীড়ন বা বিরাটত্বের বিভ্রান্তিই অধিকাংশ প্যারানইয়া রোগীর মধ্যে দেখা যায়। এই দৃঢ়বদ্ধ সুপরিণত বিভ্রান্তি ছাড়া প্যারানইয়া রোগীর মধ্যে অন্য কোনও গুরুতর অস্বাভাবিকতা

দেখা যায় না। মোটামুটিভাবে তার ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়ন অব্যাহতই থাকে এবং ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিশেষ কোনও লক্ষণীয় বিপর্যয় দেখা যায় না।

প্যারানয়েড অবস্থা (Paranoid State)

প্যারানয়েড অবস্থার মধ্যে অস্থায়ী প্রকৃতির বিভ্রান্তি দেখা যায় এবং প্যারানইয়া রোগীর মত বিভ্রান্তির যুক্তিভিত্তিক ও শৃঙ্খলাসম্পন্ন কোনও সংগঠন দেখা যায় না। অলীক প্রত্যক্ষণও প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকে। এই ধরনের রোগীদের প্যারানইয়া রোগীর মত ব্যক্তিসত্তার গুরুতর ক্রমাবনতি ঘটে না। মনোবিকারগ্রস্ত নয় এমন অনেক ব্যক্তির মধ্যেও প্যারানইয়াধর্মী চিন্তা ও আচরণ দেখা যায়। এই সব প্যারানয়েড অবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিরা অতি-অনুভূতিশীল, অনমনীয়, সন্দিগ্ধচিত্ত ও শৃঙ্খলা-বিরোধী হয়ে থাকে। এরা নিজেদের সম্বন্ধে অবাস্তব মূল্যায়ন করে থাকে এবং সম্পূর্ণ যুক্তিহীন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পোষণ করে। যখন তারা সেই লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হয় তখন তারা অপরের আক্রমণধর্মী বা নিপীড়নমূলক উদ্দেশ্যকে দায়ী করে থাকে। এদের আগে থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে লক্ষণগুলি স্থায়ী রোগে পরিণত হতে পারে।

প্যারানইয়ার প্রকৃতি

প্যারানইয়া মনোবিকারে রোগীর বিকাশমূলক কোনও অবনতি ঘটে না এবং সুসংগঠিত ভ্রান্তিমূলক একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বাস্তবের সঙ্গে তার সংযোগ খুব স্বাভাবিক স্তরেরই থাকে। আর এই ভ্রান্তির সংগঠনটি এতই যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যক্তি রচনা করে যে তার মূল ভিত্তিটি যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে আর বাকী স্তরগুলি সম্বন্ধে কোনও আপত্তি থাকবে না। কিন্তু এই মূল ভিত্তিটিই হল ভ্রান্তিমূলক এবং তার বিষয়বস্তু হল ব্যক্তির ধারণা যে অপরে তাকে নির্যাতিত বা নিপীড়িত করছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকে নিজেকে বিরাট বলে মনে করার প্রবণতা। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতা ছাড়া রোগীর ব্যক্তিসত্তা অটুট থাকে।

প্যারানইয়া সৃষ্টির কারণ এখনও সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। তবে অন্যান্য মনোবিকারের মত পিতামাতা ও অন্যান্য বয়স্কদের সঙ্গে শৈশবকালীন সম্পর্কের সমস্যাই যে প্যারানইয়া সৃষ্টির কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিশুর জীবনে যদি এই সব সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে তাহলে পরবর্তীকালে ব্যক্তির মধ্যে নির্লিপ্ততা, সন্দিগ্ধচিত্ততা ও রাগ জন্মে। প্যারানইয়ার রোগীদের পূর্ব ইতিহাসে হীনমন্যতার বোধ

এবং সঙ্গতিবিধানে অক্ষমতা প্রায়ই দেখা যায়। এর সঙ্গে প্রায় অধিকাংশক্ষেত্রেই থাকে যৌন সমস্যার জটিলতা এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় অতিরিক্ত মানসিক বাধা এবং অনমনীয় নৈতিক মনোভাব। যে সব অপরাধবোধ ব্যক্তি মেনে নিতে পারে না সেগুলি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সংগঠনই অনেক ক্ষেত্রে প্যারানয়েড লক্ষণ তৈরী করে।

প্যারানয়েড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ব্যাখ্যা রূপে দুটি তত্ত্বের প্রচলন আছে। একটি হল, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণমূলক তত্ত্ব, অপরটি ডঃ নরম্যান ক্যামেরনের দেওয়া কৃত্রিম সমাজের (Pseudo-community) তত্ত্ব।

ক। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণমূলক তত্ত্ব

ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তির মধ্যে প্যারানইয়া সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়াগুলির পরম্পরা হল এইরূপ। প্রথম ধাপে,—"আমি তাকে ভালবাসি"—কিন্তু ব্যক্তি এই চিন্তাকে বাতিল করে দেয়, কেননা এটি তার অচেতন সমরতিমূলক প্রবণতার প্রকাশ এবং সেজন্য সে এটিকে গ্রহণ করতে পারে না। দ্বিতীয় ধাপে,—প্রতিক্রিয়া সংগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম ধাপ পরিবর্তিত হয়ে হয়—"আমি তাকে ঘৃণা করি"। কিন্তু এটির বিষয়বস্তু আক্রমণধর্মী হওয়াতে সে এটিকেও গ্রহণ করতে পারে না। তখন তৃতীয় ধাপে, প্রজেকসান বা প্রতিফলন রূপ প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় ধাপটি রূপান্তরিত হয়ে হয়, "সে আমাকে ঘৃণা করে এবং আমাকে উৎপীড়ন করছে।"

ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তির প্যারানইয়ার মনোভাবটি এই অচেতন চিন্তাপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে থাকে। আধুনিক মনশ্চিকিৎসকদের মতে অনেক প্যারানইয়ার ক্ষেত্রে এই ভাবে ব্যাধি সৃষ্টি হলেও, সব ক্ষেত্রেই এ তত্ত্বটি প্রযোজ্য হয় না।

খ। ক্যামেরনের কৃত্রিম সমাজতত্ত্ব (Theory of Pseudo-community)

মনশ্চিকিৎসক ডক্টর নরম্যান ক্যামেরন প্যারানইয়ার সংব্যাখ্যানে "কৃত্রিম-সমাজের" একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে প্রতিফলন প্রক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অতি-অনুভূতিশীলতা থেকে প্যারানইয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সব ব্যক্তি অপরের কাছে নিজের মনের কথা বলতে পারে না এবং নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অপরের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তারা পুরোপুরি অপরিচিত ব্যক্তিদের এক জগতে বাস করে এবং তাদের সঙ্গে সে না পারে কোনও যোগাযোগ স্থাপন করতে, না পায় তাদের কাছ থেকে কোনও সহানুভূতি বা সমর্থন। তারা

সামাজিক পরিবেশে কোনও নিজস্ব ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না এবং সেইজন্য তারা অপরের দৃষ্টিভঙ্গীরও কোনও মূল্য দিতে সমর্থ হয় না। তার ফলে তাদের মানসিক অবস্থা গভীর অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার দ্বারা সর্বদাই পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এই অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা তাদের চারপাশের ঘটনা এবং ব্যক্তিদের নিয়ে একটি 'কৃত্রিম সমাজ' গঠন করে নেয়। এই 'কৃত্রিম সমাজটি' তাদের সম্পূর্ণ সান্ত্বনা বা আশ্বাস দিতে না পারলেও, যা ঘটছে তার ব্যাখ্যার দিক দিয়ে এটি তাদের চাহিদা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়। তাদের পরিবেশের কাজকর্মগুলির এইভাবে সংব্যাখ্যান করার ফলে তাদের মিথ্যা বিশ্বাস ও ধারণাগুলি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তারা একটা সুসংরক্ষিত ধারণাবলীর জগতে বাস করে। তার ফলে তারা তাদের চারপাশের যে সুসংহত সামাজিক দলটিকে দেখতে পায় সেটির প্রকৃতপক্ষে কোনও বাস্তবভিত্তিক সংগঠন নেই, সেটি সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের প্রতিক্রিয়ার উপর স্থাপিত একটি কৃত্রিম সমাজ মাত্র।

প্যারানইয়া সৃষ্টির কারণ

দীর্ঘকাল ব্যাপী মনোবিকারমূলক বিকাশপ্রবণতা এবং সংঘটক চাপমূলক পরিস্থিতি থেকেই প্যারানইয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যক্তির পূর্বতন বিকাশমূলক প্রক্রিয়ার অস্বাভাবিকতার মধ্যে নানা কারণ বা উপাদানের উল্লেখ করা যায়। তার মধ্যে জীবতত্ত্বমূলক, মনোবিজ্ঞানমূলক এবং সমাজতত্ত্বমূলক কারণগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জীবতত্ত্বমূলক কারণ

প্যারানইয়ার কারণরূপে কোনও সুনির্দিষ্ট বংশধারামূলক এবং শরীরতত্ত্বমূলক উপাদান আজ পর্যন্তও পাওয়া যায় নি। সিজোফ্রেনিয়া বা ম্যানিক ডিপ্রেসিভ রোগীর ক্ষেত্রে তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যেমন ঐ বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাবের মাত্রা বেশী দেখা যায় প্যারানইয়ার ক্ষেত্রে তেমন কিছু দেখা যায় না। এক-কথায় প্যারানইয়া মনোবিকারে বংশধারাগত প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও ক্রেৎসমার কৃশকায় গঠন সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্যারানইয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী হয় বলে মনে করতেন তবু পরবর্তী বহু পর্যবেক্ষণ থেকে এ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা যায় নি।

মনোবিজ্ঞানমূলক কারণ

প্যারানইয়া সৃষ্টির মনোবিজ্ঞানমূলক কারণগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য ; যেমন, ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, ব্যর্থতা এবং হীনমন্যতার বোধ, প্রতিফলন এবং কৃত্রিম সমাজ সৃষ্টি, যৌনগত অসঙ্গতি, অপরাধবোধের প্রতিফলন ইত্যাদি। বিভিন্ন প্যারানইয়া রোগীর পূর্ব ইতিহাস পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশে ব্যাহতি, পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধানে অসামর্থ্যের জন্য ব্যর্থতা বা অপরাধবোধের মনোভাব, নৈতিক কারণের জন্য নিজেকে হেয় বলে মনে করা ইত্যাদি ঘটনা বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

সামাজিক কারণ

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মান উভয় দিক দিয়েই উন্নত সমাজগোষ্ঠীদের মধ্যেই প্যারানইয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। প্যারানইয়ার সৃষ্টি ও বিকাশে এই উন্নত সামাজিক স্তরের কোনও প্রভাব আছে বলে এখনও সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে উন্নত সমাজগোষ্ঠীতে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধারণত বেশ উন্নতই হয়ে থাকে এবং ঐ গোষ্ঠীর অন্তর্গত অনেকেরই ঐ লক্ষ্যে পৌছানর মত সামর্থ্য থাকে না। অথচ সকলকেই ঐ লক্ষ্যটি মেনে নিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিজস্ব সামর্থ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের জন্য ব্যর্থতা দেখা দেয়।

৩। অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া (Affective Reactions)

ক্রেপেলিন তাঁর মনোব্যাধির শ্রেণীবিভাগে উত্তেজিত, আনন্দিত, অসুখী এবং বিষণ্ণদের একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাদের নাম দেন ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ মনোবিকার। আধুনিক অ্যামেরিকান সাইকিয়াট্রিক এ্যাসোসিয়েশনের শ্রেণীবিভাগে এই শ্রেণীটির নাম দেওয়া হয়েছে অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া (Affective Reaction)। আচরণমূলক মনোবিকারের শ্রেণীবিভাগে গুরুত্বের দিক দিয়ে সিজোফ্রেনিয়ার পরেই এর স্থান।

ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের প্রাদুর্ভাবের দিক দিয়ে সাধারণ জনসংখ্যার প্রতি দশ জনের মধ্যে একজনের এই রোগ হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে হাসপাতালে মানসিক অসুস্থতার জন্য যে সব রোগী প্রথম ভর্তি হয় তাদের মধ্যে শতকরা ৮ জনই ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের রোগী। সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বৎসর বয়সেই এই রোগের আক্রমণ বেশী হয় এবং তার পরবর্তী বয়সেও এই রোগ বেশ দেখা যায়।

অনুভূতিমূলক মনোবিকার ঘটার নানারকম কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে।

যথা, বংশধারামূলক (Hereditary), শরীরতত্ত্বমূলক (Physiological), মনোবিকারমূলক (Psychological) এবং কৃষ্টিমূলক (Cultural)।

বংশধারামূলক কারণ

ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী। যেমন, ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের রোগীর ক্ষেত্রে অভিন্ন যমজদের মধ্যে ৭০%, ভিন্নকোষী যমজদের মধ্যে ১৬%, ছেলেমেয়েদের মধ্যে ১৬%, পিতামাতাদের মধ্যে ১৫% এবং সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে ১৩% এই রোগের আক্রমণ সংঘটিত হয়ে থাকে। অবশ্য এই পরিসংখ্যান থেকেই এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে করা যায় না যে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগ বংশধারা থেকেই হয়ে থাকে, কেননা এসব ক্ষেত্রেই পরিবেশের প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করা যায় না। তবে আধুনিক জননতত্ত্বের নানা আবিষ্কার থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে পিতামাতার জনন-কোষের মধ্যে যে DNA নামক রাসায়নিক উপাদানটি থাকে তার মধ্যে যদি কোনও অস্বাভাবিক সংগঠন বা ত্রুটি থাকে তাহলে তা থেকে শিশুর মধ্যে মনোবিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের ক্ষেত্রেও যে DNAর বিন্যাসের কোন ত্রুটি কারণ হতে পারে না, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না।

শরীরতত্ত্বমূলক কারণ

ক্রেৎসমার (Kretschmer) এবং পরবর্তীকালে সেলডন (Sheldon) শারীরিক সংগঠনের সঙ্গে মনোবিকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলেছেন। ক্রেৎসমারের মতে পিকনিক টাইপ (বেঁটে ঘাড়মোটা ব্যক্তি) লোকেদের মধ্যে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগ বেশী দেখা যায়। সেলডনের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মেসোমর্‌ফিক ও এনডোমর্‌ফিক, এই উভয় টাইপেই অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। এঁদের মতে শারীরিক সংগঠন ও শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্যের উপর ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ মনোবিকার নির্ভর করে। অবশ্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই রোগের প্রকৃত সম্পর্কটা কি তা এখনও নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি।

ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগের আক্রমণের সময় কি ধরনের শারীরিক পরিবর্তন হয় লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে এই দু' অবস্থার আবির্ভাবের সময় শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনও বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। ক্রেপেলিনের মতে শরীরের মধ্যে

উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টির ফলে এই রোগ দেখা দেয়, কিন্তু তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

মনোবৈজ্ঞানিক কারণ

ম্যানিক ডিপ্রেসিভ মনোবিকারের সৃষ্টিতে কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক কারণ বিশেষ প্রভাবশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেগুলি হল পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক, প্রাক্-মনোবিকারমূলক ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণাবলী এবং ব্যক্তির উপর পারিবেশিক চাপের মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব। অধিকাংশ ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর নৈতিক লক্ষ্য এবং চরম শৃঙ্খলা পালনের অতি শৈশবকালীন ইতিহাস পাওয়া যায়। পিতামাতারা এই রোগীদের শৈশবে খামখেয়ালপ্রসূত যে সব দৃষ্টান্ত তাদের সামনে স্থাপন করেন সেগুলিই পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মনোবিকার সৃষ্টি করে থাকে বলে মনে করা হয়। ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগীদের মধ্যে যে সব প্রাক্-মনোবিকারমূলক ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ দেখা যায় সেগুলি হল উচ্চাশা এবং অতি উচ্চমাত্রার বহির্বৃততা, সামাজিকতা ও উদ্যমের অতিরিক্ত বহিঃপ্রকাশ। যে সব রোগীদের মধ্যে বিষণ্ণতার পর্যায়টি প্রধান তাদের মধ্যে উপরের লক্ষণগুলি ছাড়া দুশ্চিন্তা, হীনমন্যতার প্রয়াস, অনমনীয় বিবেক এবং শত্রুতার অনুভূতি অবদমন করার একটা উল্লেখযোগ্য প্রবণতা দেখা যায়। তবে গুরুতর প্রকৃতির জীবনসমস্যার উপস্থিতিই এই ধরনের মনোবিকারের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

আধুনিক মনশ্চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে জন্মগত প্রবণতার সঙ্গে মিলিত হয়ে মনোবৈজ্ঞানিক কারণগুলিই ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ প্রধানত সৃষ্টি করে থাকে, তবে একথাও সত্য যে শরীরতত্ত্বমূলক কারণগুলি রোগীর অহংসত্তার বোঝা বাড়িয়ে থাকে।

কৃষ্টিমূলক কারণ

ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগসৃষ্টির ক্ষেত্রে কৃষ্টিমূলক কারণের কার্যকরী ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। যদিও দেখা গেছে যে সকল প্রকার সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরেই ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগ হয়ে থাকে তবু কোনও কোনও সামাজিক গোষ্ঠীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়।। যেমন নিউজিল্যাণ্ডে সিজোফ্রেনিয়া রোগের চেয়ে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগ প্রায় আড়াই গুণ বেশী দেখা যায়। আবার আমেরিকায় এর বিপরীতটি সত্য।

উপরে বর্ণিত কারণগুলিকে আমরা ম্যানিক ডিপ্রেসিভ মনোবিকারের পূর্বগামী

বা পরোক্ষ কারণ বলে বর্ণনা করতে পারি। জন্মগত ও শরীরতত্ত্বমূলক প্রবণতা এবং পিতামাতার সঙ্গে শৈশবকালীন সম্পর্কই এই কারণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের প্রত্যক্ষ বা সংঘটক কারণ বলতে জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিতে ব্যক্তির উপর তীব্র চাপের উল্লেখ করা যায়। এই অতি তীব্র চাপের ফলে রোগীর মানসিক সাম্যের কাঠামোটি ভেঙে পড়ে।

অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ

(Special Symptoms of Affective Reactions)

অনুভূতিমূলক মনোবিকারের বিশেষ লক্ষণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যে প্রথমত, এর আক্রমণ সাধারণতঃ আকস্মিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রায় ৬ মাসের সময় প্রতিক্রিয়া নিজে নিজেই হোক বা চিকিৎসার ফলেই হোক বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়ত, এই মনোবিকারের পুনরাবির্ভাব ঘটার খুবই সম্ভাবনা থাকে, যদিও তা কয়েক বছর পরেও হতে পারে। চতুর্থত, এই সব রোগীর মধ্যে বুদ্ধি বা প্রক্ষোভ কোনও দিক দিয়েই অবনতির কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। পঞ্চমত, এর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হল মনোভাবের বিরাট পরিবর্তন। ষষ্ঠত, ভ্রান্তি, অলীক-প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি থাকলেও এগুলি এই রোগের অপরিহার্য লক্ষণ নয়।

শ্রেণীবিভাগ

অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে, যথা—

১। ম্যানিক ডিপ্রেসিভ প্রতিক্রিয়া : ম্যানিক বা উত্তেজিত টাইপ

২। ম্যানিক ডিপ্রেসিভ প্রতিক্রিয়া : ডিপ্রেস্‌ড্ বা বিষণ্ণ টাইপ

৩। ম্যানিক ডিপ্রেসিভ প্রতিক্রিয়া : মিশ্র বা চক্রাকার টাইপ।

১। ম্যানিক টাইপ (Manic Type)

এই টাইপভুক্ত রোগীদের প্রধান লক্ষণ হল অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, চরম প্রকৃতির সঞ্চালনমূলক কাজ এবং অনিয়ন্ত্রিত চিন্তা। রোগীর মধ্যে বেশ ভাল মেজাজ, আশাবাদিতা এবং রসানুভূতির মনোভাব দেখা যায়। সে সব সময় নড়া-চড়া করে, অনর্গল কথা বলে বা চীৎকার করে। এই প্রবণতাকে "কাজের চাপ" বা "কথার চাপ" বলে বর্ণনা করা হয়। রোগী সব সময় ভীষণভাবে অন্যমনস্ক থাকে এবং অসংযত চিন্তায় ডুবে থাকে। এই অবস্থায় রোগী বিরক্তি এবং রাগ দেখায় এবং তাকে বাধা দিলে কটূক্তি করে। সে প্রায়ই বিরাটত্বের বিভ্রান্তিতে ভোগে।

২। ডিপ্রেসিভ্ড্ টাইপ (Depressed Type)

ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ প্রতিক্রিয়ায় ডিপ্রেস্ড্ অবস্থার প্রধান লক্ষণগুলি হল বিষাদ এবং আশাহীনতার অনুভূতি, সঞ্চালনমূলক কাজে ব্যাহতি এবং চিন্তার বিঘ্নতা।

রোগী তার পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে এবং পারিবেশিক উত্তেজনা যত প্রবল হোক না কেন তা তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। রোগী খুব সহজ এবং ছোট কাজও অনেক কষ্টে সম্পন্ন করে। তার প্রতিক্রিয়াকাল খুবই মন্থর হয়ে ওঠে। চিন্তার দিক দিয়ে খুব সহজ চিন্তাপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেও রোগী অসুবিধা বা অক্ষমতা অনুভব করে।

এর সঙ্গে অতিতুচ্ছতা বা অপরাধের অনুভূতি থেকে প্রায়ই বিভ্রান্তি জাগতে পারে। মাঝে মাঝে কটূক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর সে শুনতে পায়। এর সঙ্গে শারীরিক ব্যাধিও দেখা দেয়।

৩। মিশ্র বা চক্রাকার টাইপ (Mixed or Circular Type)

এই পর্যায়ে পড়ে সেই সব ক্ষেত্র যেখানে রোগীর মধ্যে ম্যানিক এবং ডিপ্রেস্ড্-এর মিশ্র রূপ দেখা দেয় কিংবা এই দুটি অবস্থা ক্রমাগত একটি পর আর একটি দেখা দেয়।

মনোবিকারমূলক বিষণ্ণতার প্রতিক্রিয়া

(Psychotic Depressive Reaction)

অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়ার অন্তর্গত আর একটি বিশেষ প্রকৃতির মনোবিকার আছে যাকে মনোবিকারমূলক বিষণ্ণতার প্রতিক্রিয়া বলা হয়। এটি ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এই মনোবিকারে রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণতা বোধ করে এবং বাস্তবকে ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। ভ্রান্তি এবং অলীকপ্রত্যক্ষণও এর সঙ্গে থাকতে পারে। যদিও ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের ডিপ্রেস্ড্ শ্রেণীর সঙ্গে এই রোগের কিছু মিল আছে তবু এ দুটি শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। প্রথমত, মনোভাবের পরিবর্তন বা বিষণ্ণতার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, কোনও বিশেষ পরিবেশগত সংঘটক কারণ থেকেই এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, মনোবিকারমূলক বিষণ্ণতার প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ডিপ্রেসড্ টাইপের চেয়ে অনেক বেশী এবং সেখানে বাস্তবের বিকৃতিও অধিকতর।

চিকিৎসা

সাধারণত ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগীর চিকিৎসায় কতকগুলি বিষয়ের প্রতি সব আগে মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রথমত দেখা হয় যে অবসন্নতা, স্বতঃ-উত্তেজনা

এবং সংক্রমণ প্রভৃতি মারাত্মক গৌণ লক্ষণগুলি যেন রোগীর মধ্যে প্রকাশ না পায়। দ্বিতীয়ত, রোগীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্কতা গ্রহণ করা এবং যাতে রোগীকে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় তার জন্য তার লক্ষণের উপশমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

ম্যানিক প্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা

ম্যানিক টাইপের চিকিৎসায় প্রথমেই রোগীকে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। স্বল্পমাত্রার ক্ষেত্রগুলিতে বৃত্তিমূলক বা বিনোদনমূলক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর উত্তেজনাপূর্ণ কাজগুলিকে সংগঠনমূলক কাজের দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয়। চরম ক্ষেত্রগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী মাদক ঔষধ বা জলচিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। ক্লোরপ্রোমাজাইন (Chlorpromazine) এবং ফেনোথিয়াজাইন (Phenothyazine) থেকে প্রস্তুত আধুনিক আবিষ্কৃত কতকগুলি ওষুধের প্রয়োগে লক্ষণের দ্রুত অপশমন ঘটে থাকে।

বিদ্যুতের সাহায্যে উত্তেজনা সৃষ্টির চিকিৎসাও (electrotherapy) অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই দৈহিক চিকিৎসার পদ্ধতিগুলি স্থায়ী লক্ষণ নিবারণ বা রোগের পুনরাবির্ভাব বন্ধ করতে পারে না। এর জন্য উগ্র লক্ষণগুলি প্রশমিত হলেই মনোবৈজ্ঞানিকমূলক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রয়োগ করা প্রয়োজন। একথা অবশ্য সত্য যে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের রোগ প্রায়ই আপনা আপনি স্বাভাবিকভাবেই সেরে উঠে এবং তার পরে আবার আবির্ভূত হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে যে রোগীর পরিববেশের কোনও এক বা একাধিক উপাদান তার রোগ সৃষ্টি করে থাকতে পারে। অতএব রোগীর পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এই রোগের চিকিৎসার একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

ডিপ্রেসিভ প্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা

ডিপ্রেসিভ টাইপের রোগীদের সকল প্রকার সঞ্চালনমূলক কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকার জন্য সর্বাগ্রে দেখতে হবে যেন তার পর্যাপ্তভাবে দৈহিক পুষ্টি ঘটে এবং শরীর রক্ষার প্রাথমিক কাজগুলি ঠিকমত সম্পন্ন হয়। বিদ্যুৎ প্রয়োগে উত্তেজনাসৃষ্টির চিকিৎসা এই ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হয়। এই চিকিৎসার দ্বারা রোগীকে তার অবসন্নতা থেকে জাগান সম্ভব হয়, যদিও এর দ্বারা তার

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কোনও স্থায়ী মীমাংসা ঘটে না। সম্প্রতি ডিপ্রেসিভ অবস্থার চিকিৎসার কতকগুলি উত্তেজক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার লক্ষ্য হল রোগের মূল উৎস বা কারণে গিয়ে পৌছান। সেইজন্য রোগীর সঙ্গে সহানুভূতি ও তার সমস্যা উপলব্ধির মনোভাব নিয়ে আচরণ করতে হবে। প্রথমে তার ছোটখাট অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করে পরে তার প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ব্যর্থতার কেন্দ্রে গিয়ে পৌছতে হবে।

৪। শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়া (Involutional Reaction)

শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়া বলতে এমন কতকগুলি মনোবিকারমূলক প্রতি-ক্রিয়াকে বোঝায়, যেগুলি কতকগুলি শরীরতত্ত্বমূলক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয়। সাধারণত এই সব মনোবিকারের ক্ষেত্রে ব্যাধির কোনও পূর্ব ইতিহাস পাওয়া যায় না এবং সাধারণত প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যের সময় দেখা দিয়ে থাকে। এই ব্যাধির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল বিষণ্ণতা এবং ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের বিষণ্ণতার অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে হল শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়াজাত বিষণ্ণতা সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয়, কিন্তু ম্যানিক-ডিপ্রেসিভের ক্ষেত্রে রোগটি দীর্ঘ বিকাশপ্রক্রিয়ার ফলরূপে সঞ্জাত।

সাধারণত শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়ার দুটি শ্রেণী দেখা যায়। প্রথম, শরীর-তত্ত্বমূলক বিষণ্ণতা (Involutional Melancholia) এবং শরীরতত্ত্বমূলক মনোবিকার-প্যারানয়েড টাইপ (Involutional Psychosis: Paranoid Type)

শরীরতত্ত্বমূলক বিষণ্ণতা (Involutional Melancholia)

সাধারণত মধ্য বা তারও পরবর্তী বয়সে এই ব্যাধি দেখা দিয়ে থাকে। এই ব্যাধিতে দুশ্চিন্তা, অপরাধবোধ, উত্তেজনা বা প্যারানইয়া প্রকৃতির বিভ্রান্তি দেখা দিয়ে থাকে। এই সব লক্ষণের সঙ্গে আবার জড়িত থাকে উদরপীড়া এবং অন্যান্য শারীরিক ব্যাধির উপসর্গ।

এই মনোবিকার সাধারণত পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে বেশী দেখা দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৫০-৫৫ বৎসর বয়সেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়ে থাকে।

মনশ্চিকিৎসকেরা শরীরতত্ত্বমূলক বিষণ্ণতার নানা কারণের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, মেয়েদের রজোবন্ধ (menopause) ঘটার সময় মনোবিকারমূলক বিষণ্ণতা দেখা দেয় বলে এই ধরনের শারীরিক পরিণতিগুলিকেই

অনেকে এই মনোবিকারের কারণ বলে বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু রজোবন্ধ বা ঐ ধরনের কোনও শারীরিক পরিবর্তনকে এই মনোবিকারের প্রকৃত কারণ বলে বর্ণনা করা চলে না। কেননা ঐ সময় এমন কোনও লক্ষণীয় শরীরতত্ত্বমূলক পরিবর্তন ঘটে না, যাকে ঐ ব্যাধির কারণ বলে বর্ণনা করা চলে।

দ্বিতীয়ত, শরীরতত্ত্বমূলক পরিবর্তনের সময় দৈহিক সামর্থ্যের অবনতির ফলে যে সামাজিক মর্যাদা এবং ব্যক্তির নিরাপত্তাবোধের হানি ঘটে তাই থেকে ব্যক্তির মধ্যে গুরুতর মনোবৈজ্ঞানিক অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। অনেক মনশ্চিকিৎসক এই ব্যাপারটিকেই শরীরতত্ত্বমূলক মনোবিকারের কারণ বলে মনে করে থাকেন।

তৃতীয়ত, দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতির ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ যাদের মধ্যে থাকে তাদেরই শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনা বেশী থাকে। লাজুকতা, অনমনীয়তা, কার্পণ্য, অতি-সততাবোধ, প্রতিরোধ প্রভৃতি হল এই ধরনের সংলক্ষণ। এই সব সংলক্ষণ সম্পর্কে ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণত কর্তব্যপালনের একটা বাধ্যতামূলক মনোভাব দেখা যায়। ফলে তাদের আগ্রহের পরিধি হয় সঙ্কীর্ণ, বন্ধু থাকে স্বল্পসংখ্যক এবং অতিরিক্ত মাত্রায় কঠোর নৈতিক আদর্শের দ্বারা তারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

চতুর্থত, শরীরতত্ত্বমূলক বিষণ্ণতার রোগীদের পূর্ব ইতিহাসে সাধারণত ব্যর্থতা বা অসন্তোষজনক সাফল্যের কাহিনী পাওয়া যায় এবং 'জীবন এক রকম শেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় বার সুযোগ আর জীবনে আসবে না', এই ধরনের হতাশাসূচক মনোভাবের দ্বারাই তারা সব সময় পীড়িত হয়ে থাকে।

সাধারণত শরীরতত্ত্বমূলক বিষণ্ণতার আক্রমণ যদিও ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তবু কোন একটি আকস্মিক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ব্যাধির সংঘটনের সময় থাকবেই। রোগীর মনকে গভীর বিষণ্ণতা এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্ন ভয় সব সময় ব্যাপ্ত করে রাখে। মিথ্যা অসুখের ধারণা ও শূন্যতামূলক ভ্রান্তি কখনও কখনও দেখা যায় এবং রোগীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে গুরুতর ভয়ের কারণ থাকে। কখনও কখনও অমার্জনীয় পাপ সম্বন্ধে অপরাধবোধের ভ্রান্তিও রোগীর মধ্যে দেখা যায় এবং পৃথিবীর সমস্ত অমঙ্গলের জন্য সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। অস্থিরতা, দুর্ভাবনা, নিদ্রাহীনতা তাকে পীড়িত করে তোলে এবং বিনা কারণে প্রায়ই সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে।

শরীরতত্ত্বমূলক বিষণ্ণতার রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত, কেননা রোগীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা প্রায়ই দেখা দেয়। গুরুতর ক্ষেত্রে রোগীকে

আধুনিক মনোবিশ্লেষণ ও নানারকম বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে মনোব্যাধি সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনোবিকারের তেমন কোন সুষ্ঠু চিকিৎসা পদ্ধতির এখনও আবিষ্কার হয় নি। ইলেক্‌ট্রিক শক এবং নানাপ্রকার ওষুধের সাহায্যে উত্তেজনার সৃষ্টি প্রভৃতি অনির্দিষ্ট প্রকৃতির চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও মনোবিকারের চিকিৎসায় প্রচলিত রয়েছে। আধুনিককালে মস্তিষ্কের শল্য চিকিৎসায় (Psychosurgery) মনোবিকারে সুফল পাওয়া গেছে। কিন্তু মনোবিকারের সুনিশ্চিত নিরাময়ের চিকিৎসা এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে।

এক কথায় আধুনিক মনশ্চিকিৎসকদের মতে মনোব্যাধি বা নিউরসিসের সঙ্গে মনোবিকার বা সাইকোসিসের কোনও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতিগত পার্থক্য পাওয়া যায় না। যে পার্থক্যটা পাওয়া যায় সেটি মূলত মাত্রা বা তীব্রতার। উভয়ের মূলেই যে মানসিক অসঙ্গতি থাকে, নিউরসিসের বেলায় তার তীব্রতা ও জটিলতা কম বলে নিউরসিসে অস্বাভাবিকতার মাত্রা কম এবং তা সহজে আরোগ্য। আর সাইকোসিসের বেলায় সেই মানসিক অসঙ্গতি অতি জটিল, গভীর ও তীব্রমাত্রার হওয়ার জন্য অস্বাভাবিকতার মাত্রা যেমন গুরুতর হয়ে ওঠে তেমনই তা নিরাময় করাও সহজসাধ্য হয় না। কিন্তু একথা ঠিক যে দুয়ের মধ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন :

1. What is psychosis ? In what ways does psychosis vary from neurosis ?
2. What are the general characteristics of psychosis ? How many types of psychosis are there ?
3. Describe the nature, causes and treatment of following psychoses : Schizophrenia, Manic depressive, Paranoia and Involutional Reaction.
4. What is Schizophrenia ? How is it caused and what are its modern treatments ?
5. Discuss the nature and different types of Schizophrenia. Deseribe their causes and modes of treatment.

পনের

মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসাপদ্ধতি

(Therapy of Mental Diseases)

মানসিক অসুস্থতার বৈচিত্র্য এবং শ্রেণী যেমন অজস্র তেমনি তার চিকিৎসা পদ্ধতি ও প্রণালীও বহু প্রকারের হয়ে উঠেছে। এগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—১। ডাক্তারী চিকিৎসা (Medical Therapy), ২। মনোবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসা (Psychotherapy), এবং ৩। সামাজিক চিকিৎসা (Sociotherapy)। গুরুতর মনোবিকারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বহু বিশেষ শিক্ষাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের সামগ্রিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, যেমন মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist), চিকিৎসাগারিক মনোবিজ্ঞানী (Clinical Psychologist), মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক কর্মী (Psychiatric Social Worker), বৃত্তিমূলক এবং বিনোদনমূলক চিকিৎসক (Occupational and Recreational Therapist), মনশ্চিকিৎসামূলক সেবিকা (Psychiatric Nurses) ইত্যাদি। এই সব বিশেষজ্ঞদের বিদ্যা, অভিজ্ঞতা এবং যত্নের সাহায্যেই মানসিক অসুস্থতার রোগী সুস্থ হয়ে আবার সমাজে ফিরে আসতে সমর্থ হয়।

সকল রকম মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসারই তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, শারীরিক উন্নয়ন, দ্বিতীয়ত, মনোবৈজ্ঞানিক উন্নয়ন এবং তৃতীয়ত, সামাজিক উন্নয়ন। শারীরিক উন্নয়নের অর্থ হল রোগীর অঙ্গগত অস্বাভাবিকতা কমান বা দূর করা এবং তার স্বাভাবিক শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা। মনোবৈজ্ঞানিক উন্নয়নের অর্থ হল তার ত্রুটিপূর্ণ ধারণা এবং প্রতিক্রিয়ার ধারা বদলান, তার সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তোলা এবং তাকে তার অধিকতর পরিণতি ও আত্মস্ফূরণের পথ প্রদর্শন করা। সমাজতত্ত্বমূলক উন্নয়নের অন্তর্গত হল রোগীর জীবন পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থাগুলিকে উন্নত করে তোলা যাতে সে পর্যাপ্তভাবে তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতিবিধান করতে পারে।

১। ডাক্তারী চিকিৎসা (Medical Therapy)

মানসিক ব্যাধির ডাক্তারী চিকিৎসার পরিধি বর্তমানে সুবিস্তৃত হয়ে পড়েছে

পরিণতি, সুদক্ষতা এবং আত্মস্ফুরণের দিকে নিয়ে যাওয়া। এর জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌছান প্রয়োজন। সেগুলি হল (ক) রোগীর সমস্যা এবং আচরণে তার অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করা, (খ) তার অহংসত্তার আরও সুসম্পূর্ণ পরিচয় তার কাছে উদ্ঘাটিত করা, (গ) তার মধ্যকার গুরুতর এবং জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করা, (ঘ) তার অবাঞ্ছিত অভ্যাস বা প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন করা, (ঙ) তার দক্ষতার মান উন্নত করা, (চ) তার নিজের এবং নিজের পৃথিবী সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ ধারণার পরিবর্তন করা এবং (ছ) তাকে তার সার্থক ও সম্পূর্ণ সত্তাতে পৌছানর পথ প্রদর্শন করা।

মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় নানা পদ্ধতির প্রচলন আছে। কয়েকটি সুপ্রচলিত পদ্ধতির নীচে বর্ণনা করা হল :—

ক। সাক্ষাৎকার (Interview)
খ। প্রশ্নাবলী (Questionnaire)
গ। কেস হিষ্ট্রি পদ্ধতি (Case History Method)
ঘ। প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test)
ঙ। প্রবোধন (Persuasion)
চ। অনুভাবন (Suggestion)
ছ। বিশ্লেষণ (Analysis)
জ। খেলাভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy)
ঝ। বৃত্তিমূলক চিকিৎসা (Occupational Therapy)
ঞ। যৌথ চিকিৎসা (Group Therapy)

ক। সাক্ষাৎকার (Interview)

এই পদ্ধতিটি অপরিহার্যভাবে সব চিকিৎসাগারেই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করতে হবে তার সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করাটা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় এ কথা বলা বাহুল্য। এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে মনশ্চিকিৎসক ব্যক্তির মনোভাব, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা ও বিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তার সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে একটা ধারণা গঠন করতে পারেন। কেবল কারণ নির্ণয়ই নয় অনেক সময় রোগীর রোগের চিকিৎসাও সুপরিকল্পিত সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়েই সম্পন্ন করা হয়।

সাক্ষাৎকার অপরিহার্য হলেও পদ্ধতিরূপে এটি সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়।

কেননা বহুক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা সত্য না হতেও পারে। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের মনের কথা বলতে অনিচ্ছুক সে সব ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসক প্রত্যাশিত উত্তর পান না। অনেক ক্ষেত্রে রোগী ভুল বা মিথ্যা উত্তর দিয়ে মনশ্চিকিৎসককে বিভ্রান্তও করতে পারে। এই সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে সাক্ষাৎকারের উপকারিতা যে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনোব্যাধি ও মনোবিকার উভয় ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎকার বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খ। প্রশ্নাবলী (Questionnaire or Inventory)

অনেক সময় মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন ব্যক্তিকে দেওয়া হয় সেগুলির উত্তর লিখে দেবার জন্য। এই প্রশ্নগুলি এমনভাবে গঠিত যে সেগুলির যথাযথ উত্তর দিলে ব্যক্তির মনের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের রূপটি মনশ্চিকিৎসকের কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য ব্যক্তি যদি প্রশ্নগুলির উত্তর ঠিক মত না দেয় তাহলে এই পদ্ধতিটির কোনরূপ কার্যকারিতাই থাকে না। সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নাবলী মূলত একই ধরনের পদ্ধতি। তবে সাক্ষাৎকারের তুলনায় প্রশ্নাবলীর একটি বড় উপকারিতা হল যে অনেক সময় সামনাসামনি ব্যক্তি তার মনের সব কথা খুলে বলতে লজ্জা বা সংকোচ অনুভব করে। প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে এই ধরনের ভয় বা সংকোচ তাকে অনুভব করতে হয় না। তেমনি আবার সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সংগে মনশ্চিকিৎসকের যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে, প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে সেটি হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সামনাসামনি সাক্ষাৎকার থেকে রোগীর সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য মনশ্চিকিৎসক সংগ্রহ করতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎকার এবং প্রশ্নাবলী দুটি পদ্ধতিরই এক সংগে প্রয়োগ করা হয়।

ব্যক্তির মনোভাব, মনোবিকারমূলক প্রবণতা, মানসিক সংগঠনের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সুনির্দিষ্ট ও আদর্শায়িত (standardised) অভীক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা আজকাল তৈরী করেছেন। এগুলির মধ্যে উডওয়ার্থ পার্সনাল ডেটা সীট, বেল এ্যাডজাস্টমেণ্ট ইনভেন্টরি, বার্নরয়টার ইনভেন্টরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মনোব্যাধির ক্ষেত্রেই প্রশ্নাবলী কার্যকরী হয়। মনোবিকারের ক্ষেত্রে প্রশ্নাবলীর প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না।

গ। কেস হিষ্ট্রী পদ্ধতি (Case History Method)

সকল প্রকার মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসায় এই পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে। যখনই কোন ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করতে হয় তখনই তার অতীত জীবনের ঘটনাগুলি মনশ্চিকিৎসকের জানা একান্তভাবে দরকার হয়ে ওঠে। মানসিক অসুস্থতার কারণগুলির মধ্যে পরিবেশ একটি প্রভাবশালী শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। অতএব ব্যক্তির অসুস্থতার প্রকৃত কারণ জানতে হলে তার অতীত এবং বর্তমান পরিবেশ উভয়কেই ভাল করে জানতে হবে। এই জন্যই মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাগারে ব্যক্তির সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ এক ধরনের কর্মী থাকে। তাদের মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক কর্মী বলা হয়। এই সামাজিক কর্মীরা বিভিন্ন উৎস থেকে ব্যক্তির অতীত জীবন সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই সব তথ্য দিয়ে তার অতীত ইতিহাসটিকে পুনর্গঠিত করে থাকে। সাধারণত যে সব বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে সেগুলি হল এই—

১। ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জন্মদিন, বয়স, জন্মস্থান, কৃষ্টি ইত্যাদি। ২। যে ব্যাধি বা সমস্যার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার পূর্ণ অতীত ইতিহাস। ৩। পরিবারের মা, বাবা, ভাইবোন, অন্যান্য আত্মীয় প্রভৃতির পরিচয়—বাড়ীতে তার প্রতি অন্য সকলের কি ধরনের মনোভাব। ৪। শিক্ষা—পরিবারের শিক্ষার মান। ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শ ও তার পরিবারের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে কিনা। ৫। স্বাস্থ্য—শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অন্যান্য তথ্য। যৌন বিকাশের বিবরণ। ৬। বুদ্ধির মান ও বিকাশ। ৭। প্রক্ষোভগত বিকাশ। ৮। সামাজিক বিকাশ। আচরণমূলক সমস্যাদি। ৯। বৃত্তি—আর্থিক বৈশিষ্ট্যাদি। বিশেষ আগ্রহ, হবি ইত্যাদি।

ঘ। প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Tests)

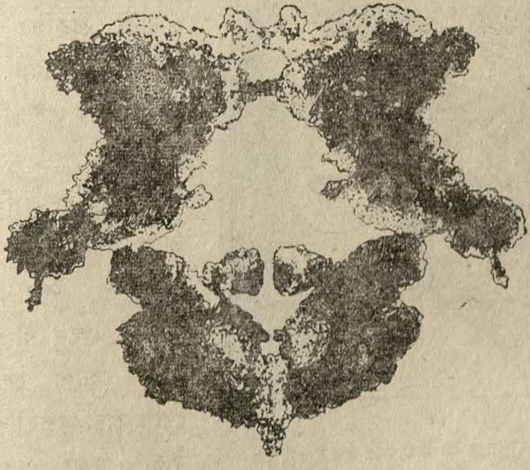
আধুনিক কালে মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে প্রতিফলন অভীক্ষার বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। বিশেষ করে মনোব্যাধির চিকিৎসায় প্রতিফলন অভীক্ষার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই অভীক্ষায় ব্যক্তিকে একটি বিশেষ কাজ করতে বা বিশেষ একটি সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই কাজ বা সমস্যাটির সংগঠন এমনই অনির্দিষ্ট এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির যে সেগুলি সম্পন্ন বা সমাধান করতে গেলে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে

থাকে। এই সব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি তার নিজের ধারণা, মনোভাব, ইচ্ছা, ভয়, দুশ্চিন্তা প্রভৃতির স্বরূপ মনশ্চিকিৎসকের কাছে ব্যক্ত করে ফেলে। প্রতিফলন অভীক্ষা নাম দেওয়ার কারণ হল যে ব্যক্তি এই অভীক্ষাগুলি সমাধান করতে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের প্রকৃত সত্তাকে বাইরে প্রতিফলিত করে ফেলে এবং তার মনের গোপন স্তরে নিহিত অজ্ঞাত ইচ্ছা বা ধারণাগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দেয়। সাধারণত যে সব প্রতিফলন অভীক্ষা চিকিৎসাগারে বহুল ব্যবহৃত হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

(i) রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষা (Rorschach Inkblot Test)

প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রখ্যাত ও বহুল প্রচলিত হল রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষাটি। এই অভীক্ষাটি সুইজারল্যাণ্ডবাসী হারমান রর্সা (Herman Rorschach) নামে একজন মনশ্চিকিৎসক উদ্ভাবন করেন।

একটি কাগজের উপর এক বিন্দু কালি রেখে যদি কাগজটিকে ঠিক ঐ বিন্দুটির



[রর্সা ইঙ্কব্লট টেস্টের একটি ছবি]

মাঝামাঝি ভাঁজ করা হয় তাহলে ঐ বিন্দুটি থেকে এমন একটি কালির ছবি সৃষ্টি হবে যার খণ্ডার্ধ দুটি মোটামুটি একই রকমের দেখতে। এই ধরনের দশটি কালির ছাপ নিয়ে রর্সার অভীক্ষাটি গঠিত। এই কালির ছাপ দিয়ে তৈরী ছবিগুলি একটির পর একটি ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেগুলি দেখে তার মনে যে সব ধারণা বা কল্পনার উদয় হয় তাকে সেগুলি বর্ণনা করতে বলা হয়।

ছবিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি এমনই অনির্দিষ্ট প্রকৃতির যে ব্যক্তির মনে বহু বিভিন্ন ধরনের ভাব ও চিন্তার সৃষ্টি করে থাকে। ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক সংগঠন, মনঃপ্রকৃতি (temperament), বিশ্বাস, দৃঢ়বদ্ধ ধারণা প্রভৃতির দ্বারাই এই সব ভাব ও চিন্তার স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত হয়। সেইজন্য ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি যে ধরনের ব্যাখ্যা দেয় তা থেকে তার মানসিক সংগঠন, আচরণ-প্রবণতা, মনোভাব ইচ্ছা প্রভৃতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করে তার মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা সহজ হয়ে ওঠে।

(ii) কাহিনী-সংবোধন অভীক্ষা (Thematic Apperception Test or TAT)

আর একটি অতি প্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার নাম হল মারে (Murray) ও মর্গান (Morgan) কর্তৃক উদ্ভাবিত কাহিনী-সংবোধনের অভীক্ষা। এই অভীক্ষাটি ১৯টি ছবি দিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি ছবির বিষয়বস্তুটি অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং তার বহু রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। অভীক্ষার্থীকে এই ছবিগুলি দেওয়া হয় এবং সেগুলির উপর ছোট ছোট নিবন্ধ বা কাহিনী লিখতে তাকে বলা হয়। অভীক্ষার্থী ঐ ছবিগুলির উপর যে ধরনের কাহিনী লেখে বা সেগুলির যে ধরনের ব্যাখ্যা সে দেয় তা থেকে তার অপ্রকাশিত মানসিক ইচ্ছা ও দ্বন্দ্বের স্বরূপ অভীক্ষকের নিকট ব্যক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী কাহিনী সংবোধন অভীক্ষাও তৈরী হয়েছে। এটি শিশু সংবোধন অভীক্ষা (Children's Apperception Test or CAT) নামে পরিচিত।



[কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি]

(iii) শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test)

এই অভীক্ষাটি প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ একটির পর একটি করে অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং

একটি শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি বা চিন্তাটি অভীক্ষার্থীর মনে আসে সেইটি তাকে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। একটি শব্দ শোনার পর অভীক্ষার্থীর উত্তর দিতে যতটা সময় লাগে সেই সময় এবং প্রদত্ত উত্তরের প্রকৃতি এ দুয়েরই বিচার করা হয়। যদি অভীক্ষার্থী উত্তর দিতে ইতস্তত বা দেরী করে তাহলে সিদ্ধান্ত করা হয় যে সে তার প্রথম মনে আসা শব্দটি কোনও কারণে বলতে চায় না। অভীক্ষার্থী শব্দগুলি শুনে যে উত্তর দেয় সেই উত্তরের প্রকৃতি বিচার করে চিকিৎসক অভীক্ষার্থীর অচেতনে নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব এবং অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান পান। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইউঙ (Jung) এই শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেছেন। কেন্ট ও রোজানফ (Kent and Rosanoff) মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার উপকরণরূপে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা প্রস্তুত করেন।

(iv) অন্যান্য প্রতিফলন অভীক্ষা

উপরের অভীক্ষাগুলি ছাড়াও প্রতিফলন অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র অভীক্ষা বর্তমানে উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন, বাক্য-সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা, রোজেন-উইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণ অভীক্ষা, অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কনের অভীক্ষা ইত্যাদি। বাক্যসম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিতে এমন কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় যেগুলি বিভিন্ন পন্থায় সম্পূর্ণ করা যায়। এই সম্পূর্ণ-করণের প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির মনোভাব, প্রবণতা ও মানসিক সংগঠনের একটা নির্ভরযোগ্য রূপ পাওয়া যায়। তেমনই চিত্র-সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষায় কতকগুলি অসম্পূর্ণ চিত্র অভীক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর সম্পূর্ণকরণের পন্থা দেখে তার মানসিক সংগঠন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়। রোজেনউইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র



[কাহিনী-সংবোধন অভীক্ষার আর একটি ছবি]

পর্যবেক্ষণের অভীক্ষাটিতে কতকগুলি সাধারণ ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গের দৃষ্টান্ত ছবির আকারে দেওয়া থাকে এবং সেগুলি দেখে অভীক্ষার্থীর মনে কি ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা তাকে বর্ণনা করতে বলা হয়।

ঙ। প্রবোধন (Persuasion)

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে প্রবোধন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রবোধনের মাধ্যমে চিকিৎসা করার অর্থ হল ব্যক্তির যুক্তির কাছে আবেদন করা। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে বোঝান হয় যে তার মধ্যে রোগের যে সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেগুলি নিতান্ত মিথ্যা ও যুক্তিবর্জিত। দেখা গেছে যে রোগী যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে তাহলে যে সব কারণে তার মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয় সেগুলি ধীরে ধীরে লোপ পায়। সাধারণত এই পদ্ধতিতে রোগের লক্ষণগুলি কি ভাবে দেখা দিয়েছে এবং সেগুলির পিছনে প্রকৃতপক্ষে কি কি কারণ আছে সেগুলি রোগীর কাছে ব্যাখ্যা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ তাকে বলা যায় যে কাজের দায়িত্ব এড়াবার প্রবণতা থেকেই তার মাথাধরা রোগটি দেখা দিয়েছে কিম্বা কোন বিশেষ অপরাধ সচেতনতা থেকেই তার মধ্যে কতকগুলি বাধ্যতাধর্মী চিন্তা (Obsession) জন্মেছে। ইত্যাদি। মনোব্যাধিতে প্রবোধন বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। স্বল্পমাত্রার মনোবিকারেও প্রবোধনের উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে।

ব্যাধির কারণ নির্ণয় করেই প্রবোধনের কাজ শেষ হয় না। ব্যাধিমুক্ত হওয়ার জন্য ব্যক্তির পক্ষে কি কি করণীয় এ পদ্ধতিতে সে সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণত কি ভাবে ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং কি ভাবে অবরুদ্ধ প্রক্ষোভকে মুক্ত করা সম্ভব সে সম্বন্ধেও ব্যক্তিকে এ পদ্ধতিতে উপদেশ দেওয়া হয়। যেমন, যে ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভুগছে তাকে বোঝান হয় যে সে সত্য সত্য অক্ষম নয় এবং তার ফলে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে পারে। একজন শিক্ষিকার সব সময় মনে ভয় ছিল যে তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের আঘাত করে ফেলবেন। তাছাড়া মহিলাটি ছেলেমেয়েদের ভাল করে শাসন করতেও পারতেন না। তখন তাঁকে বোঝান হল যে তাঁর অচেতন মনের আক্রমণধর্মিতার জন্যই তাঁর মনে এই ভয় দেখা দিয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই যে এর পর তাঁর দুটি অবাঞ্ছিত লক্ষণই চলে গেল। এর কারণ

হল যে আসলে মহিলাটি নিজেকে খুব দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তি বলে মনে করতেন। যেই তিনি শুনলেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে আক্রমণধর্মী, দুর্বল নন, তখনই তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল এবং তাঁর ভয় ও দুর্বলতা সব কেটে গেল।

প্রবোধন পদ্ধতিতে চিকিৎসার কতকগুলি বিশেষ উপকারিতা আছে। প্রথমত, ব্যাধি যদি খুব জটিল না হয় তাহলে এই পদ্ধতির দ্বারা বিশেষ কাজ পাওয়া যায়। বস্তুত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই আমরা অপরের দোষ ত্রুটি সংশোধন করা বা অপরকে কোন ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত করা বা কোন কাজে প্রবৃত্ত করা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রবোধন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকি। দ্বিতীয়ত, অনেক জটিল ক্ষেত্রেও প্রবোধন পদ্ধতির প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। যেমন কোন ব্যক্তির মানসিক ব্যাধির জন্য হয়তো মনে হয়েছে যে তার হাতটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে যদি তার হাতটা একটু নাড়িয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে সত্যই তার পক্ষাঘাত হয়নি তাহলে তার সে ভুল ধারণাটা ভেঙ্গে যেতে পারে। তৃতীয়ত, মানসিক ব্যাধির ফলে ব্যক্তির মনে যে ভীতি এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয় তা প্রবোধন পদ্ধতির সাহায্যে দূর করা যায়। ব্যক্তিকে যদি তার লক্ষণগুলির প্রকৃত কারণ দেখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ব্যক্তির মন থেকে ভীতি এবং অনিশ্চয়তা যে কেবলমাত্র দূর হয়ে যায় তা নয় অনেক সময় তার লক্ষণগুলি একেবারেই চলে যায়। অন্তত পুরোপুরি চলে না গেলেও সেগুলি মেনে নেবার মত তার মনের জোর দেখা যায়। চতুর্থত, ভীতি, দুশ্চিন্তা ও মানসিক ব্যাধির অন্যান্য লক্ষণকে অনেকে উন্মাদ হবার পূর্বস্তর বলে মনে করে থাকে। তার ফলে যখন তাদের মধ্যে এই সব লক্ষণ দেখা দেয় তখন তাদের মনে চরম হতাশা ও আত্মগ্লানির সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রবোধন পদ্ধতির সাহায্যে তাদের এই ভুল ধারণাটি দূর করা যায় এবং তার ফলে তাদের চিকিৎসা করাও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

চ। অনুভাবন (Suggestion)

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় অনুভাবন পদ্ধতিটি বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা ব্যক্তির মনে একটি বিশেষ ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাই থেকে তার মনে একটা প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হয়। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তির মন যখন গ্রহণোন্মুখ এবং

নমনীয় থাকে তখনই তাকে অনুভাবিত করা সম্ভব হয়। অনুভাবন বলতে বোঝায় এক ব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তিতে একটা ধারণা বা বিশ্বাসের সঞ্চালন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক তার গ্রহণ। যে মানসিক অবস্থায় এই সঞ্চালন এবং গ্রহণ কার্য সম্ভব হয় তাকে বলে অনুভাবনীয়তা। অনুভাবনীয়তার বৈশিষ্ট্য হল যে সে সময় মনের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করার মত কোনও চেষ্টা থাকে না। সেই সময় সেই ব্যক্তিকে যে কথা বলা হয় সেটি সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেয়। এজন্য একদিক দিয়ে অনুভাবনীয়তাকে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা বলে বর্ণনা করা যায়। ব্যক্তির মনে এই অনুভাবনীয়তা বা মানসিক নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি করাই হল অনুভাবনের মাধ্যমে চিকিৎসার প্রথম সোপান।

প্রকৃতপক্ষে অনুভাবনীয়তার অর্থ হল মানসিক নির্ভরপ্রবণতা। ছোট শিশু যেমন দেহের দিক দিয়ে অপরের উপর নির্ভরশীল থাকে অর্থাৎ তার মধ্যে দৈহিক নির্ভরপ্রবণতা থাকে তেমনি ব্যক্তির মধ্যে মনের দিক দিয়েও অপরের উপর নির্ভর-প্রবণতা থাকতে পারে। যখন এই মানসিক নির্ভরপ্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় তখন সে অপরের চিন্তা, অনুভূতি, কাজ, কথা প্রভৃতি বিনা প্রতিবাদে এবং বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করে।

মনের অনুভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে হলে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমত, যে সব ব্যক্তি সব সময় অপরের উপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে সহজেই অনুভাবনীয়তা দেখা দেয়। এই ধরনের ব্যক্তি বুদ্ধিমানই হোক আর নির্বুদ্ধিই হোক তাদের অনুভাবনীয়তার মাত্রা একই হয়। দ্বিতীয়ত, যে সব ব্যক্তি সকল সময় অপরের আজ্ঞা বহন করে চলে তারা সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে বেশী বাধ্য এবং বশ্যতাধর্মী হয়ে থাকে, যেমন নাবিক বা সৈন্যরা। তার ফলে তারা সহজেই অনুভাবনের পাত্র হতে পারে। তৃতীয়ত, অতিরিক্ত মাত্রায় যদি কোন প্রক্ষোভ জাগে তখন ব্যক্তি সহজেই অপরের দ্বারা অনুভাবিত হয়ে ওঠে। কেননা প্রক্ষোভ মানুষের বিচারবুদ্ধিকে অবরুদ্ধ করে তোলে। এইজন্য ব্যক্তি যখন খুব ভয় পায় তখন তাকে অযৌক্তিক কোন পরামর্শ দিলেও সে সেটিকে মেনে নেয়। কিংবা অত্যন্ত রাগের সময় ব্যক্তিকে অন্য কারও সম্পর্কে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য কিছু বললেও সে তা বিশ্বাস করে। চতুর্থত, জনতার মধ্যে অনুভাবনীয়তার মাত্রা খুব বেশী থাকে। তার কারণ হল যে ব্যক্তি যখন জনতার মধ্যে থাকে তখন সে নিজেকে দলের সঙ্গে অভিন্ন করে নেয় এবং দলের মতামতের কাছে নিজের মতামতকে বিসর্জন দেয়। এই সময় সে তার নিজের বিচারবুদ্ধি বা সমালোচনা শক্তির কোনও ব্যবহার করে

না। পঞ্চমত, কতকগুলি বিশেষ মাদকদ্রব্য আছে যেগুলি প্রয়োগ করলে মানুষের মধ্যে অনুভাবনীয়তা দেখা দেয়।

অনুভাবনীয়তার মাধ্যমে চিকিৎসা করার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতিতে ব্যক্তির দেহ ও মনকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় করে আনা হয় এবং তার মধ্যে ঘুমের ভাব দেখা দেয়। এই অবস্থায় ব্যক্তির কোনরূপ সমালোচনা করার মত ক্ষমতা থাকে না এবং তখন সহজেই তাকে অনুভাবিত করা যায়। আর একটি পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে একটি আলো বা অন্য কোন বস্তুর উপর গভীরভাবে মনঃসংযোগ করতে বলা হয়। কোন একটি বিশেষ বিষয় বা বস্তুতে যখনই আমরা গভীর মনোযোগ দিই তখন আমরা অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ি। তার ফলে সেই সময় আমাদের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করারও ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলি। এই অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে অনুভাবনীয়তার মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং তাকে সহজেই কথার দ্বারা প্রভাবিত করা যায়। যে সব চিকিৎসক সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসা করে থাকেন তাঁরা অনেক সময় এই পদ্ধতির অনুসরণ করে থাকেন। আবার আলোর পরিবর্তে কখনও কখনও ব্যক্তিকে একটানা একটি শব্দের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বলা হয়। এই পদ্ধতিতেও ব্যক্তির মনে এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয় এবং সেই সময়ে তাকে সহজেই অনুভাবিত করা সম্ভব হয়।

অনুভাবন সম্পর্কে অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যা বা ভুল কোন কিছু বিশ্বাস করানো হয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় যে অনুভাবনের ব্যবহার করা হয় তার দ্বারা ব্যক্তির মন থেকে মিথ্যা বা ভুল ধারণা দূর করাই হয়। যেমন, হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তি মনে মনে বিশ্বাস করে যে তার চলার শক্তি নেই এবং তার ফলে সে সত্য সত্যই চলতে পারে না। অনুভাবনের সাহায্যে তার মন থেকে এই ভুল ধারণা দূর করে দেওয়া যায় এবং তার ফলে সে তার চলার ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে। অতএব অনুভাবনের প্রকৃত কাজ হল কোন কিছুর সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যক্তির মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং সেই বিশ্বাসের দ্বারা সেই সম্ভাবনাকে সত্য করে তোলা। বস্তুত অনুভাবনের মাধ্যমে চিকিৎসা অনেকখানি ব্যক্তির বিশ্বাস-সৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সব রকম রোগের চিকিৎসায় বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী। যে হিস্টিরিয়া রোগীর মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে তার চলার শক্তি নেই তার মধ্যে যদি এ বিশ্বাস সৃষ্টি করানো যায় যে তার সত্য

সত্যই চলার শক্তি আছে, তাহলে সে প্রকৃতই চলতে পারবে। ঐ রোগীটির মনে সেই বিশ্বাসটি সৃষ্টি করাই হল অনুভাবনের কাজ।

তা ছাড়া অনুভাবনের আর একটা বড় কাজ হল ব্যক্তির মধ্যে শুভ ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন ইচ্ছার সৃষ্টি করা। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে যে হীনমন্যতা দেখা যায় তার কারণ হল যে তারা নিজেদের হীন বলে মনে করে এবং তাদের এই মানসিক রোগ দূর না হওয়ার একটা বড় কারণ হল যে তারা নিজেরাই সহজে রোগ থেকে মুক্ত হতে চায় না। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এই অসুস্থ হয়ে থাকার একটা বিকৃত মনোভাব একপ্রকার সর্বজনীন বললেই চলে। অনুভাবনের সাহায্যে ব্যক্তির মন থেকে এই বিকৃত ও অস্বাস্থ্যকর মনোভাব দূর করা যায়, তার ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করে তোলা যায় এবং তার মনে স্বাস্থ্যবান হয়ে বেঁচে থাকার শুভ ইচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

অনুভাবনের ক্ষেত্রে একটা বড় অসুবিধা হল যে মানসিক ব্যাধির রোগী যেমন সেরে উঠতে চায় তেমনি আবার তার অচেতনে অসুস্থ থাকার একটা প্রবল ইচ্ছাও বলবৎ থাকে। তার ফলে চিকিৎসকের নিরাময় প্রচেষ্টার অনুভাবন এবং রোগীর মধ্যে অসুস্থ হয়ে থাকার একটি দৃঢ়বদ্ধ ধারণা এই দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং রোগীর ঐ ধারণা যত বেশী গভীর ও দৃঢ় হয় অনুভাবনের ফলও তত দুর্বল হয়ে ওঠে।

ছ। বিশ্লেষণ (Analysis)

আধুনিক মনশ্চিকিৎসার একটি বড় আবিষ্কার হল যে মানসিক ব্যাধির প্রকৃত কারণগুলি ব্যক্তির শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত থাকে। এই পরোক্ষ কারণগুলি প্রত্যক্ষ কারণগুলির চেয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু এই অতীত অভিজ্ঞতাগুলি ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়ার জন্য সেগুলিকে সহজে মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায় না।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করতে গিয়ে ফ্রয়েড একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন। সেটি হল এই যে মানসিক ব্যাধি মাত্রেই অবদমন (Repression) থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই জন্য ব্যক্তির অচেতনে অবদমিত তথ্য ও চিন্তাগুলি আবিষ্কার করার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। অচেতনের স্বরূপ নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটির নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্লেষণ (Analysis)।

শিশু জন্মাবার পর থেকে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে তার মধ্যে

কতকগুলি অভিজ্ঞতা থাকে তিক্ত ও বেদনাদায়ক। সে যত বড় হতে থাকে ততই এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলির স্মৃতি তার মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই স্মৃতিগুলি তার সচেতন মনে না থাকলেও সেগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। সেগুলি তার মনের অচেতন স্তরে তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে বিরাজ করে এবং কালক্রমে নানা রকমের মানসিক ব্যাধি, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিকৃত মনোভাবের জন্ম দেয়। এই অবাঞ্ছিত ও অবদমিত অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি অচেতন স্তর থেকে সচেতন মনে তুলে আনা যায় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই মানসিক ব্যাধিগুলি দূর হয়ে যায়।

(i) সম্মোহন-বিশ্লেষণ (Hypno-Analysis)

অচেতনে নিহিত পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করাকেই বিশ্লেষণ নাম দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ব্রুয়ার নামে একজন ফরাসী চিকিৎসক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে মানসিক ব্যাধির গুপ্ত কারণগুলি আবিষ্কার করার পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তিনি রোগীকে সম্মোহিত করে তার প্রতিরোধের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিয়ে তার ঐ বিস্মৃত অভিজ্ঞতাগুলির বিশ্লেষণ করতেন। এইজন্য তাঁর ঐ পদ্ধতিকে আমরা সম্মোহন-বিশ্লেষণ (Hypno-Analysis) নাম দিতে পারি। এই পদ্ধতিতে রোগীকে প্রথমে সম্মোহিত করা হয়। তার পর নানা প্রশ্নের সাহায্যে তার অচেতন মনে অবদমিত চিন্তা ও ইচ্ছাগুলিকে উদ্ঘাটিত করা হয়। ব্রুয়ার এইভাবে বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে অনেক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির রোগ সারাতে সক্ষম হন।

ফ্রয়েড এই সময় ব্রুয়ারের সহকর্মী রূপে যোগ দেন। তিনিও প্রথম দিকে সম্মোহনের সাহায্যে মানসিক ব্যাধির কারণ বিশ্লেষণ করতেন। পরে এই পদ্ধতির অনেক অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দেখে ফ্রয়েড একটি সম্পূর্ণ নতুন ও নিজস্ব পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিটি বর্তমানে মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) নামে প্রসিদ্ধ। ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণে ব্যক্তির অচেতনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার জন্য মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) নামে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছেন।

সম্মোহনের সাহায্যে মানসিক ব্যাধির কারণ বিশ্লেষণ এখনও একটি কার্যকরী পদ্ধতিরূপে গণ্য হয়ে থাকে। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে রোগী কোন কারণে তার স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে সে সব ক্ষেত্রে সম্মোহনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ যথেষ্ট সুফল দিয়ে থাকে। তাছাড়া রূপান্তরিত হিস্টিরিয়ার (Conversion Hysteria) জন্য যেখানে রোগী মাথাব্যথা, শারীরিক যন্ত্রণা, বদহজম, পক্ষাঘাত প্রভৃতিতে ভোগে সে

সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ করলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু যখন বাধ্যতাধর্মী চিন্তায় অবসেসন (Obsession) বা কোন রোগী ভোগে তখন এই পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকরী হয় না। কেননা অবসেসনের রোগীকে সহজে সম্মোহিত করা যায় না। বিশেষ করে এই সব ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে সম্মোহনের চেয়ে মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিতে আরো সহজে এবং আরো ভালো ভাবে মনের বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। যুদ্ধের সময় যে সব সৈন্যদের মধ্যে মনোব্যাধি দেখা দেয় তাদের সম্মোহন-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজেই চিকিৎসা করা সম্ভব হয়। কেননা সৈন্যদের মধ্যে আনুগত্য, নির্ভরশীলতার মনোভাব এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার অভ্যাস আগে থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। যদি সকল রোগীকেই ভালভাবে সম্মোহিত করা সম্ভব হত তাহলে সম্মোহন-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিকে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার সহজতম পদ্ধতি বলে গন্য করা যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুব অল্পসংখ্যক রোগীকেই পূর্ণভাবে এবং সন্তোষজনকভাবে সম্মোহিত করা সম্ভব হয়। এইজন্য সম্মোহন-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সর্বজনীন ব্যবহার সম্ভব নয়।

(ii) মাদকদ্রব্যের সাহায্যে বিশ্লেষণ (Narco-Analysis)

সকল রোগীর ক্ষেত্রে সম্মোহন করা সম্ভব হয় না বলে আজ কাল অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের জন্য মাদকদ্রব্যের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। নেমবুটাল (Nembutal), এভিপান (Evipan), পেনটোথাল (Pentothal) প্রভৃতি বিশেষ ধরনের মাদকদ্রব্য আছে যা রোগীর উপর প্রয়োগ করলে সম্মোহনের মতই ফল পাওয়া যায়। এই সব মাদকদ্রব্যের প্রয়োগে রোগীর মধ্যে থেকে আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ চলে যায় এবং সে তখন নিজের অনুভূতিকে বিনা বাধায় প্রকাশ করতে পারে। এই ভাবে রোগীর অচেতনে অবদমিত স্মৃতিগুলিকে জাগিয়ে তোলা যায় এবং মনশ্চিকিৎসক সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে রোগের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। এই পদ্ধতিটিকে মাদকদ্রব্যের সাহায্যে বিশ্লেষণ (Narco-analysis) বলা হয়। এই পদ্ধতির সব চেয়ে বড় উপকারিতা হল যে এটি থেকে অতিদ্রুত কাজ পাওয়া যায় এবং অতি সহজে ও এক রকম সর্বজনীনভাবে এটির প্রয়োগ করা চলে। বড় বড় হাসপাতাল ও চিকিৎসাগার যেখানে অতি অল্পসময়ে চিকিৎসা শেষ করার দরকার পড়ে সে সব স্থানে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করলে খুব শীঘ্র ও সুনিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। কিন্তু মাদকদ্রব্যের সাহায্যে চিকিৎসার একটা বড় দোষ হল যে এই পদ্ধতিটির বারবার প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, কেননা মাদকদ্রব্যের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফল রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তাছাড়া

মাদকদ্রব্য প্রয়োগের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি হল যে মাদকদ্রব্য রোগীর অবরুদ্ধ প্রক্ষোভকে মুক্ত করতে পারলেও তার অধিসত্তাকে (Super-ego) স্পর্শ করতে পারে না। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিসত্তার অপরিবর্তনীয় মনোভাবই সফল বিশ্লেষণের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্য শেষ পর্যন্ত মুক্ত অনুষঙ্গের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তবে যেখানে রোগীর আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ খুব শক্তিশালী হয় সেখানে প্রথমে মাদকদ্রব্যের প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং একবার প্রতিরোধ ভেঙে গেলে মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হয়। এক কথায় ক্ষেত্র বিশেষে মুক্ত অনুষঙ্গের পূর্ব সোপানরূপে মাদকদ্রব্যের প্রয়োগকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(iii) স্বপ্ন বিশ্লেষণ (Dream Analysis)

আর একটি বহুল প্রচলিত বিশ্লেষণ পদ্ধতি হল স্বপ্ন বিশ্লেষণ। ফ্রয়েডই প্রথম আমাদের স্বপ্নের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দেন এবং প্রমাণ করে দেন যে আমাদের অবদমিত চিন্তা ও কামনাগুলিই স্বপ্নরূপে দেখা দেয়। তাঁর মতে স্বপ্নগুলির অন্তর্নিহিত রহস্য যদি ভেদ করতে পারা যায় তাহলে ব্যক্তির মনের অজ্ঞাত চিন্তা ও কামনাগুলির স্বরূপ জানা যাবে। এক কথায় স্বপ্ন হল অচেতনে পৌছবার রাজকীয় পথ। ফ্রয়েডের এই আবিষ্কারে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় স্বপ্নবিশ্লেষণের ব্যাপক ব্যবহার সুরু হয় এবং অধিকাংশ মনশ্চিকিৎসকই ব্যক্তির রোগের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে থাকেন।

স্বপ্ন অচেতনের অভিব্যক্তি হলেও স্বপ্ন-বিশ্লেষণকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় নির্ভরযোগ্য উপকরণরূপে কাজে লাগাবার পথে কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা আছে। প্রথমত, স্বপ্ন মনের চিন্তা ও সমস্যাকে সোজাসুজি প্রকাশ করে না, প্রকাশ করে নানা রকমের প্রতীকের মধ্যে দিয়ে। এই প্রতীকগুলির যথাযথ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা। কিন্তু দেখা গেছে যে বিভিন্ন মনশ্চিকিৎসক একই প্রতীকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যেমন স্বপ্নে দেখা জল কারও মতে বোঝায় পবিত্রতা, কারও মতে জন্ম, কারও মতে অচেতন, কারও মতে জলে ডোবার আশঙ্কা ইত্যাদি। স্বপ্নের বাহ্যিক রূপ ও অন্তর্নিহিত অর্থ—দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। এই অন্তর্নিহিত অর্থটি ঠিক মত ধরতে পারাই হচ্ছে স্বপ্নের বিশ্লেষণ। বিভিন্ন মনশ্চিকিৎসক একই স্বপ্নের বিভিন্ন অন্তর্নিহিত অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

এই সব কারণে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় স্বপ্ন বিশ্লেষণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। তবে স্বপ্ন বিশ্লেষণের যে উপকারিতা নেই তা নয়। স্বপ্ন বিশ্লেষণ

করে মনশ্চিকিৎসকগণ যে রোগীর মানসিক সংগঠন ও অবদমিত ইচ্ছা সম্বন্ধে অতি মূল্যবান তথ্য লাভ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সম্পূর্ণ প্রতীকধর্মী হওয়ায় স্বপ্ন ব্যক্তির সমস্যার নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারে না, তবু স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যার একটা আয়তন ও পরিসীমা যে ভালভাবেই উদ্ঘাটিত হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বপ্নবিশ্লেষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পদ্ধতিরূপে খুবই নেওয়া যেতে পারে।

(iv) মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association)

মানসিক অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করার যে পদ্ধতিটি ফ্রয়েড প্রবর্তন করেছেন সেই পদ্ধতিটি মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) নামে পরিচিত। সাধারণত আমাদের মনের মধ্যে চিন্তা, ধারণা, স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। সেই জন্যই যখন একটি কথা বা বিষয় মনে করলে আর একটি কথা বা বিষয় আমাদের মনে আসে তখন এই বিভিন্ন ধারণা বা বিষয়গুলির মধ্যবর্তী সংযোগকে অনুষঙ্গ বলা হয়। কোন্ বিষয়টির সঙ্গে কোন্ বিষয়টির বা কোন্ ধারণার সঙ্গে কোন্ ধারণাটি সংযুক্ত থাকবে তা নির্ভর করে মনের প্রকৃতি, সংগঠন ও পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর। কিন্তু সাধারণত আমরা যখন বাস্তব জীবনে কথা বলি তখন আমরা আমাদের মনের এই ধারণা বা চিন্তাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বাইরে প্রকাশ করি না। কতকগুলি চিন্তা বা ইচ্ছার অনুষঙ্গ এমন প্রকৃতির হয়ে থাকে যে সেগুলিকে আমরা বাইরে প্রকাশ করতে চাই না। অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যের অনুষঙ্গগুলি যেভাবে আছে সেভাবে প্রকাশ না করে আমরা আমাদের প্রয়োজনমত সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করে প্রকাশ করি। সে ক্ষেত্রে আমাদের অনুষঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত অনুষঙ্গ (controlled association) বলা চলে। এর বিপরীত প্রক্রিয়াটি হল মুক্ত অনুষঙ্গ। এতে মনের উপর কোনরূপ বাধা না চাপিয়ে মনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা ও ইচ্ছাগুলির অনুষঙ্গ যেভাবে আছে সেভাবেই প্রকাশ করা হয়।

ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে মনের উপর কোনরূপ বাধা আরোপ না করে সব কিছু খোলাখুলিভাবে বলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমে ব্যক্তিকে শান্ত পরিবেশে একটি আরামপ্রদ কক্ষে ইজিচেয়ার বা শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাকে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে তার মনের কথা চিকিৎসকের কাছে বলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা গেছে যে, এই সময় ব্যক্তি যে সব কথা

বলে সেগুলি থেকে তার মনের অন্তর্নিহিত বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্তি এখন তার মনের অবদমিত স্তরের বহু ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করতে পারে। সম্মোহনের সাহায্যে যে ধরনের ফল পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক ভাল ফল মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট কার্যকরী হলেও সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শক্ত বলে এটি চিকিৎসাগারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিটিকে মনশ্চিকিৎসকেরা নিজেদের প্রয়োজনমত পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে ব্যবহার করে থাকেন।

ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিটির সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে জড়িত আছে। সেটির নাম দেওয়া হয়েছে অভিসঞ্চালন (Transference)। অভিসঞ্চালনের অর্থ হল মানসিক বিশ্লেষণ করার সময় রোগীর অবরুদ্ধ প্রক্ষোভ তার প্রকৃত পাত্র থেকে চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়ে যায়। যেমন, হয়ত কারও প্রতি ভালবাসা প্রত্যাখ্যাত হয়ে রোগীর মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে। এখন মুক্ত অনুষঙ্গে এই রোগের কারণ বিশ্লেষণ করার সময় এই প্রত্যাখ্যাত ও অচেতনে অবদমিত ভালবাসা চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়ে যায়। ফ্রয়েড এই অভি-সঞ্চালন প্রক্রিয়াটিকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি পরম সহায়ক প্রক্রিয়া বলে গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে অভিসঞ্চালন ছাড়া মানসিক ব্যাধির সুষ্ঠু চিকিৎসা সম্ভব নয়। অনেক আধুনিক মনশ্চিকিৎসক ফ্রয়েডের এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় অভিসঞ্চালন অপরিহার্য ত নয়ই, বরং অনেক সময় ক্ষতিকর। তাঁদের প্রবর্তিত বিশ্লেষণ পদ্ধতিটির তাঁরা নাম দিয়েছেন প্রত্যক্ষ লঘুকরণমূলক বিশ্লেষণ (Direct Reductive Analysis) পদ্ধতি।

(v) প্রত্যক্ষ লঘুকরণমূলক বিশ্লেষণ (Direct Reductive Analysis)

এই পদ্ধতিটি ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিটির উপরই সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী চিকিৎসকেরা রোগীর রোগের লক্ষণগুলিকে ভিত্তি করে চিকিৎসা সুরু করেন, বিশেষ করে যে লক্ষণগুলি সম্বন্ধে রোগী অভিযোগ করে সেগুলির উপরই তাঁরা বেশী মনোযোগ দেন। প্রথমে চিকিৎসক মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে সেই লক্ষণগুলি কোথা থেকে সৃষ্টি হল তা নির্ণয় করেন, অর্থাৎ যে সব অবদমিত প্রক্ষোভমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব ঐ সব মানসিক ব্যাধির লক্ষণগুলির কারণ, সেগুলি খুঁজে বার করেন এবং যাতে ঐ অন্তর্নিহিত কারণগুলি দূরীভূত হয়

তার ব্যবস্থা করেন। অবরুদ্ধ শৈশবকালীন প্রক্ষোভকে মুক্তি দেওয়া এই পদ্ধতিরও প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চিকিৎসক এখানে বিশেষ যত্ন নেন যেন এই নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ চিকিৎসকের প্রতি সঞ্চালিত না হয়ে যায়। তাঁরা চেষ্টা করেন যাতে রোগীর এই নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত না হয়ে যে ব্যক্তির প্রতি প্রথম থেকেই উদ্দিষ্ট ছিল তার প্রতি যেন সঞ্চালিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে রোগীর নিরুদ্ধ প্রক্ষোভের মুক্তিদান বা লঘুকরণের মাধ্যমে তার মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

অভিসঞ্চালন প্রক্রিয়াকে এই মনশ্চিকিৎসকেরা বর্জন করলেও অভিসঞ্চালন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই এবং এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে চিকিৎসা পদ্ধতি যে অনেক বেশী সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জ। খেলাভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy)

খুব ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসার যে সব পদ্ধতির বর্ণনা করা হয় সেগুলি সব সময় প্রয়োগ করা যায় না। অথচ তাদের মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ের জন্য তাদের অচেতনে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ জানা খুবই দরকার। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নানা রকম প্রশ্ন করে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ধরনের সংগৃহীত তথ্যাবলী কখনও পর্যাপ্ত হয় না। তার প্রধান কারণ হল ছোট শিশুরা তাদের মনের কথা ভালভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিও খুব ছোট শিশুদের উপর প্রয়োগ করাই যায় না। একটু বড় ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক মনশ্চিকিৎসক সাফল্যের সঙ্গে মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন বলে শোনা গেছে। কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটিকে যে সব সময় কার্যকরী করে তোলা যায় না তা বলা বাহুল্য। ছোট শিশুদের বেলাতে মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের কথা ত ওঠেই না। এইজন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকেরা ছোট শিশুদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ জানবার জন্যে খেলাভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy) পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। শিশুর কাছে খেলা নিজেকে বাইরে অভিব্যক্ত করার মাধ্যম স্বরূপ। শিশুর মনোভাব, ইচ্ছা, রুচি, কামনা, ঘৃণা, ভালবাসা সবই খেলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। এমন কি তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তার মনের মধ্যে আঁকা তার কাল্পনিক ছবিটি তার খেলার মধ্য

দিয়ে ফুটে ওঠে। অতএব শিশুর খেলাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে তার মনের বিশেষ করে তার অবদমিত ইচ্ছার একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া যেতে পারে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই খেলাভিত্তিক চিকিৎসার পরিকল্পনাটি গঠিত হয়েছে।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় শিশুর সামনে নানারকম খেলার সামগ্রী ধরে দেওয়া হয় এবং সেগুলি নিয়ে তাকে যেমন খুশী খেলতে বলা হয়। শিশু যখন খেলা শুরু করে তখন চিকিৎসক তাকে নানাদিক দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। সে কোন্ ধরনের খেলার সামগ্রী পছন্দ করে, তার খেলা ধ্বংসমূলক কি সৃজনমূলক ইত্যাদি তথ্যগুলির সাহায্যে চিকিৎসক শিশুর মনোভাব ও তার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেগুলির উপরেই ভিত্তি করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মনশ্চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করেন যে শিশুর খেলা একটি উদ্দেশ্যসম্পন্ন প্রক্রিয়া এবং যদি তাকে সব রকম খেলার বস্তু দেওয়া হয় তাহলে সে তার অন্তর্নিহিত মনোভাব এবং মানসিক দ্বন্দ্বটিকে খেলার বস্তু' নির্বাচন ও খেলার স্বরূপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে ফেলে। এইজন্য এই পদ্ধতিতে শিশু যাতে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে, সে জন্য তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলার উপকরণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের পুতুল, বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি খেলনা, ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম, নানারকম জিনিষ তৈরী করার উপযোগী মাটি, বালি, কার্ডবোর্ড, কাঁচি, কাগজ প্রভৃতি বস্তু এ পদ্ধতিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঝ। বৃত্তিমূলক চিকিৎসা (Occupational Therapy)

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করার সময় অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে কোন বিশেষ কাজ বা বৃত্তিতে নিযুক্ত করা হয়। ঐ বিশেষ কাজ বা বৃত্তিটি সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে মানসিক ব্যাধিটির নিরাময় হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমত, এই ধরনের বৃত্তি বা কাজের মধ্যে থাকার সময় রোগী তার নিজের দুশ্চিন্তা ভুলে যায় এবং তার ফলে তার সমস্যার মাত্রা ও গুরুত্ব অনেক কমে আসে। দ্বিতীয়ত, বৃত্তিমূলক চিকিৎসায় রোগীর নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ সুষ্ঠু ও শোভন উপায়ে মুক্তি লাভের সুযোগ পায়। অধিকাংশ মানসিক ব্যাধির মূলেই আছে কোন না কোন প্রত্যাখ্যাত ও অবদমিত প্রক্ষোভ। কাজের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির সেই অবদমিত প্রক্ষোভ তৃপ্তিলাভ করার সুযোগ পায়। তৃতীয়ত, যদি কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাহলে

রোগীর মধ্যে তার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং তার ফলে খুব শীঘ্রই তার রোগ সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু বৃত্তিমূলক চিকিৎসার একটি বড় দোষ হল যে এই পদ্ধতিতে প্রকৃত সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তার ফলে যেগুলি প্রকৃতপক্ষে মনোব্যাধি (Neurosis) সে সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকরী হয় না। তবে যে সব ব্যাধিগুলি মনোবিকার (Psychosis) পর্যায়ের সে সব ক্ষেত্রে রোগীকে প্রায়ই তার মানসিক জগৎ থেকে বস্তুমূলক জগতে টেনে আনার দরকার পড়ে এবং সে সব ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক চিকিৎসার সাহায্যে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

ঞ। যৌথ মনশ্চিকিৎসা (Group Therapy)

দৈহিক চিকিৎসার মত মানসিক চিকিৎসাতেও সাধারণত রোগীকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এই একক চিকিৎসা প্রথায় ব্যক্তির রোগের বিভিন্ন লক্ষণগুলির পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সেই লক্ষণগুলি অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আধুনিককালে মানসিক রোগ চিকিৎসার এমন কতকগুলি পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে যাতে একাধিক রোগীকে একসঙ্গে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকজন মনশ্চিকিৎসক মানসিক রোগের চিকিৎসায় যৌথ পদ্ধতির প্রথম অনুসরণ করেন। কিন্তু গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে এবং তার পরবর্তী কালেই যৌথ মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতিগুলি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

যৌথ মনশ্চিকিৎসার মৌলিক নীতি

মানুষ যদিও এককভাবে জন্মায় এবং বেঁচে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন একটি সত্তা নয়। সঙ্গকামিতা, গোষ্ঠিবিশ্বস্ততা, যৌথজীবনের প্রতি আসক্তি ইত্যাদি মনোভাবগুলিকে একপ্রকার মানবমনের সহজাত বৈশিষ্ট্য বললেই চলে। ব্যক্তি যে গোষ্ঠী বা দলে বাস করে ব্যক্তির উপর তার প্রভাব এক প্রকার অপরিমেয়। যদি কোন কারণে ব্যক্তি গোষ্ঠীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে না চলতে পারে তাহলে তার মানসিক শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়ে ওঠে। আর যদি ব্যক্তিকে তার সমাজ বা গোষ্ঠী সমাদরে গ্রহণ করে নেয় তাহলে তার মানসিক শক্তি আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুণগুলি বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। এইজন্যই ব্যক্তিমাত্রেই চায় যে যে দলে সে বাস করে সেই দলের রীতি নীতি মান প্রত্যাশা

লক্ষ্য প্রভৃতির সঙ্গে যাতে সে সুষ্ঠুভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। 'পৃথিবীতে কোন মানুষই একটি দ্বীপ নয়'—মানুষের সামাজিক দিকটি সম্পর্কে এই প্রসিদ্ধ উক্তিটিকে ভিত্তি করেই যৌথ মনশ্চিকিৎসার মৌলিক পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাঁরা এই যৌথ মনশ্চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসরণ করে থাকেন তাঁরা দলের সদস্যদের মধ্যে এমন একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার মনোভাব সৃষ্টি করেন যার ফলে প্রত্যেকের সম্মানবোধ, আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানসিক রোগের একটা বড় লক্ষণ হল যে রোগী প্রথমেই তার আত্মবিশ্বাস ও মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং নিজেকে দুর্বল ও অক্ষম মনে করে। যৌথ মনশ্চিকিৎসায় প্রথমেই ব্যক্তির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস ও মানসিক কর্মদক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয় বলে রোগের নিরাময় হতে দেরী হয় না।

গত ২০।২৫ বৎসরের গবেষণায় যৌথ মনশ্চিকিৎসার উন্নতি হয়েছে। সকল রকম মানসিক ব্যাধি, প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয়, মনোব্যাধি (neurosis), মনোবিকার (psychosis), সঙ্গতিবিধানের অসুবিধা, এমন কি গুরুতর অপরাধপরায়ণতার ক্ষেত্রেও যৌথ চিকিৎসা পদ্ধতিকে বিশেষ ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে সুরু করে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যৌথ পদ্ধতির বিশেষ কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

যৌথ মনশ্চিকিৎসার শ্রেণীবিভাগ

যৌথ মনশ্চিকিৎসায় রোগীকে একটি বিশেষ ভাবে সংগঠিত দলের মধ্যে রেখে চিকিৎসা করা হয়। কখনও রোগীর পরিচিত, কখনও অপরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে এই দলটি তৈরী করা হয়। দলের আকার এবং সদস্য নির্বাচনের দিক দিয়ে যৌথ মনশ্চিকিৎসা পদ্ধতির কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। যেমন পরিচালনা-মূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা (Directive Group Therapy), মুক্ত প্রতিক্রিয়া বা সাক্ষাৎকার মূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা (Free Interaction or Interview Group Therapy), পরিবারমূলক মনশ্চিকিৎসা (Family Psychotherapy), মনশ্চিকিৎসামূলক দল (Therapeutic Community)।

ক। পরিচালনামূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা (Directive Group Therapy)

যৌথ মনশ্চিকিৎসায় যখন চিকিৎসক দলের কার্যাবলী পূর্ণভাবে সংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন, তখন সেই চিকিৎসা পদ্ধতিকে পরিচালনামূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা বলা হয়। দটিলর গঠন থেকে সুরু করে দলের কর্মসূচী, কার্যের প্রকৃতি নির্ধারণ

প্রভৃতি সবই চিকিৎসকের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে।

অতিরিক্ত মদ্যাসক্তির জন্য মানসিক অবনতি ঘটেছে এমন ব্যক্তিদের যৌথ পদ্ধতির মাধ্যমে খুব সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা করা যায়। যারা অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তাদের দিয়ে একটি বিশেষ ধরনের দল গঠন করা হয় এবং এই সব ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মদ্যপানের কুফল এবং মদ্যপান থেকে বিরতির সুফল সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকেন। তার ফলে তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং প্রক্ষোভমূলক সমর্থন গড়ে ওঠে এবং অনেকেরই মদ্যাসক্তি শেষ পর্যন্ত চলে যায়। দেখা গেছে যে এই ধরনের মদ্যপায়ীদের দলগত চিকিৎসায় প্রায় দলের তিনচতুর্থাংশ ব্যক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়ে থাকে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আর এক ধরনের মনশ্চিকিৎসার দলের প্রচলন আছে। এগুলিকে মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক সংস্থা (Therapeutic Social Club) বলা হয়। এই সংস্থাগুলি হল প্রকৃতপক্ষে যে সব মানসিক রোগী সবে রোগমুক্ত হয়ে উঠেছে তাদের বাস্তবজীবনের জন্য প্রস্তুত করার উপযোগী এক ধরনের মেলামেশার জায়গা বা ক্লাব বিশেষ। এই সংস্থাগুলি অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের পরিকল্পনা অনুযায়ী ও তাঁদের সতর্ক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং রোগীরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নতুন করে শিক্ষালাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়।

সাইকোড্রামা (Psychodrama)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জে এল মরেনো নামে একজন মনশ্চিকিৎসক সাইকোড্রামা নামে এক অভিনব যৌথ চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

এই পদ্ধতিতে মানসিক ব্যাধির রোগী নিজের রচিত নাটকের মধ্যে দিয়ে তার সমস্যাকে প্রকাশ করে থাকে। মরেনো একবার তাঁর রোগীদের নাটক রচনা করার বা স্বতঃপ্রসূতভাবে অভিনয় করার সুযোগ দেন। তাতে তিনি দেখলেন যে নাটক রচনা বা অভিনয় করার সময় রোগী 'তার নিজের ব্যক্তিগত জগৎ, তার নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা, তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব, কামনা এবং স্বপ্ন' সবই বাইরে প্রতিফলিত করে ফেলে। এই থেকে মরেনো সাইকোড্রামা পদ্ধতিটি আবিষ্কার করলেন। সাইকোড্রামা হল ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার একটি সহজ এবং শিল্পীসুলভ অভিব্যক্তি যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি যে সামাজিক সংগঠনটিতে বাস করে সে

সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। এই সব নাটকে রোগীর সঙ্গে মনশ্চিকিৎসক নিজে এবং অন্যান্য রোগীরাও অভিনেতা এবং দর্শক উভয় শ্রেণীর ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। মনশ্চিকিৎসক প্রায়ই নাটকের পরিচালকরূপে কাজ করে থাকেন। রোগীর যে সমস্যাটি নাটকের বিষয়বস্তু রূপে অভিনীত হবে মনশ্চিকিৎসকই সেই সমস্যাটি ঠিক করে দেন এবং কারা কারা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবে, কি ধরনের সংলাপ থাকবে ইত্যাদি ব্যাপারগুলিও মনশ্চিকিৎসক নির্ধারিত করেন। প্রত্যেক নাট্যাংশের পর মনশ্চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে একটি আলোচনা সভা বসে যাতে সকল দর্শকই অংশ গ্রহণ করে থাকে। সাইকোড্রামায় ব্যবহৃত দুটি বিশেষ ধরনের কৌশলের উল্লেখ করা যায়। অনেক সময় রোগীর সামনেই আর একজন ব্যক্তি রোগীর ভূমিকা অভিনয় করে। আবার কখনও রোগী নিজে তার পরিবারের একজন বিশেষ সদস্যের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং অপর একজন ব্যক্তি রোগীর ভূমিকা অভিনয় করে।

খ। মুক্ত প্রতিক্রিয়া বা সাক্ষাৎকারমূলক যৌথ মনশ্চিকিৎসা
(Free Interaction or Interview Group Therapy)

এই যৌথ মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতিটিই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের মৌলিক তত্ত্ব থেকেই প্রসূত যদিও পরে এটি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত ও বিভিন্নরূপী হয়ে দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের ফাউক্স্ (Foulkes), আমেরিকার স্ল্যাভসন (Slavson), সিলডারড (Schilderd), ওয়েণ্ডার (Wender) প্রভৃতি মনশ্চিকিৎসকগণ মুক্ত প্রতিক্রিয়ামূলক যৌথ চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন।

এই পদ্ধতিতে কয়েকজন রোগীকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয় এবং আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, মনোভাব-প্রকাশ প্রভৃতি সব দিক দিয়েই প্রত্যেককেই পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। বরং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যাতে তারা তাদের অনুভূতি, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, স্বপ্ন, শৈশব চিন্তা, অবাস্তব কল্পনা প্রভৃতি বিনা দ্বিধায় অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারে। এইভাবে তাদের অবরুদ্ধ প্রক্ষোভ ক্রমশ মুক্তি পাবার ফলে তাদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব অনেক পরিমাণে কমে যায় এবং তারা আত্মনির্ভরতা ও বিশ্বাস ফিরে পায়। বলাবাহুল্য ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) এবং বিরেচনের (Catharsis) মৌলিক নীতির উপরই এই মুক্ত প্রতিক্রিয়া যৌথ পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত।

এই পদ্ধতিতে অনেক সময় রোগীদের মধ্যে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করা

হয়। সেই সভায় রোগীরা পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে। সভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব প্রধানত দলের সদস্যদের উপর ন্যস্ত থাকে। মনশ্চিকিৎসক সভায় উপস্থিত থাকেন বটে, তবে তাঁর প্রধান কাজই হয় দলের সদস্যদের কাজে সাহায্য করা।

গ। পরিবারভিত্তিক মনশ্চিকিৎসা (Family Therapy)

অনেক ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার নিজের পরিবারের মধ্যে রেখেই চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই মনোব্যাধি পরিবারের মধ্যে কোনরূপ অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং রোগীকে তার নিজের পরিবারের মধ্যে রেখে পর্যবেক্ষণ করলে মনোব্যাধির যথার্থ কারণ নির্ণয় সহজ হয়ে ওঠে। পরিবারের মধ্যে থাকার সময় রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে মনশ্চিকিৎসক যে প্রতিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতার জন্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে তা নির্ণয় করতে পারেন এবং পরিবারের সদস্যদের সে বিষয়ে সতর্ক করে দিতে পারেন এবং প্রয়োজনমত তাঁদের যথাযথ পরিচালনা করতেও পারেন।

পরিবার একটি স্বাভাবিক সমাজসংগঠন। এই ধরনের সংগঠনে রোগীর প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তবে সমগ্র পরিবারটিকে পর্যবেক্ষণ করা সব সময় সুবিধা হয়ে উঠতে পারে না। সেইজন্য এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হলেও প্রায়ই পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সর্বত্র সম্ভব হয় না।

ঘ। মনশ্চিকিৎসামূলক দল (Therapeutic Community)

মানসিক রোগের হাসপাতালে সময় সময় অনেকগুলি মানসিক ব্যাধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠন করা হয়। এই দলটিকে মনশ্চিকিৎসামূলক দল বলা হয়। এই ধরনের দলে কেবলমাত্র যে রোগীরাই থাকে তাই নয়। হাসপাতালের কর্মীরাও এই দলের অন্তর্ভুক্ত হন। এ সব দলের সদস্যদের মেলামেশার জন্য নানা ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং সেই সব সম্মেলনে রোগীরা অবাধে নিজেদের মতামত ও মনোভাব প্রকাশ করেন। হাসপাতালের চিকিৎসার কর্মসূচীতে এই দলগুলি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বহুক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নেয় এই ধরনের দলগত চিকিৎসার ফলে রোগীদের মধ্যে থেকে নির্জনতার মনোভাব চলে যায়, তাদের মধ্যে মনোবলের সৃষ্টি হয় এবং তারা অপরের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সঙ্গতিসম্পন্ন আচরণ সম্পাদন করতে শিখতে পারে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে যৌথ পদ্ধতি শিশু মনশ্চিকিৎসার রাজ্যে এক সম্পূর্ণ নতুন

চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছে। এ পদ্ধতিটির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এটিকে এত বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ আকারে পরিকল্পনা করা যায় যে সকল রকম মানসিক ব্যাধি এবং আচরণগত বৈষম্যের ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। এই কারণে আধুনিক মনশ্চিকিৎসকদের শিক্ষণসূচীতে যৌথ চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ মনোব্যাধির ক্ষেত্রে যৌথ পদ্ধতি ব্যক্তিগত পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে কেবলমাত্র যৌথ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কোন মানসিক ব্যাধির সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভবপর হতে পারে না। ব্যক্তিগত চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পূরকরূপেই যৌথ পদ্ধতিকে সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩। সামাজিক চিকিৎসা (Sociotherapy)

সামাজিক চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য হল রোগীর পরিবেশের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনা যার ফলে সে জীবনভিত্তিক পরিস্থিতিতে বাস করতে পারে এবং পরিবেশের সঙ্গে সাফল্যজনক ভাবে সঙ্গতিবিধান করার সুযোগ পায়। শিশুদের ক্ষেত্রে সামাজিক চিকিৎসা সাধারণত তাদের পিতামাতার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হয়। আবার বয়স্কদের ক্ষেত্রে শিশুপালন, বিবাহিত জীবন এবং অন্যান্য জীবন সংক্রান্ত সমস্যায় তাদের সাহায্য করতে হয়। সাধারণত সামাজিক চিকিৎসায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক কর্মীরা এবং এই উদ্দেশ্যে বহুবিধ কল্যাণকর এবং সমাজসেবক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যও অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মনোবিকারের ক্ষেত্রে সামাজিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা আজ নানা কারণে স্বীকৃত হয়েছে। কোনও পরিবারে মনোবিকার দেখা দিলে কতকগুলি গুরুতর প্রকৃতির সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রথমত, যদি কোনও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি মনোবিকারের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়, তাহলে সেই পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর যেমন প্রক্ষোভমূলক চাপ পড়ে তেমনই তাদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্বও এসে পড়ে। এক্ষেত্রে এই সব ব্যক্তিদের মানসিক সাম্য বজায় রাখতে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত চিকিৎসার প্রয়োজন হতে এবং মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক কর্মীরা এদিক দিয়ে মূল্যবান সাহায্য করতে পারে।

দ্বিতীয়, মনোবিকারের রোগী যখন হাসপাতালে থেকে আরোগ্য লাভ করে তখন তাকে সমাজে পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল

কাজ। এখানে মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক কর্মীরা পরিবারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কিভাবে রোগীর সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে এ সম্বন্ধে মূল্যবান নির্দেশ দিতে পারে। তাছাড়া আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীকে প্রয়োজন হলে চাকরী খুঁজে দেবার ভারও মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক কর্মীরা নিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, মনোবিকারের রোগী আরোগ্যলাভ করে সমাজে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনশ্চিকিৎসকদের কাজ শেষ হয় না। তাদের সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে নিরাময়োত্তর পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। এ কাজও করে এই মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক কর্মীরা। তারা রোগীর বাড়ীতে নিয়মিতভাবে যায়, রোগী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং সমাজে যাতে সে ভালভাবে সঙ্গতিবিধান করে থাকতে পারে তার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করে। যখন কোনও কারণে রোগীরা সঙ্গতিবিধানের চাপ সহ্য করতে পারে না বা মনে অসঙ্গতির পুনরাবির্ভাব অনুভব করে তখন তারা পরম ভরসা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এই এই মনশ্চিকিৎসামূলক সামাজিক কর্মীদের দিকেই সাগ্রহে তাকায়।

প্রশ্ন ঃ

1. Describe the various methods and techniques followed in treating Mental Diseases.

2. Discuss the role of analysis in the treatment of mental diseases. Describe the nature and utility of the various types of analysis employed now-a-days.

3. What are Suggestion and Persuasion? Describe their application and usefulness in the treatment of mental diseases.

4. What is Group Therapy? What are its procedures and utilities?

5. Discuss the merits of Group Therapy. How many forms of Group Therapy are in vogue?

6. Write notes on :—Psychosurgery, Chemotherapy and Sociotherapy.

7. Write notes on : —Case History Method, Dream Analysis, Narco-Analysis, Hypno-Analysis, Free Association, Play Therapy, Group Therapy, Occupational Therapy. Psychodrama Directive Group Therapy, Free-Interaction Group Therapy and Family Therapy.

ষোল

অপরাধপরায়ণতার স্বরূপ (Nature of Delinquency)

শিশুর বয়স অনুযায়ী তার অসংগতিমূলক আচরণগুলিকে আমরা দু' শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। সমস্যামূলক আচরণ (Problem Behaviour) এবং অপরাধপরায়ণতা (Delinquency)। এই উভয় প্রকার আচরণই যদিও মানসিক অসংগতি থেকে জন্মলাভ করে থাকে তবুও গুরুত্ব এবং জটিলতার দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। এক থেকে সাত আট বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা যায় সেগুলিকে সমস্যামূলক আচরণ বলা হয়। এই পর্যায়ে সাধারণত খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যা বদমেজাজ, নেতিমনোভাব ইত্যাদি আচরণগুলি অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু সাত আট বছর বয়সের পরেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব দুষ্কৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলির গুরুত্ব শৈশবকালীন সমস্যামূলক আচরণের চেয়ে অনেক বেশী। এই সময় শিশু সাধারণত বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে থাকে এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়। তাদের ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বিকাশ বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই সময়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। সেইজন্য শিশু যদি এই সময়ে কোন অবাঞ্ছিত বা অসামাজিক আচরণ করে তা তার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সংগঠনকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া তার সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়াটিও তার অপরাধপরায়ণতার জন্য গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সব কারণে মানসিক চিকিৎসাশাস্ত্রে অপরাধপরায়ণতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

অপরাধপরায়ণতার সংজ্ঞা

অপরাধপরায়ণতা বলতে কিশোর বয়সে অবাঞ্ছিত ও সমাজবিরোধী আচরণের সম্পাদনকে বোঝায়। প্রত্যেক সমাজেরই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত আচরণের মান থাকে। যে সব আচরণের এই সামাজিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে সেই আচরণগুলিকে আমরা সমাজের দিক দিয়ে কাম্য ও বাঞ্ছিত আচরণ বলে বর্ণনা করি। আর যে সব আচরণ এই সমাজ অনুমোদিত মান থেকে ভ্রষ্ট হয় সে সব আচরণকেই আমরা অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণ নাম দিয়ে থাকি।

এই সামাজিক মাপকাঠির বিচারেই কোন্ আচরণটি অপরাধ, কোন্‌টি অপরাধ নয়, তা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অতএব, কিশোর বয়সে নির্দিষ্ট সামাজিক মানের বিরোধী আচরণ সম্পন্ন করাকে অপরাধপরায়ণতা (Delinquency) বলে বর্ণনা করা হয়। আর বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজবিরোধী আচরণকে আইনগত অপরাধ (crime) বলে অভিহিত করা হয় এবং তা থেকে ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করার জন্য আইনের সাহায্যে শাস্তিদানের ব্যবস্থা সব সমাজেই প্রচলিত থাকে। ছোট শিশুর ক্ষেত্রে অপরাধমূলক আচরণকে সে দৃষ্টিতে দেখা হয় না। অপরাধী শিশুকে আইনগত শাস্তি দেওয়ার চেয়ে মনোবৈজ্ঞানিক পন্থায় তার ব্যাধির চিকিৎসা করাই উচিত বলে মনে করা হয়। এইজন্য শিশু বা যুব অপরাধীদের সাধারণবয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে একত্রে বিচার না করে তাদের স্বতন্ত্রভাবে বিচার করার ব্যবস্থা সব আধুনিক দেশেই প্রচলিত আছে।

অপরাধপরায়ণতার শ্রেণীবিভাগ

(Classification of Delinquency)

প্রকৃতির দিক দিয়ে অপরাধপরায়ণতাকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যেমন—

১। নির্দোষ অপরাধপরায়ণতা (Benign Delinquency)

২। শরীরতত্ত্বমূলক অপরাধপরায়ণতা (Physiological Delinquency)

৩। মনোবিজ্ঞানমূলক অপরাধপরায়ণতা (Psychological Delinquency)

৪। মনোব্যাধিমূলক অপরাধপরায়ণতা (Neurotic Delinquency)

১। নির্দোষ অপরাধপরায়ণতা (Benign Delinquency)

স্কুলের ক্লাশ থেকে পালানো একটি সমাজবিরোধী কাজ এবং এক ধরনের অপরাধপরায়ণতা। কিন্তু যদি স্কুলের পাঠদান শিশুর কাছে নীরস ও কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে এবং তখন যদি সে তার পরিশ্রান্ত মনকে তৃপ্তি দেবার জন্য ক্লাশ ছেড়ে বাইরের খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তার আচরণটি যদিও সমাজে অনুমোদিত নয় তবু সেটিকে সত্যকারের অপরাধ বলা যায় না। এই ধরনের আচরণগুলিকে আমরা নির্দোষ অপরাধপরায়ণতা নাম দিতে পারি। সামাজিক মানের বিচারে এগুলি অপরাধ হলেও এগুলির পেছনে কোন জটিল মানসিক অসংগতি নেই এবং যে পারিবেশিক ঘটনার জন্য শিশু এই ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠান করে সেই ঘটনাটি দূর করতে পারলেই শিশুর অপরাধপরায়ণতাও চলে যায়। অর্থাৎ উপরের

উদাহরণে যদি ক্লাশে শিক্ষকের পাঠদানকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাহলে ঐ শিশুটি আর কথনও ক্লাশ থেকে পালাবে না।

২। শরীরতত্ত্বমূলক অপরাধপরায়ণতা (Physiological Delinquency)

মাঝে মাঝে ব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি অপরাধপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেগুলি নিছক তার কোনও শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্য থেকেই জন্মলাভ করে থাকে। ঐ শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্যটি সব সময়েই যে কার্যকরী হয় তা নয় এবং ব্যক্তি যখনই ঐ ধরনের শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের অধীন হয় তখনই সে অপরাধ করে থাকে। আর যখন ঐ বৈশিষ্ট্যটি বর্তমান থাকে না তখন ঐ ধরনের কোন অপরাধ-পরায়ণতাও তার মধ্যে দেখা যায় না। এই ধরনের অপরাধপরায়ণতা সাময়িক, অস্থায়ী ও অধিকাংশক্ষেত্রেই খুব গুরুতর হয় না।

৩। মনোবৈজ্ঞানিক অপরাধপরায়ণতা (Psychological Delinquency)

সাধারণত শিশুর যে সমস্ত আচরণকে আমরা অপরাধপরায়ণতা বলে অভিহিত করে থাকি সেগুলি এই পর্যায়েই পড়ে থাকে। বিশেষ কোন পারিবেশিক কারণবশত শিশুর মনের মধ্যে এমন একটা মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যার ফলে সে সমাজ-অনুমোদিত পন্থায় সেই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে সমর্থ হয় না। অথচ মানসিক দ্বন্দ্বটি কালক্রমে একটি প্রবল প্রক্ষোভধর্মী প্রেষণার রূপ ধারণ করে এবং শিশুকে অসামাজিক পন্থায় সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে বাধ্য করে। এই থেকেই তার মধ্যে দেখা দেয় অপরাধমূলক আচরণ। সাত আট বছর বয়স থেকে সুরু করে উনিশ কুড়ি বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব সমাজবিরোধী আচরণ দেখা দেয় সেগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৪। মনোব্যাধিমূলক অপরাধপরায়ণতা (Neurotic Delinquency)

গভীর কোন মানসিক ব্যাধির জন্য যে সমাজবিরোধী আচরণ ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় তাকে আমরা মনোব্যাধিমূলক অপরাধপরায়ণতা নাম দিতে পারি। বিভিন্ন কারণের জন্য শিশু বা পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে। এই মানসিক ব্যাধি থেকেই তার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণের সৃষ্টি হয়। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, আত্মহত্যা করা, আগুন লাগান প্রভৃতি নানা-

রকমের অস্বাভাবিক ও সমাজবিরোধী আচরণ কোন বিশেষ মনোব্যাধি থেকে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোব্যাধিমূলক আচরণকে সাধারণ অপরাধপরায়ণতার শ্রেণীভুক্ত করতে চান না। তার কারণ হল সাধারণ অপরাধ-পরায়ণতাকে মনোব্যাধির মত একটি মানসিক ব্যাধি বলে বর্ণনা করা যায় না। ব্যাপক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে সাধারণ অপরাধপরায়ণতা সামাজিক ও পারিবেশিক কারণ থেকেই প্রধানত উদ্ভূত হয়ে থাকে। কিন্তু মনোব্যাধিমূলক অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টিতে সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তিগুলির যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও মূলত অচেতনস্থিত মানসিক ব্যাধিমূলক প্রবণতা থেকেই এগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই জন্যই মনোব্যাধিমূলক আচরণকে সাধারণ অপরাধপরায়ণতা থেকে পৃথক করে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

অপরাধপরায়ণতার বিভিন্ন রূপ

অতএব দেখা যাচ্ছে যে অপরাধপরায়ণতা বলতে আমরা শিশু এবং প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে প্রধানত পারিবেশিক কারণ থেকে উদ্ভূত যে সব সমাজবিরোধী আচরণ দেখা দেয় সেইগুলিকেই বুঝব। সাধারণত শিশুদের মধ্যে এই ধরনের অপরাধপরায়ণতার যে সব দৃষ্টান্ত দেখা যায় তার কয়েকটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। আক্রমণধর্মিতা (Aggressiveness)

একটু পরিণত হলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে অপরাধপরায়ণতাটি প্রায়ই দেখা দেয় সেটি হল আক্রমণধর্মিতা। এই ধরনের ছেলেমেয়েরা তাদের দুর্বল সহপাঠী, ভাইবোন প্রভৃতির প্রতি অনর্থক অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে। এদের ইংরাজীতে বুলি (Bully) বলা হয়।

নিরাপত্তার অভাববোধই আক্রমণধর্মিতার প্রধান কারণ। যে শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার বোধ নেই এবং যে নিজেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত মনে করে, সে তার লুপ্ত আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পাবার জন্য অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে। আত্মস্বীকৃতি ও অপরের কাছ থেকে পরিচিতি পাবার জন্যও অনেক শিশু আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। বাড়ীতে বা স্কুলে স্বাভাবিক পন্থায় পরিচিতি বা স্বীকৃতি পেতে ব্যর্থ হয়ে শিশু এই অস্বাভাবিক পন্থাটি গ্রহণ করে। এর দ্বারা সে বাড়ীর বয়স্কদের বা স্কুলে শিক্ষক-সহপাঠীদের কাছ থেকে আত্মস্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে।

আক্রমণধর্মিতা দূর করতে হলে প্রথমে শিশুর বিশেষ চাহিদাটি কি তা নির্ণয় করতে হবে। যে চাহিদার অপূর্ণতার ফলে সে আক্রমণধর্মী হয়ে উঠেছে সেটিকে অনুসন্ধান করে তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি নিরাপত্তাহীনতার বোধই তার অপরাধপরায়ণতার কারণ হয়ে থাকে তবে যাতে তার মন থেকে এই বোধটি চলে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত শিশু যদি তাঁর মা-বাবা বা শিক্ষকদের কাছে অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত হয় তবেই তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়ে থাকে। একমাত্র আন্তরিক ভালবাসাই শিশুর মধ্যে প্রকৃত নিরাপত্তার বোধ আনতে পারে। অতএব তার রুক্ষ মনকে ভালবাসা দিয়ে সিঞ্চিত করে তুলতে হবে এবং যাতে সে তার আত্মবিশ্বাসকে পুনর্গঠন করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।

আর যদি আত্মস্বীকৃতি ও সমর্থনই তার অতৃপ্ত চাহিদা হয়ে থাকে তবে সে যাতে ঈপ্সিত পথে তা পেতে পারে তার আয়োজন করতে হবে। খেলাধূলা, অভিনয়, বিতর্ক, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে যাতে সে তার অহংসত্তাকে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার পর্যাপ্ত সুযোগ ও সাহায্য তাকে দিতে হবে।

অনেকে শিশুর এই আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হল যে আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার ফল মন্দই হয়। তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা হল ঐ আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে অন্য কোন মঙ্গলকর পথে পরিচালিত করা। এই পদ্ধতিকে উন্নীতকরণ (Sublimation) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ছেলে মারামারি করতে অভ্যস্ত তাকে প্রতিযোগিতা-মূলক খেলাধূলায় নিযুক্ত করলে ধীরে ধীরে তার ঐ আচরণটি সংযত ও গঠনমূলক হয়ে ওঠে।

আক্রমণধর্মিতার যদি যথাসময়ে চিকিৎসা করা না হয় তাহলে এই মনোভাবটি তার ব্যক্তিসত্তার একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিণত বয়সে সে একজন অসামাজিক ও অপ্রিয় ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়।

২। ক্লাশপালানো (Truancy)

ক্লাশপালানো একটি অতি সাধারণ অপরাধপরায়ণতার উদাহরণ। ক্লাশ-পালানোর অভ্যাস নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে। ক্লাশপালানোর সব চেয়ে বড় কারণ হল শিশুর শিক্ষামূলক চাহিদা ক্লাশে পূর্ণ না হওয়া। যে কোনও কারণে হোক শিশু ক্লাশের পড়া থেকে তার প্রয়োজন মেটাবার মত উপযুক্ত

সামগ্রী পায় না। তার ফলে ক্লাশে থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা সে আর অনুভব করে না এবং সুযোগ সুবিধা পেলেই ক্লাশ থেকে পালায়।

ক্লাশে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন না মিটতে পারার তিন রকম কারণ আছে। প্রথম, শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে যার ফলে হয় শিক্ষার্থীর কাছে ক্লাশের পড়া দুরূহ ঠেকে, কিংবা তা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এই জন্য আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষণ-পদ্ধতিকে নানা শিক্ষণসহায়ক সাজসরঞ্জামের সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানকালে শিক্ষণপদ্ধতিটিকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করার প্রচেষ্টাও সর্বত্র দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়, শিক্ষার্থী যদি উন্নতধী-সম্পন্ন শিশু হয় তবে তার কাছে ক্লাশের পড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে জানা বা অতি সাধারণ বলে মনে হয়। ফলে তার মধ্যে সে নতুন কিছু খুঁজে পায় না এবং সেই জন্য ক্লাশে থাকার কোনও অনুপ্রেরণা সে বোধ করে না। এই কারণেই উন্নত মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্লাশপালানোর দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ছেলেমেয়েদের ক্লাশপালানো বন্ধ করতে হলে ক্লাশে তাদের ক্ষমতার উপযোগী বিশেষ উন্নত ধরনের কাজ দিতে হবে, যাতে তারা তাদের মানসিক শক্তির সত্যকারের প্রয়োগ করতে পারে।

তৃতীয়, যে সব ছেলেমেয়ে বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় তারা সাধারণ ক্লাশের পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করে না। সনাতন গতানুগতিক প্রকৃতির স্কুলগুলিতে সাহিত্যধর্মী এবং ভাষাভিত্তিক বিষয় পাঠের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে, ফলে বিশেষধর্মী শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শক্তির প্রকৃত ব্যবহার এ সব ক্লাশে হয় না এবং তারা বাধ্য হয়ে ক্লাশে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু এই সব ছেলে-মেয়ের প্রকৃতিদত্ত শক্তির উপযোগী কাজ যদি তাদের দেওয়া হয় তাহলে তারা সেই সব কাজ করতে তৃপ্তি ও সাফল্য দুই-ই পাবে। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে এইজন্য নানা বিভিন্ন প্রকৃতির কাজের ব্যবস্থা আছে যাতে সকল রকম বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরাই তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যন্ত্রঘটিত শক্তিসম্পন্ন একটি ছেলেকে যদি সাধারণ স্কুলের ক্লাশে পড়তে দেওয়া হয় তাহলে সে মোটেই সেখানে আগ্রহ বোধ করবে না এবং সুযোগ পেলেই ক্লাশ থেকে পালাবে, কিন্তু যদি তাকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে তার উৎসাহ ও আগ্রহের কোন অভাব নেই।

ক্লাশপালানোর এ ছাড়াও আরও অনেকগুলি কারণ আছে। অনেক সময়

অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার জন্য ছেলেমেয়েরা ক্লাশ পালায়। বিশেষ করে বাড়ীতে সম্পন্ন করার জন্য যে সব কাজ দেওয়া হয় সেগুলির প্রতি কখনও কখনও ছেলেমেয়েরা সত্যকারের আগ্রহ বোধ করে না এবং অনেক ক্ষেত্রে এই সব কাজ করে উঠতে না পারলে শিক্ষকের বকুনি ও সহপাঠীদের উপহাসের ভয়ে তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে। নিজেদের নিম্নজাতি সম্পর্কে সচেতনতা, নিকৃষ্ট পোষাক ইত্যাদি কারণেও অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ক্লাশে অনুপস্থিত থাকে।

ক্লাশপালানোর কারণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এ ব্যাধির চিকিৎসা বিশেষ শক্ত নয়। এমন কি ক্লাশপালানোকে আমরা গুরুতর অপরাধপরায়ণতা বলে না ধরতেও পারি। ইতিপূর্বে আমরা ক্লাশপালানোকে নির্দোষ অপরাধপরায়ণতার দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করেছি। তবে ক্লাশপালানো যে অন্যান্য গুরুতর অপরাধপরায়ণতার পূর্বসোপান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ যুব অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ক্লাশপালানো তাদের স্কুলজীবনে একটা অপরিহার্য লক্ষণ ছিল। ক্লাশপালানোর কারণটি প্রথম অবস্থায় দূর করা শক্ত নয়। যদি সেটিকে অবহেলা করা হয় বা প্রাথমিক অবস্থায় দূর করা না হয় তবে ঐ কারণটি জটিল আকার ধারণ করে এবং সময়ে ব্যক্তির মনে গভীর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। সেইজন্য মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত যে শিশুর মনে ক্লাশপালানোর প্রবণতা দেখলেই অবিলম্বে তার কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং যতটা সম্ভব তা দূর করতে হবে।

ক্লাশপালানোর প্রবণতা দূর করতে হলে প্রথমেই ক্লাশের পাঠটিকে শিশুর কাছে মনোরম করে তুলতে হবে। স্কুলের আবহাওয়াটিকে চিত্তাকর্ষক করতে হবে, শিক্ষণ পদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানসম্মত করতে হবে এবং অর্থহীন নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার প্রয়োগে শিশুর মন যাতে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা ক্লাশের পাঠে পরিতৃপ্ত হল তার উপর নির্ভর করছে শিশুর কাছে ক্লাশ কতটা আকর্ষণীয় হবে। অতএব শিশুর নিজস্ব চাহিদার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ক্লাশের পাঠের মধ্যে দিয়ে তার মানসিক শক্তির যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

৩। মিথ্যাভাষণ (Lying)

মিথ্যা কথা বলাও একটা অতি সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ। নানা কারণে শিশু মিথ্যাভাষণের আশ্রয় নেয়। অনেক ক্ষেত্রে কারণটি নিতান্ত নির্দোষ প্রকৃতির

হয়ে থাকে এবং আচরণটি প্রকৃত অপরাধপরায়ণতার পর্যায়ে পড়ে না। যেমন উচ্ছাসের মাথায় কোন কিছু অতিরঞ্জিত করে বলা বা বানিয়ে বলা বা ভয়ে কোন কিছু গোপন করা বা মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি আচরণগুলির পেছনে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকার ফলে এগুলিকে সত্যকারের অপরাধপরায়ণতা বলা চলে না। তবে যদি এই আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হয় তাহলে ভবিষ্যতে তা থেকে গুরুতর অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তি তার কোন বিশেষ অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি মিথ্যাভাষণের মধ্যে দিয়ে খোঁজে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ কোন শিশু নিজের অসামর্থ্যবশত লেখাপড়া বা অন্যান্য প্রচলিত পথে তার কাম্য আত্মস্বীকৃতি বা সহপাঠীদের কাছ থেকে বাঞ্ছিত পরিচিতি পেল না। সে তখন বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদের কাছে তার মিথ্যা সাফল্য ও কল্পিত কীর্তির নানা কথা মহা আড়ম্বরের সঙ্গে বলা সুরু করল এবং এই ভাবে তাদের কাছ থেকে তার প্রাপ্য প্রশংসা ও আত্মপরিচিতি আদায় করল। এই ধরনের মিথ্যাভাষণ প্রকৃতপক্ষে তার অতৃপ্ত আত্মস্বীকৃতির চাহিদা থেকে জাত অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল এবং অপরাধপরায়ণতার একটি উদাহরণ। কিন্তু এই মিথ্যাভাষণে তার চাহিদা সত্যকারের তৃপ্ত হয় না এবং ফলে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব অমীমাংসিতই থেকে যায়। ঐ সাময়িক এবং আংশিক তৃপ্তির জন্য সে ক্রমশ মিথ্যার মাত্রা ও পরিমাণ বাড়িয়ে যায় এবং শেষে প্রচণ্ড অপরাধবোধ তার মনকে দুর্বল ও পঙ্গু করে তোলে। বাইরের জগতের কাছেও শীঘ্রই তার এই মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে যায় এবং সমাজে সে মিথ্যাবাদী, অনির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বহীন লোক বলে বিবেচিত 'হয়। শেষ পর্যন্ত সে তার বাঞ্ছিত প্রশংসা ও স্বীকৃতিও পায় না এবং তার অপরাধপরায়ণতার মাত্রা আরও বেড়ে চলে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার মিথ্যাভাষণের প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং যে চাহিদার অতৃপ্তির জন্য সে এই পরিপূরক আচরণ অবলম্বন করেছে তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের বিভিন্ন কর্মশক্তির বিকাশের পর্যাপ্ত আয়োজন যে সব শিক্ষাব্যবস্থায় থাকে সেখানে কোন না কোন উপায়ে সে তার আত্মস্বীকৃতি পায় এবং মিথ্যাভাষণরূপ অপরাধমূলক আচরণের আশ্রয় তাকে নিতে হয় না।

বহু ক্ষেত্রে শিশু মিথ্যাভাষণকে প্রতিরক্ষামূলক পন্থারূপে ব্যবহার করে থাকে। শিশু কোন অন্যায় কাজ করে ফেললে শাস্তি বা নিন্দা এড়াবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে। এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় যদি যথাযোগ্য

প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে পরে তা অভ্যাসে দাঁড়ায় এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে।

৪। অপহরণ (Stealing)

অপহরণ বা চুরি করাও মিথ্যাভাষণের মত একটি অপরাধপরায়ণতার উদাহরণ। কোন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার তৃপ্তির অভাব হলে শিশু অপরের জিনিষপত্র অপহরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে সেটিকে মেটাবার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু স্কুলে ভাল পড়া পারে না, ফলে শিক্ষক সহপাঠী কারোর কাছ থেকেই সে তার কাম্য পরিচিতি পায় না এবং তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। তখন সে তার এই চাহিদা মেটাবার জন্য সহপাঠীদের বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি ইত্যাদি চুরি করতে সুরু করে। তার এই কাজের জন্য বন্ধুবান্ধবদের চাঞ্চল্য ও দুশ্চিন্তা দেখে সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে থাকে এবং ফলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা কিছুটা তৃপ্তিলাভ করে। বলা বাহুল্য এই ধরনের তৃপ্তি তার সমস্যার সত্যকারের সমাধান আনতে পারে না এবং এর দ্বারা তার অন্তর্দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা হয় না।

এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক অপহরণ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করে এবং শিশু তার সামাজিক মান-মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস সবই হারাতে থাকে। এতে তার অপরাধপরায়ণতার মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং কালক্রমে স্থায়ীভাবে সে একটি অপরাধপরায়ণ শিশু হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত অপহরণপ্রবণতা গুরুতর অপরাধপরায়ণতার প্রাথমিক সোপান ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনোবিকারমূলক অপহরণ (Pathological Stealing)

আরও গভীর মনোবিকারমূলক চুরি করার প্রবণতা কারোও কারোও মধ্যে দেখা যায়। সেখানে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব গভীর অচেতনে নিহিত থাকে এবং কোন একটি বিশেষ মনোবিকারমূলক চিন্তা বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দিন দিন বাড়তে থাকে। সেই অচেতনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশেষ বিশেষ বস্তু চুরি করার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

এই সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে সব বস্তু চুরি করে সেগুলিকে সে কোন কিছুর প্রতীক বলে ধরে নেয় এবং ঐ বস্তুগুলির উপর অধিকারলাভের মধ্যে দিয়ে সে তার বিশেষ কোন চাহিদাকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য অপহরণের এই ক্ষেত্রগুলি অস্বাভাবিক মনোবিকারমূলক এবং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকদের সাহায্য ছাড়া এসব ক্ষেত্রের চিকিৎসা করা একেবারে সম্ভব নয়।

অপসঙ্গতিমূলক অপহরণের অভ্যাস প্রাথমিক অবস্থাতেই দূর করা একান্ত প্রয়োজন। শিশু যাতে নিজের অহংসত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, নিজের কাজের প্রাপ্য পরিচিতি আর সকলের কাছ থেকে পেতে পারে এবং তার অবলুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার দিক দিয়ে তাদের যোগ্যতা প্রমাণিত করতে পারে না, তারা যাতে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকর্ষ দেখাতে পারে তার পর্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে। এইজন্য স্কুলে খেলাধূলা, অঙ্কন, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদির আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের অতিপ্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলির তৃপ্তি হয়।

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই অপহরণ-প্রবণতা যে অপসঙ্গতি থেকে জন্মায় তা নয়। নিছক মানসিক অপরিণতির জন্যও অনেক ছেলেমেয়ে মিথ্যাকথা বলার মত এটাওটা চুরি করে থাকে। চুরি করাটা যে অনুচিত একথা বোঝার মত বয়সই তখন তাদের হয় না। তাছাড়া অনেক ছেলেমেয়ে নিছক কৌতূহল তৃপ্তির জন্য চুরি করে থাকে। আবার কেউ কেউ তাদের পিতামাতার অস্বচ্ছলতার জন্য ভাল বা মূল্যবান কিছু দেখে সাময়িক লোভের বশে চুরি করে। এই ক্ষেত্রগুলি যথার্থ অপরাধপরায়ণতার দৃষ্টান্ত নয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের সাহায্যে বুঝিয়ে এদের নিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু যদি এই ধরনের চুরিকেও যথাসময়ে নিবৃত্ত না করা হয় তাহলে তা অভ্যাসে দাঁড়াতে পারে এবং পরে গুরুতর অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি করতে পারে।

৫। নেতিমনোভাব (Negativism)

নেতিমনোভাব বলতে বোঝায় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকের আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা, অনুরোধ অগ্রাহ্য করা এবং প্রচলিত আইনকানুনের বিরুদ্ধে ইচ্ছামত কাজ করা। এই মনোভাবসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব সময়েই একটা প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা যায় এবং যা কিছু নির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তারই বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ায়। এই মনোভাবের ফলে কি বাড়ীতে, কি স্কুলে সর্বত্রই শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে স্কুলের সুসংগঠিত রূপ ও আবহাওয়াটি এই সব ছেলেমেয়ের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড বিরক্তির সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষেরা এই ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী বলে ধরে নেন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভুল মনোবিজ্ঞানের উপর স্থাপিত। নেতিমনোভাব শিশুমনের বৃদ্ধির স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময়

শিশুরা স্বাধীন হবার চেষ্টা করে এবং তার ফলে অপরের অনুশাসন বা কর্তৃত্বের তারা বিরুদ্ধতা করে। সে দেখাতে চায় যে সে নিজেই নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং নিজের স্বাধীন মত অনুযায়ী চলতে সমর্থ হয়েছে। অতএব সাধারণভাবে বলতে গেলে নেতিমনোভাব কোন প্রকার অপরাধপরায়ণতা নয় বরং স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ারই প্রকাশ।

কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে এই নেতিমনোভাব গুরুতর অপরাধের আকার ধারণ করতে পারে। শিশুর ক্রমবর্ধমান মনের এই স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে যদি অবদমিত করা হয় বা ভুল বুঝে তাকে শৃঙ্খলাভঙ্গ, বিদ্রোহ ইত্যাদির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় তাহলে শিশুর মনে ঐ গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং তাই থেকে গুরুতর অপরাধপরায়ণতা দেখা দিয়ে থাকে। শিশুর এই স্বাধীনতার চাহিদা অতৃপ্ত থাকলে তার মধ্যে নেতিমনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে এবং হয় সে আত্মকেন্দ্রিক ও বস্তুজগৎ থেকে আত্ম-প্রত্যাহৃত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়, নয় আক্রমণধর্মী, অপরাধপ্রবণ ও সমাজবিদ্বেষী ব্যক্তি রূপে গড়ে ওঠে।

৬। যৌন অপরাধ (Sex Offences)

শিশু যখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দেয় তখন তার মধ্যে ধীরে ধীরে যৌন সচেতনতা ও যৌন কৌতূহল সক্রিয় আচরণের রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন যৌন ঘটনা সম্পর্কে জানবার জন্য শিশুর মধ্যে তখন প্রবল কৌতূহল দেখা দেয় এবং তার সেই কৌতূহল সুস্থ উপায়ে তৃপ্ত না হলে সে অসুস্থ ও অসামাজিক পন্থা অবলম্বন করে। গুরুতর ক্ষেত্রে এই বিপথগামী যৌন-চাহিদা নানা রকম যৌন অপরাধের রূপ নেয়। বিকৃত যৌন আচরণ, যৌনধর্মী নিপীড়ন, যৌনমূলক আঘাত, অশ্লীল আচরণ, অশ্লীল সাহিত্য পাঠ ও ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি বহু রকমের অবাঞ্ছিত আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। এই ধরনের অস্বাভাবিক প্রবণতাগুলি যদি অবিলম্বে দূর করা না হয় তাহলে শীঘ্রই সেগুলি গুরুতর অপরাধপরায়ণতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

যৌন-অপরাধ গুরুতর অপসঙ্গতির ফল। যৌবনাগমে স্বাভাবিক যৌনচাহিদার তৃপ্তি না হলে তা যৌন অপরাধের রূপ নেয়। অতএব যৌন অপরাধ দূর করবার উপায় হল যাতে যৌন চাহিদা বিকৃত পথে না যায় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। দেখা গেছে যে প্রাপ্তযৌবনদের যৌন চাহিদার একটা বড় অঙ্গ হল যৌন কৌতূহল। অতএব যৌন ব্যাপারগুলি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের

কৌতূহল তৃপ্তি করা এবং যৌন রহস্যগুলি সম্পর্কে তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দেওয়াই হল যৌন চাহিদাকে অনেকখানি পরিতৃপ্ত করা এবং যৌন প্রচেষ্টাকে সুপথে পরিচালিত করার একটা প্রধান উপায়। তাছাড়া জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছেলে-মেয়েদের অবহিত করে কি উপায়ে সার্থক ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন যাপন করা যায় সে সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে যুক্তিধর্মী আলোচনা করলে এই ধরনের অপরাধ-পরায়ণতার দিকে তাদের মন আর যাবে না।

৭। অত্যধিক অবাধ্যতা এবং উদ্ধত মনোভাব (Defiance and Insolence)

অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় অবাধ্যতা এবং বয়স্কদের প্রতি উদ্ধত মনোভাব দেখা যায়। এই সব ছেলেমেয়ে কোনরকম আইন-কানুন বিধিনিষেধ মানতে রাজী হয় না বরং তাদের কোনও উপদেশ দিতে বা বোঝাতে গেলে তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করে। বলা বাহুল্য এগুলিও এক ধরনের অপরাধ-পরায়ণতার নিদর্শন এবং শৈশবকালের অনুপযোগী পরিবেশ থেকে এগুলি সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাধারণত ছেলেমেয়েদের মাত্রাতিরিক্ত আদর দিলে ছেলেমেয়েরা অবাধ্য ও উদ্ধত হয়ে ওঠে। তাছাড়া যদি পিতামাতার নিজেদের আচরণের মধ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট নৈতিক মান বা আদর্শবোধ না থাকে তাহলেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ্যতা এবং ঔদ্ধত্য দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে পিতামাতার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার অনুভূতি তাদের মধ্যে দেখা দেয় না এবং তারা তাঁদের কথা বা উপদেশের কোনও মর্যাদা দিতে শেখে না।

তাছাড়া শিশুর কোনও গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার যদি তৃপ্তি না হয় তাহলে তার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বাড়ী বা স্কুলের কোনও নিয়ম-কানুন বা ঘটনা শিশুর মনের মতন না হলে শিশুর মধ্যে স্বভাবতই বিরূপ মনোভাব জেগে ওঠে। এই সময় এই বিরূপ মনোভাব দূর করার জন্য পিতামাতা শিক্ষকেরা অনেক সময় কঠোর ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তার ফলে শিশুর মন থেকে ঐ বিরূপ মনোভাব লোপ পাওয়া দূরে থাকুক তার পরিবর্তে তার মন অতিরিক্ত মাত্রায় অবাধ্য ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে কখনই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। তার পরিবর্তে শিশুকে যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে তার মনকে জয় করে তাকে শৃঙ্খলা মানতে প্রণোদিত করা উচিত।

৮। দলবদ্ধ দুষ্কৃতি ও শৃঙ্খলাভঙ্গতা (Gang Indiscipline)

অনেক সময় দেখা যায় ছেলেমেয়েরা ছোটখাট দল বেঁধে নানারকম দুষ্কৃতি করে চলেছে। উৎপাত করা, জিনিষপত্র ভাঙা, বাগান নষ্ট করা, নিরীহ ব্যক্তি বা ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখান, জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট করা, অন্যান্য দলের সঙ্গে মারামারি করা এই রকম বহু অপরাধমূলক আচরণ এই ধরনের দলগুলি অনুষ্ঠান করে থাকে।

অবশ্য যৌবনপ্রাপ্তির কিছুটা আগে সব শিশুদের মধ্যে দল-বাঁধার কাল (gang period) বলে একটি বিশেষ সময় দেখা দেয়। এই সময় ছেলেমেয়ে সকলেই দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে, খেলতে ও কাজ করতে ভালবাসে। কোন পারিবেশিক কারণের জন্যে যে সব ছেলেমেয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে দাঁড়ায় তারা দল বেঁধে এই ধরনের দুষ্কৃতিমূলক কাজকর্ম করে বেড়ায়। যে সব শিশুর মধ্যে আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক মনোভাব জাগে তারাই বিশেষ করে দল-বাঁধার চেষ্টা করে। তার কারণ হল যে এই দলের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের ধ্বংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক প্রবণতাকে তৃপ্ত করতে পারে। বিশেষ করে যে সব ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য দুর্বল বা যারা মনে মনে ভীতু তারা নিজেরা একা একা আক্রমণমূলক বা ধ্বংসমূলক কাজ করতে ভয় পায়। কিন্তু দলের সাহায্যে তারা তাদের সেই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে। এই সব ছেলেমেয়ের চিকিৎসা করতে হলে তাদের মন থেকে ধ্বংসমূলক ও আক্রমণমূলক মনোভাব দূর করতে হবে। কি কারণে তাদের মনে এই ধরনের অসামাজিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে তা নির্ণয় করে সেই কারণটিকে দূর করতে পারলে তাদের অপরাধপরায়ণতাও দূর হয়ে যাবে।

অপসঙ্গতির অন্যান্য রূপ

এ ছাড়াও অপরাধপরায়ণতা আরও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। যেমন অতিরিক্ত স্বার্থপরতা, বদমেজাজী, একগুঁয়েমী, কলহপরায়ণতা ইত্যাদি। এগুলি সবই অপরাধপরায়ণতার লক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আগের মত কোন না কোন মৌলিক চাহিদার তৃপ্তির অভাব থেকেই এগুলি জন্মলাভ করেছে। এগুলিকে দূর করতে হলে যে সকল অতৃপ্ত কামনা থেকে এই সব অপরাধপরায়ণতা জন্মলাভ করেছে সেই কামনাগুলিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তাদের তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

হয় এখানে। সেইজন্য তার মানসিক সংগঠনে তার গৃহপরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন কারণে শিশুর গৃহপরিবেশ তার বৃদ্ধির অনুকূল না হয় তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। যে সব অবাঞ্ছিত গৃহ পরিবেশজনিত কারণ থেকে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হয় তার কয়েকটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত শিশু

শিশু যদি পিতামাতা কর্তৃক অবহেলিত হয় তবে সে অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য হল তার নিরাপত্তার চাহিদা। যে শিশু তার পরিবারের যত্ন, ভালবাসা ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয় সে শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে না এবং তখন সে তার এই অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাটি মেটাবার জন্যে নানা অপরাধমূলক আচরণ অনুষ্ঠান করে। সাধারণত যে সব পরিবারে অনেকগুলি ভাইবোন থাকে কিংবা যেখানে পিতামাতারা নানা বহির্জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকেন সেই সব পরিবারে পিতামাতারা শিশুর প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে পারেন না এবং সেই সব শিশুর মধ্যে থেকেই অপরাধপরায়ণ শিশু গড়ে ওঠে।

২। অতিরিক্ত আদর ও মনোযোগ

শিশুকে যদি অতিরিক্ত আদর ও মনোযোগ দেওয়া হয় তাহলেও শিশুর মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দেখা দেয়। যে সব শিশু পিতামাতার একমাত্র সন্তান হয় বা বাড়ীর বড় ছেলে বা মেয়ে হয় সেই সব শিশুরাও অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত আদর যত্নে মানুষ হয়। ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং কালক্রমে তাদের অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

৩। অতি-কঠোর বা নিপাড়নমূলক শৃঙ্খলা

অতিরিক্ত আদর যেমন শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর তেমনই অতি কঠোর শৃঙ্খলাও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধক। অতি কঠোর ও নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলায় শিশুর আত্মপ্রত্যয় ও নিরাপত্তাবোধ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এবং বিভিন্ন অপরাধ ও অসামাজিক আচরণ সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে সে তার নিষ্পিষ্ট অহংসত্তার মুক্তি অনুসন্ধান করে।

৪। বৈষম্যমূলক শৃঙ্খলা

কঠোর শৃঙ্খলার মতই বৈষম্যমূলক শৃঙ্খলাও শিশুদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি করে। দেখা যায় অনেক সময় পিতামাতা শিশুকে খুব বকাবকি, মারধোর

ও কঠোর নির্যাতন করলেন কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুতপ্ত হয়ে প্রচণ্ডভাবে আদর যত্ন করলেন বা নানাবিধ উপহার পুরস্কারে শিশুকে প্লাবিত করে তুললেন। এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে শিশুর মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তাকে কালক্রমে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

৫। শৃঙ্খলার অভাব

যে সব পরিবারে কোন শৃঙ্খলা নেই সেই সব পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। পরিবারের শৃঙ্খলাহীনতা শিশুদের স্বেচ্ছাচারী করে তোলে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি স্বাস্থ্যসম্পন্নরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। কোনরূপ নিয়মকানুন বা আদর্শ না থাকার ফলে তাদের আচরণ অসংযত হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে অপরাধপরায়ণতায় রূপান্তরিত হয়।

৬। বিপর্যস্ত বা বিধ্বস্ত গৃহ

বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত গৃহ অপরাধপরায়ণতার একটি বড় কারণ। যে সব পরিবারে পিতামাতারা সর্বদা কলহে লিপ্ত অথবা দুশ্চরিত্র মদ্যপ পিতা বা স্বার্থপর উদাসীন মাতার জন্য যে পরিবার শান্তিহীন, অথবা মৃত্যু, ডিভোর্স বা অন্য কোন কারণে শিশু অল্প বয়সে তার মাকে কিংবা বাবাকে হারিয়েছে সেই সব পরিবারের শিশুরা অতি সহজেই অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে। পরিবারের সংগঠন যদি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তবে শিশুর নিরাপত্তাবোধের চাহিদাটি একেবারে অতৃপ্ত থেকে যায় এবং অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে সে তার লুপ্ত আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পাবার চেষ্টা করে।

৭। পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

আধুনিক সমাজে পিতামাতার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে সব পিতামাতার অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত এবং তার ফলে সমাজে যাদের মর্যাদা নিম্নস্তরের তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতা বিশেষভাবে দেখা যায়। নিজেদের দারিদ্র্যের জন্য এই সব ছেলেমেয়ে সব সময় নিম্নতাবোধে কষ্ট পায় এবং নানারকম অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের সেই নিম্নতাবোধকে অবদমিত করার চেষ্টা করে। আবার যে সব পিতামাতা অত্যন্ত ধনী তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও শাসন ও শৃঙ্খলার অভাবে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু যে সব পিতামাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুব

বৃহত্তর পরিবেশের মন্দ প্রভাবেই পিতা মাতা শিক্ষকের যথেষ্ট মঙ্গলকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিশু অপরাধপরায়ণ হয়ে উঠেছে। এই জন্যই আধুনিক কালে শিশুকে বৃহত্তর পরিবেশের অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্যই আবাসিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করাই সর্বোত্তম পন্থা বলে শিক্ষাবিদেরা মনে করে থাকেন।

২। সামাজিক কারণ (Social Causes)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদ্দের মতে অপরাধপরায়ণতা নিছক একটি শিক্ষামূলক সমস্যাই নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে গুরুতর প্রকৃতির একটি সামাজিক সমস্যাও। সব সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল শিশু এবং বড়দের সামাজিক সংগঠন যে প্রকৃতির হবে শিশুদের সমাজও সেই প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। সমাজের গঠন প্রকৃতি, ব্যক্তির আচরণের অনুমোদিত মান, বিধিশৃঙ্খলার কাঠিন্য, নৈতিক আদর্শের স্বরূপ প্রভৃতির উপরই ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। বিশেষ করে সমাজের প্রচলিত নৈতিক মানের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের কতটা আনুগত্য আছে তার দ্বারাই প্রতিটি শিশুর মধ্যে ভালমন্দের ধারণা গড়ে উঠে থাকে। যে সমাজে নীতিগত আদর্শ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ নেই অতি স্বাভাবিক ভাবেই সে সমাজের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অপরাধপরায়ণতা দেখা যায়। এই জন্য অনিয়ন্ত্রিত বা বিপর্যস্ত সমাজব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অপরাধের এত প্রাচুর্য। যুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক অবনতি, কুশিক্ষা প্রভৃতির জন্য যখন কোন দেশের সমাজব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তখন সেই সমাজের কিশোর ও তরুণেরা অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের মানসিক সমতা রক্ষার চেষ্টা করে। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলতে পারে যে দেশের সামাজিক সংগঠন যে প্রকৃতির হবে শিশু-সমাজের মধ্যে অপরাধপরায়ণতাও সেই অনুপাতে কমবে বা বাড়বে।

সমাজ-সংগঠনের মৌলিক যোগসূত্রগুলি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সেই দুর্বলতা অসংযম ও আদর্শহীনতার রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে প্রতিফলিত হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই স্বাভাবিক সমাজ সংগঠনের মধ্যে অল্পবিস্তর বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। ভারতের মত সুদূর দেশেও ব্ল্যাক মার্কেট, অতিরিক্ত লাভ, অন্যায়ভাবে মাল মজুত রাখা, প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা অন্যায় এবং অনুচিত কাজ প্রচুর পরিমাণে সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে আমাদের সমাজ সংগঠনে যে শ্রেণীর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা

আমাদের দেশের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতার মাত্রা যে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অতএব অপরাধপরায়ণতাকে দূর করতে হলে কেবলমাত্র শিশু-সমাজকে উন্নত করলেই চলবে না সমগ্র সমাজের উন্নয়নের প্রয়োজন। সমাজের নৈতিক আদর্শ, পারস্পরিক আদানপ্রদান, কর্তব্যপরায়ণতা, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতির মান যখন উন্নত হবে তখন দেখা যাবে স্বাভাবিকভাবেই অপরাধপরায়ণতাও সমাজের অঙ্গ থেকে লুপ্ত হয়েছে।

৩। বংশধারামূলক কারণ (Hereditary Causes)

অনেক সময় কোন সহজাত কারণের জন্য ব্যক্তির মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দেখা দিতে পারে। শিশু তার জন্মের সময় পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য পায় সেগুলির মধ্যেই এই কারণগুলি নিহিত থাকে। সহজাত কারণ থেকে জাত অপরাধপরায়ণতাকে আমরা সাধারণত মনোবিকারমূলক অপরাধ-পরায়ণতা (Neurotic Delinquency) নাম দিয়ে থাকি। প্রকৃতপক্ষে অপরাধপরায়ণতা কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না। এটি একটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য। পরিবেশের সংস্পর্শে এসে শিশু অপরাধপরায়ণতা অর্জন করে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের মতে অপরাধ সম্পাদনের একটা প্রবণতা অনেক সময় শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে এবং পারিবেশিক কারণগুলি প্রত্যক্ষ কারণরূপে কাজ করলেও এই সহজাত অপরাধ সম্পাদনের প্রবণতা পরোক্ষ কারণরূপে শিশুর উপর অতি গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মনোবিকারমূলক চুরি করা বা মিথ্যা কথা বলা সাধারণত এই ধরনের সহজাত অপরাধপ্রবণতা থেকে জন্মলাভ করে থাকে। দেখা গেছে যে যারা কোন মনোবিকারমূলক কারণের জন্য চুরি করে বা মিথ্যা কথা বলে তাদের অচেতন মনের গভীর তলদেশে কোন এক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা নিরুদ্ধ কামনার জন্য তারা এই কাজ করে থাকে। তাদের সচেতন চাহিদা বা চিন্তার সঙ্গে এই অপরাধপরায়ণতার কোন সম্পর্ক থাকে না। এরা প্রকৃতপক্ষে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত এবং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া এদের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না।

আর একটি সহজাত বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তির মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দেখা দেয়। সেটি হল ক্ষীণবুদ্ধিতা (Feeblemindedness)। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের

ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপরায়ণতার একটা গভীর যোগাযোগ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে অপরাধপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধির সংখ্যা যথেষ্ট। যাদের বুদ্ধি স্বল্প তারা সাধারণ মানুষের মত ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে সমর্থ হয় না এবং তার ফলে সাধারণ ব্যক্তি যে সব কাজ করতে ভয় পায় বা ইতস্তত করে ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি সে সব কাজ করতে কোনরূপ ভয় পায় না। কোন্ কাজের কি ফল এবং সেই ফল ব্যক্তির পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক তা বোঝার ক্ষমতা ক্ষীণবুদ্ধিদের থাকে না। সেই জন্যই কোন অপরাধ করতে তাদের কোনরূপ দ্বিধা বা ভয় থাকে না। বস্তুত, দেবদূতেরা যেখানে পা দিতে ভয় পায় মূর্খরা সেখানে সবেগে এগিয়ে যায়।

৪। মনোবিজ্ঞানমূলক কারণ (Psychological Causes)

সাধারণভাবে বলতে গেলে অপরাধপরায়ণতা মাত্রেরই কারণ হল মনোবিজ্ঞানমূলক। যে কোন স্তরেরই অপরাধ হোক না কেন এবং যে কোন পারিবেশিক কারণই তার পেছনে থাক না কেন, অপরাধপরায়ণতা মাত্রেই বিশেষ একটি মানসিক বিকলতা থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বিকলতাকে আমরা অপসংগতি (maladjustment) নাম দিয়েছি। শিশুই হোক আর বয়স্ক ব্যক্তিই হোক প্রত্যেককেই সুষ্ঠু ও নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করতে হলে তার চতুষ্পার্শের পরিবেশের সংগে সন্তোষজনকভাবে সংগতিবিধান করে চলতে হয়। যতই সে পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ততই তার মধ্যে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদা দেখা দেয়। যতক্ষণ তার এই চাহিদাগুলি সে ঠিক মত মেটাতে পারে ততক্ষণ তার সঙ্গতিবিধানে কোনরূপ বাধা দেখা দেয় না। আর যদি কোন কারণে তার এই চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায় তাহলে তার সংগতিবিধান প্রক্রিয়াটিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুর কোন মৌলিক চাহিদা অতৃপ্ত থাকায় নানা অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণের মধ্য দিয়ে সে তার সেই চাহিদাটির তৃপ্তি দেবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় সে অপরাধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

শিশুর চাহিদার এই অতৃপ্তি নানা কারণে ঘটতে পারে। সেগুলি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু যে কোন কারণেই ঘটুক না কেন শিশুর মধ্যে একটা মানসিক বিকলতা দেখা দেয় এবং তারই প্রভাবে অপরাধমূলক কাজের প্রতি তার প্রবণতা জন্মায়। এই জন্যই আমরা শিশু ও কিশোরদের মধ্যে অপরাধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রগুলিকে মনোবৈজ্ঞানিক অপরাধপরায়ণতা নাম দিয়েছি।

আঠার

অপরাধপরায়ণতার প্রতিকার এবং গৃহ ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা

Treatment of Delinquency & Role of Home and School

ছেলেমেয়েদের সমস্যামূলক আচরণ এবং অপরাধপরায়ণতাকে আমরা একপ্রকার মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা বলে বর্ণনা করতে পারি। কি ধরনের কারণ থেকে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয় সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। উপযুক্ত উপায় অনুসরণ করলে যেমন শারীরিক ব্যাধি দূর করা যায় তেমনি যথাযথ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মানসিক ব্যাধিও দূর করা সম্ভব।

শিশুদের অপরাধপরায়ণতা দূর করার প্রধান মাধ্যম হল দুটি। একটি শিশুর নিজের গৃহ, অপরটি শিশুর বিদ্যালয়।

গৃহ ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা

শিশুদের মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্ত রাখতে হলে কতকগুলি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। তার জন্য প্রকৃষ্ট মাধ্যম হল দুটি। প্রথম, শিশুর বাড়ী ও পিতামাতা এবং দ্বিতীয়, শিশুর বিদ্যালয় ও শিক্ষকমণ্ডলী। বস্তুত শিশু যত রকম গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার অধিকাংশই শিশুর কাছে পৌছয় এই দুটি মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে। তার দিন-রাত্রির সবটা সময়ই কাটে হয় বাড়ীতে, নয় বিদ্যালয়ে। ভাল মন্দ, তৃপ্তিকর অতৃপ্তিকর সব রকম অভিজ্ঞতাই সে আহরণ করে বাড়ী এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। অতএব তার মানসিক স্বাস্থ্যও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই দুটি মাধ্যম এবং তাদের অধিবাসীদের উপর। বাড়ীতে সে কোন্ পরিবেশে মানুষ হয় এবং পিতামাতা আর দশ-জনের কাছ থেকে সে কি ধরনের আচরণ পায় এবং গৃহ-পরিবেশে সে কি ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ইত্যাদির উপরই বেশী করে নির্ভর করে তার মানসিক সুস্থতা। তেমনি বিদ্যালয় পরিবেশে তার সহপাঠী ও শিক্ষকেরা তার সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করে তার ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি কত সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হবার সুযোগ লাভ

করে এবং তার বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিবিধান করতে সে সমর্থ হয় তার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে তার মানসিক স্বাস্থ্যের প্রকৃতি।

শিশুর গৃহ এবং তার বিদ্যালয়ই তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে সব চেয়ে কার্যকরী মাধ্যম এবং পিতামাতা, শিক্ষক, সহপাঠী এদের দ্বারাই তার সমগ্র অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গৃহ এবং বিদ্যালয় পরিবেশে শিশুর মধ্যে যে সব অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা দেখা দেয় সেগুলি যদি যথাযথভাবে তৃপ্ত হয় তাহলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য কোন দিক দিয়েই ক্ষুণ্ণ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, গৃহ-পরিবেশে শিশুর সব চেয়ে বড় চাহিদা হল ভালবাসার চাহিদা এবং নিরাপত্তার চাহিদা। এই দুটি চাহিদার যদি ঠিকমত তৃপ্তি হয় তাহলে শিশুর মধ্যে কোনরূপ অপসঙ্গতি দেখা দেয় না এবং শিশু দেহে ও মনে স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে। শিশুর এই চাহিদাগুলি কতখানি তৃপ্ত হল তা আবার নির্ভর করে শিশুর পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিরা তার সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করে তার উপর।

বিদ্যালয় পরিবেশেও শিশুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চাহিদা দেখা দেয়। যদি যথা সময়ে এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শিশুর শিক্ষা যেমন সুসম্পন্ন হয় তেমনি তার মানসিক স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, প্রশংসার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি বিদ্যালয়জীবনে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় এবং সেগুলি যথাযথভাবে তৃপ্তি হলেই শিশুর ব্যক্তিসত্তা সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, সহপাঠী প্রভৃতিদের আচরণের উপর এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি নির্ভর করে। যদি কোন কারণে বিদ্যালয় পরিবেশ এমন হয় যে শিশুর চাহিদাগুলির তৃপ্তি হবার সুযোগ পায় না তাহলে শিশুর মধ্যে ব্যর্থতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সে অপরাধপরায়ণ হয়ে উঠে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর অপরাধপরায়ণতাকে প্রতিরোধ করতে হলে তার গৃহ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ যাতে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয় সেদিকে প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই দুটি পরিবেশ যদি শিশুর মানসিক বৃদ্ধির অনুকূল হয় তাহলে শিশুর মধ্যে কোন প্রক্ষোভজনিত অসঙ্গতি দেখা দেয় না এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার বৃদ্ধিও সব দিক দিয়ে সুষম ও সুষ্ঠু হয়ে ওঠে।

পিতামাতার ভূমিকা

বলা বাহুল্য যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে তার পিতামাতার উপর। যে সময়ে শিশুর মনের প্রাথমিক সংগঠনটি রূপ গ্রহণ

করে সেই সময়ে তার অধিকাংশ আদান-প্রদান ভাব-বিনিময় এবং অভিজ্ঞতা-আহরণ পিতামাতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। পিতামাতা শিশুর সঙ্গে যেমন আচরণ করবেন তার মানসিক সংগঠনটিও সেই ভাবেই গঠিত হবে। বস্তুত, শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় একমাত্র পিতামাতার মাধ্যমেই। বিশেষ করে শিশুর ভালবাসা এবং নিরাপত্তার চাহিদা তৃপ্ত করতে পারেন একমাত্র তার পিতামাতাই। একথা সর্বজনীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এই দুটি চাহিদার তৃপ্তির উপরই শিশুর মানসিক সংগঠনের সুস্থতা নির্ভর করে। এই জন্যেই যে সব ছেলেমেয়ে কোন কারণে শৈশবেই পিতামাতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেরই মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া পিতামাতার সঙ্গে দৈনন্দিন আচরণের মধ্য দিয়ে শিশু তার অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক অভিজ্ঞতাগুলি আহরণ করে থাকে। যে সব পিতামাতা শিশু সম্পর্কে উদাসীন বা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হন তাঁরা শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতাগুলির সম্বন্ধে কোনরূপ যত্ন বা সতর্কতা অবলম্বন করেন না। তার ফলে শিশু নানা অবাঞ্ছিত বৈষম্যমূলক এবং সময় সময় আঘাতাত্মক (Traumatic) অভিজ্ঞতাও আহরণ করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতাগুলি যে তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তাকে দুর্বল ও বিকৃত করে তোলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিশু যখন বেশ কিছুটা বড় হয় তখন সে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং পিতামাতার প্রভাবের গণ্ডী ত্যাগ করে শিক্ষক ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রভাবের অধীনস্থ হয়। এই সময় তার উপর পিতামাতার প্রভাব কিছুটা কমে আসলেও কখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তার ক্রমবিকাশমান মানসিক সংগঠনে পিতামাতার অবদান চিরকালই প্রচুর থাকে। বস্তুত যাকে আমরা নৈতিক মান বা বিচারবুদ্ধি বলে বর্ণনা করি সেটি বহুলাংশে পিতামাতার অনুশাসন থেকেই সৃষ্টি লাভ করে থাকে। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশুর উপর পিতামাতার শাসন ও শিক্ষা থেকেই শিশুর মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়। এই ঈডিপাস কমপ্লেক্স থেকেই পরে বিবেক বা নৈতিক সচেতনতা জন্ম লাভ করে থাকে। শিশুর প্রতি পিতামাতার আচরণের উপরই বহুল পরিমাণে নির্ভর করে শিশুর মানসিক সংগঠনটি।

শিক্ষকের ভূমিকা

গুরুত্বের দিক দিয়ে শিশুর জীবনে পিতামাতার পরেই শিক্ষকের স্থান। শিশুর

জীবনের মূল্যবান কয়েকটি বৎসরই কাটে তার বিদ্যালয়ে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরিবেশে। সেখানে তার বিচিত্র ও বহুমুখী অভিজ্ঞতাসম্ভার শিক্ষকই রচনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তার এই সময়কার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা তৃপ্ত করার দায়িত্বও শিক্ষকের। আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, আত্মসমর্থনের চাহিদা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি যদি যথাসময়ে তৃপ্ত না হয় তাহলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী জীবনে সে অপরাধপরায়ণও হয়ে উঠতে পারে এইজন্য শিশুর অপরাধপরায়ণতা দূর করতে হলে শিক্ষকদের বিশেষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে যেমন একদিক দিয়ে উন্নত করা প্রয়োজন তেমনি শিশুর সঙ্গে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আচরণও যাতে ত্রুটিহীন হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। তাঁদেরই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, উদারতা, বিচারবুদ্ধি এবং বিচক্ষণ আচরণের উপর শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

অপরাধপরায়ণতা দূর করার উপায়

শিশুর অপরাধপরায়ণতা দূর করতে হলে আমাদের দু' শ্রেণীর উপায় অবলম্বন করতে হবে। যথা, (১) প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং (২) নিরাময়মূলক (Curative)। প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি আবার দু'রকমের হতে পারে। ব্যক্তি-মূলক (Individual) এবং সমষ্টিমূলক (Collective)।

১। প্রতিরোধমূলক পন্থা (Preventive Measures)

প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে বোঝায় শিশুর মধ্যে যাতে প্রথম থেকেই অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যে সব কারণের জন্য শিশুর মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দেখা দেয় সেগুলিকে আগে থেকে দূর করাই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ক। ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা

যখন এই প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজ্য হয় তখন সেগুলিকে ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলা হয়। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রূপে নীচের পন্থাগুলির নাম করা চলে।

১। উন্নত গৃহ-পরিবেশ

শিশু যে পরিবেশে মানুষ হবে সে পরিবেশটিকে সব দিক দিয়েই স্বাস্থ্যময় করে তুলতে হবে। অভাব-অনটন, পারিবারিক সমস্যা, পিতামাতাদের কলহ-মতান্তর

যাতে শিশুকে স্পর্শ না করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুর চোখের সামনে চেঁচামেচি, বকাবকি, মারধোর ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। শিশুর বাসস্থান যাতে স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, সে যাতে পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম পায় এবং যাতে সে ব্যায়াম ও শরীর সঞ্চালনের যথেষ্ট সুযোগ পায় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শিশুর নিত্য সঙ্গী খেলাধূলার সাথী ও বন্ধু-বান্ধব যাতে সুনির্বাচিত হয় সেদিকে পিতামাতাকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

২। সুষম আচরণ ও সুপরিমিত শৃঙ্খলা

শিশুর প্রতি বয়স্কদের আচরণ যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। অতিরিক্ত আদর বা অতিরিক্ত অবহেলা দুইই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। শিশুর প্রতি পিতামাতা ও বয়স্কদের আচরণ হবে সুপরিমিত ও সুষম। মাত্রাহীন বৈষম্যমূলক শৃঙ্খলাও বিশেষ করে বর্জন করতে হবে। অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা যেমন বর্জনীয়, তেমনি বর্জনীয় হল শৃঙ্খলার চরম অভাব। বিশেষ করে এই মুহূর্তে অতিরিক্ত শাসন ও নিপীড়ন আবার পরমুহূর্তে সীমাহীন আদর—এই ধরনের খামখেয়ালী ব্যবহার একেবারে বর্জন করতে হবে। যে গৃহ পরিবেশে শৃঙ্খলা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অন্তর্জাত সেই পরিবেশেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ত্রুটিহীন হয়ে গড়ে ওঠে।

৩। মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি

শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি যাতে তৃপ্ত হয় তার ব্যবস্থা করাই অপরাধ-পরায়ণতাকে দূরে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। শিশুর অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রথমে আসে ভালবাসার চাহিদা, তারপর নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা ইত্যাদি। শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন বিশেষভাবে নির্ভর করছে এই চাহিদাগুলির তৃপ্তির উপর।

৪। উন্নত বিদ্যালয় পরিবেশ

প্রথমত, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শিশুর বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে যাতে সে সেখানে নিজেকে একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একজন বলে মনে করতে পারে। এই ধরনের পরিবেশে শিশুর বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি হয় এবং সহজে তার মধ্যে মানসিক অসংগতি দেখা দেয় না। দ্বিতীয়ত, শিশুর জন্য নির্ধারিত পাঠক্রমটি যেন তার উপযোগী হয় এবং তার প্রয়োজন তৃপ্ত করতে পারে। তৃতীয়ত, বিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষণ পদ্ধতি যেন উন্নত ও আধুনিক মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক হয়। চতুর্থত, বিদ্যালয়ের

কার্যসূচীতে যেন খেলা-ধূলা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, অভিনয়-গীত, বিতর্ক, ভ্রমণ প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী প্রচুর পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত হয়। সব শেষে বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং রেষারেষি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে।

খ। সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা

সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে বোঝায় সমগ্রভাবে কিশোরসমাজকে উন্নত করে তোলা। তার জন্য নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত।

১। জীবনধারণের মানের উন্নয়ন

যে সব সমাজের জীবনধারণের মান অনুন্নত সেই সব সমাজের কিশোরদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা সামাজিক আদান-প্রদানের মানও উন্নত হয় না। কিশোরদের মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দূর করতে হলে সমগ্র সামাজিক সংগঠনটিকে সুসংহত করতে হবে এবং সাধারণ জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে তুলতে হবে।

২। পরিবর্তনশীল আদর্শ ও মানের স্বীকৃতি

বিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় প্রাচীন ধারণা ও আদর্শের সঙ্গে আধুনিক ধারণা ও আদর্শের অবশ্যম্ভাবী সংঘাত দেখা দেয়। সময়ের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রাচীন গতানুগতিক মানের প্রতি অন্ধ আসক্তি পরিত্যাগ করতে হবে এবং আধুনিক ভাবধারা ও আদর্শকে মেনে নিতে হবে। প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানের সংঘাত দেখা দেওয়ার ফলে কিশোর মনে চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় এবং বহু ক্ষেত্রে তা অপরাধপরায়ণতায় পর্যবসিত হয়। অতএব ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন আদর্শ ও মানগুলিও যাতে স্বীকার করে নেওয়া হয় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে মানুষের জীবনে শঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতা যখন দেখা দেয় তখন প্রাপ্তবয়স্কদের মত কিশোর ও তরুণদের মনকেও সেই মনোভাব বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই সময় অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কিশোর মনের উপর এমন একটা মনোবৈজ্ঞানিক চাপের সৃষ্টি করে যার ফলে অপরাধপরায়ণতার দিকে তাদের মন চলে যায়।

বর্তমান পৃথিবীতে এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি সর্বাত্মক মানব-ধ্বংসের অস্ত্র সমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যেই একটা পরিব্যাপী আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছে। আদিম বন্য পরিবেশ ছেড়ে

মানুষ যেদিন সভ্য হয়েছিল সেদিন সে যে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার বোধ অনুভব করেছিল আজ এই সব মারণ অস্ত্রের আবিষ্কারে তা মানুষের মন থেকে ক্রমশ চলে যাচ্ছে। ফলে বর্তমান জগতের সভ্য সমাজমাত্রেই এক সর্বজনীন ভীতি, দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার কুক্ষিগত। এই সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা, ভীতি, ও দুশ্চিন্তার চাপ কিশোর মনের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার মধ্যে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি করে থাকে।

এইজন্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা যাতে কিশোর মনকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য তাদের সব সময় সংগঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে। সুপরিকল্পিত পন্থায় নানা উন্নত অভিজ্ঞতার সাহায্যে কিশোরদের শিক্ষা-সূচীকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই ধরনের চিন্তা বা মনোভাব তাদের মনকে স্পর্শ না করে।

৪। বয়স্কদের আদর্শ আচরণ

সমাজের বিধিনিষেধ, শৃঙ্খলা-নিয়মকানুন কঠোর হোক বা শিথিল হোক তাতে কিশোর মনে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সবচেয়ে বেশী যা কিশোর মনকে প্রভাবিত করে সেটি হল সেই নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের প্রতি সমাজের বয়স্কদের আনুগত্যের মাত্রা। যে সমাজে প্রাপ্তবয়স্কেরা সমাজের আদর্শ ও বিধিনিষেধের প্রতি বিশ্বস্ত সে সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম দেখা যায়।

২। নিরাময়মূলক পন্থা (Curative Measures)

অপরাধপরায়ণ শিশুর চিকিৎসার জন্য যত্ন, দূরদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা এই তিনই দরকার। একই রকম অপরাধপরায়ণতা নানা বিভিন্ন কারণ থেকে সৃষ্টি হতে পারে এবং যতক্ষণ না সেই প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ অপরাধপরায়ণতার কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি নিরাময়মূলক পন্থা অবলম্বন করা উচিত তার একটা বিবরণ দেওয়া হল।

১। পরিবেশের পরিবর্তন বা সংস্কারসাধন

যদি প্রতিকূল পরিবেশের জন্য অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সেই পরিবেশ থেকে শিশুকে অবিলম্বে অপসারিত করা কিংবা সেই পরিবেশের সংস্কারসাধন করা একান্ত প্রয়োজন। অনুপযোগী পরিবেশ থেকে শিশুকে সরিয়ে আনলে অনেক সময় অপরাধপরায়ণতার নিরাময় হয়ে থাকে।

২। গৃহ-পরিবেশের উন্নয়ন

যে সব ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ গৃহ পরিবেশের জন্য অপরাধপরায়ণতা দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রে গৃহপরিবেশের পরিবর্তন বা উন্নয়ন করলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। সে সব ক্ষেত্রে গৃহপরিবেশকে উন্নত বা পরিবর্তিত করা সম্ভব নয় সেই সব ক্ষেত্রে শিশুকে আবাসিক বিদ্যালয়ে রাখা যেতে পারে। পিতৃমাতৃহীন শিশুর ক্ষেত্রে তাকে সহৃদয় দম্পতির কাছে পালিত সন্তানরূপে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য যদি অপরাধপরায়ণতার মাত্রা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় তাহলে কেবলমাত্র পরিবেশের পরিবর্তন করলেই তা নিরাময় হবে না। তার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করা।

৩। অপসঙ্গতি দূরীকরণ

যে সব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সংগতির অভাবের জন্য শিশুর মধ্যে অপরাধপরায়ণতা দেখা গিয়েছে সে সব ক্ষেত্রে শিশু যাতে সন্তোষজনকভাবে সংগতিবিধান করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে পিতামাতা, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-সহপাঠী প্রভৃতিদের সঙ্গে শিশু যাতে সুষ্ঠুভাবে সংগতিবিধান করতে পারে তাকে সেই রকম শিক্ষা ও সাহায্য দিতে হবে। যে সব অতি প্রয়োজনীয় চাহিদার অতৃপ্তির জন্য শিশুর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিয়েছে সেই সব চাহিদার যথাসম্ভব তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

যখন কোন জটিল কারণ থেকে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি হয় তখন সহজে সাধারণ পন্থায় তার নিরাময় করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা মনোবিজ্ঞান-সম্মত ও সুপরিকল্পিত চিকিৎসা। আধুনিক-কালে এই ধরণের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য নানা মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। জটিল অপরাধপরায়ণতার ক্ষেত্রগুলি নিরাময়ের জন্য উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। এই বিজ্ঞানে শিশুর মনের গভীর তলদেশে যে প্রক্ষোভমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অপরাধপরায়ণতার সৃষ্টি সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করে সেটিকে সযত্নে দূর করার চেষ্টা করা হয়।

৫। দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ও প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য এবং প্রক্ষোভমূলক সমতার উপর তার মানসিক স্বাস্থ্য প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। অতএব অপরাধপরায়ণতা দূর করতে হলে শিশুর

দৈহিক স্বাস্থ্য এবং প্রক্ষোভমূলক সমতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করতে হবে।

৬। খেলাধূলা, অবসর বিনোদন, সুষম খাদ্য প্রভৃতির আয়োজন

শিশুর অপরাধপরায়ণতা দূর করার আর একটি প্রকৃষ্ট উপায় হল তার মানসিক আনন্দ যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। নানারকম খেলা-ধূলা, সৃজন-মূলক কাজ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সে যদি তার মানসিক তৃপ্তি খুঁজে পায় তাহলে অপরাধপরায়ণতা সহজেই দূরীভূত হয়। সুষম খাদ্যও অপরাধপরায়ণতা দূর করার একটি বড় উপকরণ। ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যের জন্য শিশুর স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং তার দেহ মন উভয়ই আক্রান্ত হয়।

৭। সমাজধর্মী অভিজ্ঞতা

সমাজধর্মী অভিজ্ঞতা অপরাধপরায়ণতা দূর করার আর একটি বড় উপায়। নানারকম সামাজিক আদান-প্রদান, সম্মিলিত কাজকর্ম, যৌথ অভিজ্ঞতা প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

প্রশ্ন:

1. What are the methods that you should adopt to remove delinquency in the child?

2. Describe the means of preventing and curing delinquency and comment on the role of home and school in this respect.

3. Describe the individual and collective measures of treating delinquency.

উনিশ

অচেতনের স্বরূপ (Nature of Unconscious)

সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানে মানব আচরণের ব্যাখ্যায় অচেতন মনের প্রভাব ও কার্যাবলী প্রধানতম শক্তি বলে পরিগণিত হলেও পঞ্চাশ বৎসর আগেও মনোবিজ্ঞানীরা অচেতন মন সম্পর্কে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তাঁদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মূল বিষয়বস্তু ছিল সচেতন মন ও তার বিভিন্ন কাজ। ফ্রয়েডই প্রথম নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দেন যে সমগ্র মানব মনের বেশীর ভাগ অংশটিই হল অচেতন এবং সেই অচেতন মনের প্রকৃতি ও আচরণ জানা না থাকলে সচেতন মনের প্রকৃতি ও আচরণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কিছুই জানা যাবে না। আজ অচেতন মন সম্পর্কে যে সব মূল্যবান তথ্য আমাদের মনোবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে এবং যে সব তথ্যকে ভিত্তি করে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, মনশ্চিকিৎসার বিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানগুলি গড়ে উঠেছে সেগুলির অধিকাংশই ফ্রয়েডের অবদান।

অবশ্য প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা অচেতনের কোন কাজ বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যে পরিচিত ছিলেন না তা নয়। স্বপ্নচারিতা (Somnambulism), দ্বৈত ব্যক্তিসত্তা (Double personality), অভ্যাসজনিত অচেতন আচরণ, স্বতঃলিখন (Automatic writing) প্রভৃতি অচেতন মনের নানারকম কাজের কথা মনোবিজ্ঞানীদের জানা ছিল। কিন্তু তখন তাঁরা এগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। প্যারিসে এবং নান্সিতে ফ্রয়েড যখন বিভিন্ন মনোবিকারের রোগীদের চিকিৎসা করেন সেই সময় তাঁর নিজের ব্যাপক গবেষণা থেকে ফ্রয়েড অচেতন মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন। ফ্রয়েড দেখলেন যে এই সব মনোবিকারের রোগী সম্মোহিত অবস্থায় এমন বহু কথা মনে করতে পারে যেগুলি সম্মোহন থেকে জেগে ওঠার পরে তারা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। স্পষ্টতই এই বস্তুগুলি তারা যে সত্য সত্য ভুলে যায় তা নয় সেগুলি তাদের অচেতনের গভীর অন্তঃস্থলে অবদমিত হয়ে থাকে।

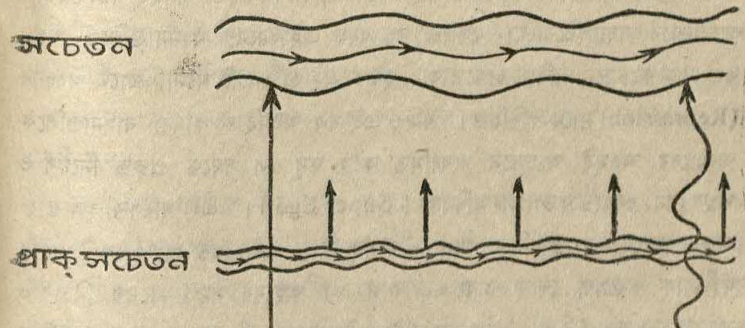
এই থেকেই ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করলেন যে ব্যক্তির মনের যে অংশটি সচেতন তার আচরণের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সে অংশটির নিজস্ব ভূমিকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই সচেতন মনের নীচেই রয়েছে অতি শক্তিশালী ও সক্রিয় অথচ সম্পূর্ণ অচেতন একটি মন। যদিও এই মনের কথা ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তবু মনের রাজ্যে এটিই হল প্রকৃত শাসক বা প্রভু। বড় বড় ফ্যাক্টরিতে যেমন কন্ট্রোলরুম থাকে এবং সেই

কন্ট্রোল রুমের নির্দেশে সমস্ত ফ্যাক্টরিটি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সেই রকম এই অচেতন মনের অনুশাসন ও নির্দেশ অনুযায়ীই আমাদের সমগ্র মনের সমস্ত আচরণই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

সুদীর্ঘ অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ থেকে ফ্রয়েড মানব মনের সংগঠনের একটি পরিকল্পনা দেন।[১] তিনি মনটিকে তিনটি স্তরে ভাগ করেন। প্রথমটি হল সচেতন স্তর। ব্যক্তির সমস্ত জ্ঞাত মানসিক প্রক্রিয়া এবং কার্যাবলীর দ্বারা এই স্তরটি গঠিত। দ্বিতীয়টি হল অচেতন স্তর। যে সব মানসিক চিন্তা বা প্রক্রিয়া সচেতন স্তরে স্থান পেতে পারে না সেগুলি দিয়েই এই স্তরটি গঠিত। আর এই দুটি স্তরের মধ্যবর্তী স্তরটি হল প্রাক্‌চেতন স্তর। এই স্তরে এমন সব স্মৃতি, অনুষঙ্গ, অস্পষ্ট ধারণা থাকে, যেগুলি সাময়িকভাবে ব্যক্তির কাছে অজ্ঞাত হলেও চেষ্টা করলে সেগুলিকে সচেতন স্তরে তুলে আনা যায়।

অচেতনের অধিবাসী

অচেতনের অধিবাসীদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েড দেখলেন যে



[অচেতন স্তর থেকে অবদমিত কামনা-বাসনাগুলি সচেতনে উঠে আসার অবিরাম চেষ্টা করে চলে। তাদের বাধা দেয় সেন্সর। সময় সময় সেন্সরকে এড়িয়ে অবদমিত কোন বাসনা সচেতন স্তরে গিয়ে পৌঁছয়।]

১। পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৬ দ্রষ্টব্য।

সেখানে প্রধানত এমন কতকগুলি মৌলিক ইচ্ছা বা প্রবণতা বাস করে যেগুলি প্রকৃতিতে যৌনধর্মী। তাছাড়া আমাদের শিক্ষা ও সমাজ যে সব নৈতিক ও আচরণমূলক আদর্শ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিয়েছে সেই সব আদর্শের সঙ্গে এই ইচ্ছা বা প্রবণতাগুলির প্রচণ্ড বিরোধ রয়েছে। এই প্রবণতাগুলির অধিকাংশই পুরোপুরি প্রবৃত্তিমূলক এবং জন্ম থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। এগুলি অচেতনের বাসিন্দা হলেও স্থির বা নিষ্ক্রিয় হয়ে এরা সেখানে বাস করে না। এরা সব সময়ই চেষ্টা করে অচেতন স্তর থেকে সচেতন স্তরে উঠে আসতে এবং ব্যক্তির সচেতন আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের পরিতৃপ্তি পেতে। কিন্তু ব্যক্তির অহংসত্তা বাস্তবের কড়া নিয়মকানুনের ভয়ে এই ইচ্ছা বা প্রবণতাগুলিকে উপরে উঠতে দেয় না এবং যখনই তারা উপরে ওঠার চেষ্টা করে তখনই জোর করে তাদের অচেতনে অবদমিত করে রাখে।

অধিসত্তা ও অবদমন (Super Ego and Repression)

এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি প্রবৃত্তিজাত এবং প্রকৃতিতে যৌনধর্মী হওয়ার জন্য সেগুলির সঙ্গে আমাদের সমাজের অনুশাসনের কোন মিল তো নেইই বরং সেগুলি প্রচণ্ডভাবে সমাজবিরোধী। সেজন্য বহু সময় এই ধরনের কামনাগুলিকে অহম্ বলপূর্বক অচেতনে দাবিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়াটি মনোবিজ্ঞানে অবদমন (Repression) নামে পরিচিত। যদিও এই সব অবাঞ্ছিত কামনা বাসনাগুলিকে আমাদের অহম্ই অচেতনে অবদমিত করে তবু সে সম্বন্ধে প্রকৃত নির্দেশ ও অনুশাসন দেবার কর্তা হল অধিসত্তা (Super Ego)। এই অধিসত্তা হল ন্যায়-অন্যায় ভালোমন্দ প্রভৃতির অচেতন মাপকাঠি। এটির জন্ম হয়ে থাকে শৈশবের ঈডিপাস কমপ্লেক্স থেকে এবং এর কাজ হল অহমের সমস্ত কাজের বিচার ও সমালোচনা করা। অচেতনের কোন্ ইচ্ছাটিকে তৃপ্তি দিতে হবে এবং কোন্টিকে দিতে হবে না সে সম্বন্ধে অধিসত্তার নির্দেশ অনুসারেই অহম্ কাজ করে থাকে।

ইদম্ (Id)

অচেতনের এই অবাঞ্ছিত বাসনা সমষ্টির ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন ইদম্ (Id)। ইদম্ আমাদের নগ্ন ও অতৃপ্ত কামনা-বাসনার প্রতিমূর্তি। ইদম্ কোন ন্যায় অন্যায় বোঝে না, কোন নীতি দুর্নীতির ধার ধারে না। ইদমের কাছে একটি মাত্র নীতিই জানা আছে সেটি হল সুখভোগের নীতি (Pleasure Principle)। ইদমের একমাত্র কাম্য হল বাসনার পরিতৃপ্তি। সেই বাসনার পরিতৃপ্তিতে ব্যক্তির সমাজজীবনে কোনও ক্ষতি হল কি না হল সেটা ইদমের দ্রষ্টব্য নয়। কিন্তু অহমের

পক্ষে এই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সে বাস্তবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাস্তবের কঠোর অনুশাসন না মেনে চললে কি ধরনের অসুবিধা ও বিপর্যয় ঘটতে পারে তা সে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জানে। তাকে বাঁচতে হলে বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে চলতেই হবে এবং আমাদের সভ্য সমাজের বিচারে যে আচরণ অনুমোদিত একমাত্র সেই আচরণই সে সম্পন্ন করতে পারে। এইজন্য ইদমের সুখভোগের নীতি সে অনুসরণ করতে পারে না। তার নীতি হল বাস্তবের নীতি (Reality Principle)। বাস্তবের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করা তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে অহম্ ও ইদম্ একই মনের দুটি অংশ। ইদমের কামনার তৃপ্তি মানেই অহমেরই তৃপ্তি। কিন্তু তবুও অহম্ ইদমের ইচ্ছামত তার কামনা বাসনাগুলির তৃপ্তি দিতে পারে না। তাকে প্রতিরুদ্ধ করে বাস্তবের কঠোর অনুশাসন।

সেন্সর (Censor)

অচেতন কামনাগুলি যাতে সচেতন স্তরে আবির্ভূত না হয় তার জন্য আর একটি শক্তি সর্বদা অচেতনে পাহারাদারের কাজ করে। ফ্রয়েড এই শক্তিটির নাম দিয়েছেন সেন্সর (Censor)। সেন্সরের কাজ হল অচেতনের তৃপ্তিপ্রার্থী কামনাগুলিকে পরীক্ষা করা এবং দেখা যে কোনও অসামাজিক চিন্তা যেন সচেতন স্তরে গিয়ে হাজির না হয়। সেন্সর প্রকৃতপক্ষে অবদমনেরই আর একটি রূপ।

কেবলমাত্র সহজাত ইচ্ছা বা কামনা নিয়েই অচেতন গঠিত নয়। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব ইচ্ছা বা চিন্তার উদয় হয় যেগুলি এতই অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত প্রকৃতির যে সেগুলিকে সে তার সচেতন মন থেকে নির্বাসিত করে অচেতন মনে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই ইচ্ছা ও কামনাগুলিও কালক্রমে অচেতনের অধিবাসী হয়ে দাঁড়ায় এবং সচেতন মনে উঠে এসে তৃপ্তি পাবার প্রতীক্ষায় থাকে।

অচেতনের তৃতীয় অধিবাসী হচ্ছে এমন কতকগুলি প্রবৃত্তি এবং প্রবণতা যা আমরা আমাদের বহু প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকি। এগুলিকে জাতিগত বা পূর্বপুরুষীয় অচেতন (Racial or Ancestral Unconscious) বলা হয়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (Jung) এই জাতিগত অচেতনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর নাম দিয়েছেন আর্কিটাইপ বা আদিরূপ (Archetype)।

আদিম পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বহু ধারণা, সংস্কার, ইচ্ছা, বিশ্বাস ও প্রবণতা ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে বর্তমান মানুষের মনের মধ্যে এসে সঞ্চিত হয়েছে। সেগুলির রূপ এতই অদ্ভুত, অসামাজিক ও বীভৎস যে সেগুলিকে আমরা আমাদের বর্তমান সভ্য জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি না এবং ফলে কোনরূপেই সেগুলিকে সচেতন মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না। তার ফলে তারা আমাদের জন্ম থেকেই অচেতনে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

মানসিক নির্ধারণ (Psychic Determinism)

অচেতনে নিহিত কামনা বাসনার অস্তিত্ব থেকেই ফ্রয়েড তার প্রসিদ্ধ মানসিক নির্ধারণের তত্ত্বটি (Theory of Psychic Determinism) গঠন করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের সচেতন মনের কোন চিন্তাই নিজে থেকে বা নতুন হয়ে জন্মায় না। সেগুলির প্রত্যেকটিই অচেতনের গভীর স্তরে যে সব মানসিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় সেগুলির দ্বারাই সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে আমাদের প্রতিটি আচরণকেই প্রবৃত্তিধর্মী বলা চলে এবং অচেতন প্রবণতা, অর্জিত অভ্যাস এবং পরিবেশের উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়ার ধারা প্রভৃতি বহুবিধ শক্তির সামগ্রিক ফলবিশেষ বলে বর্ণনা করা যায়। যেখানে মনের সচেতন স্তরে কোন বিশেষ আচরণের উদ্দেশ্য বা কারণ পাওয়া যাবে না সেখানে বুঝতে হবে যে আচরণটির প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণ নিহিত আছে অচেতন স্তরে।

প্রায়ই দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি অসতর্কভাবে হঠাৎ কিছু বলে ফেলে বা অদ্ভুত কোন ভুল করে বসে। এই অসতর্ক উক্তি বা অদ্ভুত কাজটির কোনও কারণ বা ব্যাখ্যা তার সচেতন মনে পাওয়া যায় না। তখন এই কাজগুলিকে অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন বলে মনে করলে ভুল হবে। ফ্রয়েড বহু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে এই ধরনের আকস্মিক কাজগুলির পেছনে কোন না কোনও অচেতন কামনা নিহিত থাকে। বস্তুত এই ধরনের অসতর্ক উক্তি বা ভুল কাজেরও স্বাভাবিক উক্তি বা কাজের মত কোন বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যদিও কাজটি তার যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না তবুও ব্যক্তির সেই মুহূর্তের সচেতন উদ্দেশ্যের পথে তা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে এবং অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়ে আংশিক তৃপ্তিলাভ করে।

মনোবিকারের রোগীদের ক্ষেত্রে এই মানসিক নির্ধারণের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মনোবিকারের রোগীরা যত রকম অস্বাভাবিক আচরণ করে সেগুলি বাহ্যত উদ্দেশ্যবিহীন বলে মনে হলেও তার কোনটিই প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যবিহীন নয়।

তাদের প্রত্যেকটি আচরণই কোন না কোন অচেতন উদ্দেশ্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। অ্যানা বলে একটি মেয়ে বহুদিন ধরে তার রোগাক্রান্ত শয্যাশায়ী পিতার সেবাশুশ্রূষা করে আসছিল। তার নিষ্ঠা ও পিতৃভক্তি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, যে হাত দিয়ে সে বাবার সেবা করত সেই হাত খানিই পক্ষাঘাতে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা করে জানা গেল যে অ্যানা হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং তার হাতের পক্ষাঘাত রোগটি এই হিষ্টিরিয়া থেকেই জন্মেছে। প্রকৃতপক্ষে অ্যানা দীর্ঘ দিন পিতার সেবা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং মনে মনে পিতার সেবার ভার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। অথচ পিতার প্রতি ভালবাসা ও সামাজিক প্রথার চাপে সে তার সচেতন স্তরে সেই ইচ্ছাকে স্থান দিতে পারে না। ফলে এই অবদমিত ইচ্ছাটি সহজ ও স্বাভাবিক রূপে অভিব্যক্ত হতে না পেরে তার মধ্যে মনোবিকারের সৃষ্টি করেছিল। তার হাতের এই পক্ষাঘাতগ্রস্ততা তার সেই অবদমিত ইচ্ছারই একটি অভিব্যক্তি। পিতার সেবা থেকে মুক্তি পাবার এই অতৃপ্ত বাসনাটির পরিতৃপ্তি অ্যানা হিষ্টিরিয়া রোগের মধ্যে দিয়ে আদায় করে নিল। এইজন্যই ফ্রয়েড মনোবিকারের প্রত্যেকটি লক্ষণকেই চেতন ও অচেতনের মধ্যে একটা মাঝামাঝি সিদ্ধান্ত বা বোঝাপড়া বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে যখনই এই বিশেষ অবদমিত ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যটিকে তার অচেতন অবস্থান থেকে সচেতন স্তরে তুলে আনা যাবে তখনই মনোবিকারের অবসান ঘটবে।

মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association)

ফ্রয়েডীয় সহকর্মী ব্রুয়ার তাঁর রোগীদের নিছক কথা বলার মধ্যে দিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা কামনাটিকে উদ্ঘাটিত করতেন। পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে এইভাবে আবার জাগিয়ে তোলার নাম দেওয়া হয়েছে মনোবৈজ্ঞানিক বিরেচন (Psychocatharsis)। আর সেই তিক্ত বা অপ্রিয় স্মৃতিটির বর্ণনার সময় প্রক্ষোভের যে উন্মোচন ঘটত ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন এ্যাব্রিকসান (Abreaction)। এই তথ্য থেকেই ফ্রয়েড মনোবিকারের চিকিৎসায় তাঁর অধুনা প্রসিদ্ধ মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন।

প্রতিরক্ষণ কৌশল বা সঙ্গতিবিধান কৌশল

(Defence Mechanisms or Adjustment Mechanisms)

যদিও অচেতন স্তর ব্যক্তির মনের মধ্যে অবদমিত হয়ে বাস করে এবং তার অবস্থিতি সচেতন মন থেকে অনেক নীচে তবুও অচেতন সব সময়ই অচেতন

হয়ে কাটায় না। অচেতনের কামনা বাসনাগুলি দুটি উপায়ে সচেতন স্তরে অভিব্যক্ত হতে পারে। প্রথমত, ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থাতেই সেন্সরের কঠিন পাহারা কৌশলে এড়িয়ে অচেতনের কামনাটি ব্যক্তির অহমের কাছ থেকে তার কাম্য পরিতৃপ্তি আদায় করতে পারে। এই সময়ে ব্যক্তির আচরণ কখনই সহজ ও স্বাভাবিক থাকে না এবং প্রত্যাশিত স্বাভাবিক রূপ থেকে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যখন কোন অচেতনে নিহিত কামনার দাবী প্রচণ্ড হয়ে ওঠে এবং অহমের পক্ষে সে দাবী পূর্ণ না করে উপায় থাকে না তখন অহম তার সে দাবী তৃপ্ত করার জন্য কতকগুলি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। অচেতনের কামনাটি সোজা পথে সেন্সরের কঠোর পাহারা অতিক্রম করতে পারে না। তার জন্য সে নিজের আসল রূপ বদলে ছদ্মরূপ গ্রহণ করে এবং সেন্সরকে কৌশলে অতিক্রম করে। তার ফলে এই বিশেষ কামনাটি যখন ব্যক্তির সচেতন স্তরে গিয়ে দেখা দেয় তখন তার পূর্বেকার অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক চেহারাটা আর থাকে না। এই নির্দোষ বেশ ধারণের ফলে অহমেরও আর ঐ বাসনাটিকে তৃপ্তি দিতে কোনও আপত্তি থাকে না। কিন্তু বাহ্যত কামনাটি নির্দোষ দেখালেও প্রকৃতপক্ষে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি অপরিবর্তিতই থাকে এবং এই ভাবে সচেতন স্তরে উঠে আসার ফলে তার উদ্দেশ্যটির সম্পূর্ণ তৃপ্তি না হলেও আংশিক তৃপ্তি ঘটেই থাকে। ইদমের কামনাগুলিকে তৃপ্তি দেওয়ার এই কৌশলগুলিকে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) কিংবা সঙ্গতিবিধান কৌশল (Adjustment Mechanism) নাম দেওয়া হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে এই ধরনের আচরণগত কৌশল আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতি নিয়তই প্রয়োগ করে থাকি। এই প্রতিরক্ষণ বা সঙ্গতিবিধান কৌশলগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১] যেমন— প্রতিক্ষেপণ (Projection)—নিজের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া। অপব্যাখ্যান (Rationalisation)—নিজের কোনও অনুচিত আচরণকে বিশেষভাবে তৈরী যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা। উন্নতীকরণ (Sublimation)—মন্দ প্রবণতাকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া। প্রত্যাবৃত্তি (Regression)— বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়ে শৈশবের আচরণে ফিরে আসা। রূপান্তরকরণ (Conversion)—অবদমিত চিন্তা বা কামনা শারীরিক লক্ষণের রূপে প্রকাশ পাওয়া। দিবাস্বপ্ন (Day-dreaming)—কল্পনার সাহায্যে অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি দান করা ইত্যাদি।

১। তের'র পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ২৬৬।

স্বপ্ন—অচেতনের রাজপথ

অচেতনের বহিঃপ্রকাশের আর একটি অতি কার্যকরী পন্থা হল স্বপ্ন। মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার সচেতন মন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অচেতনের পাহারাদার যে সেন্সর তারও পাহারা তখন শিথিল হয়ে যায়। ফলে তখন অচেতনের কামনা-গুলির পক্ষে সেন্সরের পাহারাকে এড়িয়ে যাওয়া অনেক সহজ হয়ে ওঠে এবং অচেতনের সমস্ত নিরুদ্ধ চিন্তা ও ইচ্ছাগুলি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। এই কারণে ফ্রয়েড স্বপ্নকে 'অচেতনে পৌছানর রাজপথ' (Royal Road to Unconscious) বলে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক মনশ্চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্বপ্নকে ব্যক্তির মনের অন্তর্নিহিত গুপ্ত ইচ্ছার পরিতৃপ্তির একটি বড় মাধ্যম বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যক্তির স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে তার মনের অবদমিত কামনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করার প্রথা মানসিক রোগের চিকিৎসায় একটি প্রধান পন্থা বলে পরিগণিত হয়েছে।

স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অতৃপ্ত চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে থাকে। অচেতনের অবদমিত কামনাটি সচেতনে আসতে পারলেই তার আংশিক তৃপ্তি হয়। জাগ্রত অবস্থায় সেন্সরের কড়া পাহারা থাকার ফলে এই তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু রাত্রে সেন্সর দুর্বল হয়ে পড়লে অচেতনের চিন্তাগুলি স্বপ্নের রূপ নিয়ে সচেতন স্তরে আবির্ভূত হয় এবং নিজেদের কাম্য পরিতৃপ্তি লাভ করে। তবে সেগুলি তখন তাদের নিজস্ব রূপে থাকে না, নানা রকম ছদ্মবেশ ধারণ করে। এই ছদ্মবেশ ধারণের বিভিন্ন পন্থা আছে যেমন—সংক্ষিপ্তকরণ (Condensation), স্থানচ্যুতি (Displacement), নাটকীয়তা (Darmatisation), প্রতীকধর্মিতা (Symbolisation) প্রভৃতি। এই সব কৌশলের সাহায্যে অচেতনের চিন্তাগুলি স্বপ্নের মাধ্যমে নিজেদের অভিব্যক্ত করে থাকে। তার ফলে সোজাসুজিভাবে স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বোঝা সম্ভব হয় না। এই জন্যই স্বপ্ন আমাদের কাছে এত অদ্ভূত ও অর্থহীন বলে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে স্বপ্নের দুটি অর্থ আছে। একটি প্রকাশিত অর্থ, (manifest content), অপরটি নিহিত অর্থ (latent content)। স্বপ্নের এই কৌশলগুলির অর্থ উদ্ঘাটিত করতে পারলে স্বপ্নের নিহিত অর্থও জানা যায়। কেমন করে স্বপ্নের নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করা যায় সে সম্পর্কে ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা বর্তমানে বহু চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

অচেতনের মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক
(Psychology of Unconscious and Teacher)

শিশুর পালন ও শিক্ষাদানের ধারা আজ ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের নতুন নানা

আবিষ্কারে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শিশুর প্রতি শিক্ষকের মনোভাব ও আচরণ দুইই এই অচেতনের মনোবিজ্ঞানের নতুন তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। অচেতনের আবিষ্কার কি ভাবে প্রচলিত শিক্ষার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিয়েছে সে সংক্রান্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের বিবরণ দেওয়া হল।

১। আচরণ-সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা

পূর্বে শিশুর মন বলতে শিক্ষক একমাত্র সচেতন মনকেই বুঝতেন। শিশুর কাজকর্ম আচরণ সবই তিনি মনে করতেন শিশুর সচেতন মনের চিন্তা বা ইচ্ছা থেকে প্রসূত। ফলে শিক্ষক শিশুর সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যাও যেমন তার সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা দিতেন তেমনই তার আচরণের সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্যও তিনি তার এই সচেতন মনেরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংশোধিত বা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করতেন। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি ছেলে মিথ্যা কথা বলত তা হলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে তার মনের অসৎ কোন ইচ্ছা লুকোতে বা শাস্তি এড়াবার জন্য বলছে। কোন ছেলে যদি চুরি করত তাহলে তিনি মনে করতেন যে সে লোভের বশবর্তী হয়ে চুরি করছে। আবার যদি কোন ছেলে ক্লাশ থেকে পালাত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে নিশ্চয়ই পড়াশোনায় অমনোযোগী বা অসৎসঙ্গের প্ররোচনায় সে পড়ায় অবহেলা করছে। এই সব দুষ্কৃতিকারীদের সংশোধনের জন্য পন্থাও সেই রকম তিনি অবলম্বন করতেন। অর্থাৎ যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে তার মনের অসৎ ইচ্ছাকে তিনি দমন করার বা তার মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করতেন। যে ছেলে চুরি করত তাকে কেমন করে লোভ দমন করতে হয় তার শিক্ষা দিতেন বা যাতে সে চুরি করার সুযোগ না পায় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতেন। তেমনই যে ছেলে ক্লাশ পালাত সে ছেলে যাতে ক্লাশ পালাবার সুযোগ আর না পেত সেদিকে শিক্ষক সতর্ক দৃষ্টি দিতেন। শিক্ষক তাঁর এই সংশোধনমূলক প্রচেষ্টায় দুটি বস্তুর সাহায্য ব্যাপকভাবে নিতেন। সে দুটি হল শাস্তি ও পুরস্কার। যাতে ছেলেমেয়েদের দুষ্কৃতির দিকে প্রবণতা না দেখা দেয় এবং যাতে তারা সঙ্গত আচরণ করে সেজন্য শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্ত্ররূপে সর্বত্রই ব্যবহার করা হত।

কিন্তু যেদিন থেকে মনোবিজ্ঞানীরা অচেতন মনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারলেন সেদিন থেকেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে শিশুর আচরণের যে ব্যাখ্যা

এতদিন তাঁরা দিয়ে এসেছেন সে ব্যাখ্যা নিতান্তই ভুল ও অসম্পূর্ণ। ব্যক্তির আচরণের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক ব্যক্তির সচেতন মন নয়, মানুষের অচেতন মনই। শিশুর সচেতন মনরে কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে তা লুপ্ত বা বিনষ্ট হয়ে যায় না। তা অবদমিত হয়ে বাস করে তার অচেতন মনে এবং সেখানে সেটি সৃষ্টি করে অন্তর্দ্বন্দ্বের। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু তা তার সচেতন আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে বহুক্ষেত্রে তার সচেতন চিন্তাধারা, আচরণ, মনোভাব প্রভৃতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে।

যেমন, যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে সে নিছক অসৎ ইচ্ছায় বা শাস্তির ভয়ে যে তা বলছে তা না হতেও পারে। হয়ত তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা স্বাভাবিক পথে তৃপ্ত না হওয়ায় সে মিথ্যা কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। তেমনই যে ছেলে চুরি করছে সেও হয়ত তার অতৃপ্ত সঞ্চয়ের চাহিদা কিংবা প্রত্যাখ্যাত স্বীকৃতির চাহিদাকে তৃপ্ত করার জন্য চুরি করছে। যে ছেলে ক্লাশ পালাচ্ছে সেও হয়ত ক্লাশে তার কৌতূহল তৃপ্তির যথেষ্ট উপাদান না পাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে পড়ছে তার কৌতূহল তৃপ্তির জন্য। এই ছেলেমেয়েদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অপসঙ্গতিসম্পন্ন (maladjusted) শিশু বলা হয়ে থাকে। এই সব শিশু স্বাভাবিক পন্থায় নিজেদের চাহিদার তৃপ্তি করতে না পেরে অস্বাভাবিক পথ নিয়েছে সেই চাহিদার পরিতৃপ্তি পেতে। এতদিন এই ধরনের ছেলেমেয়েদের আচরণের ব্যাখ্যা গতানুগতিক পন্থাতেই দিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদের সম্পূর্ণ সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছে বাহ্যিক উপায়ে। কিন্তু সে চিকিৎসা হয়ে এসেছে নিছক লক্ষণভিত্তিক (symptomatic) অর্থাৎ সেখানে কেবলমাত্র তাদের লক্ষণগুলি দূর করার চেষ্টাই হয়েছে প্রকৃত রোগ নিরাময় করার চেষ্টা হয়নি। যে ছেলে ক্লাশ থেকে পালাচ্ছে বা চুরি করছে তাকে কড়া শাসনে রাখলে সে হয়ত ঐ কাজগুলি আর করতে পারবে না। কিন্তু তাতে তার চাহিদার তৃপ্তি হবে না বা মনের অন্তর্দ্বন্দ্বও দূর হবে না। ফলে তার অতৃপ্ত চাহিদা অপর কোনও অস্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু বর্তমানে শিশুর অচেতন মন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করায় শিক্ষকেরা শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের সত্যকারের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করতে পারেন। শিশুর অপসঙ্গতির যে মূল কারণটি তার অচেতনের গভীর তলদেশে নিহিত থাকে যতক্ষণ সেটির চিকিৎসা না করা হচ্ছে ততক্ষণ শিশুর অপসঙ্গতি দূর হবে না। ফলে আজকাল শিশুর সমস্যামূলক আচরণের চিকিৎসা

হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলগত, নিছক লক্ষণগত নয়। এই ধরনের শিশুকে আজকাল আর শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে বা নৈতিক বিধিনিষেধের কড়া বাঁধনে বেঁধে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় না, তাদের সমস্যাগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং রোগের মূল কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণেই আজকাল সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই শিশুদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য শিশুপরিচালনাগারের (Child Guidance Clinic) সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পরিচালনাগারে শিশুদের মানসিক সমস্যাগুলির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে সেগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে চিকিৎসা করার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া স্কুলের পরিবেশে যাতে শিশুদের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদাগুলি তৃপ্তি লাভ করে এবং যাতে শিশু সুসঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে বেড়ে ওঠে তার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে।

বস্তুত অচেতন মনের আবিষ্কার মানব মনের বহু শতাব্দীর বন্ধ দরজা আজ খুলে দিয়েছে। শিক্ষক আজ শিশু মনের বহু জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। মানুষের অনেক আচরণই বাহ্যত নির্দোষ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন অন্তর্নিহিত অসামাজিক চাহিদা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে সেগুলি জন্মে থাকে। অনেক সময় অচেতনে অবদমিত কমপ্লেক্সও আমাদের বহু আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই আচরণগুলিকে মনঃসমীক্ষণে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) বা সঙ্গতিবিধান কৌশল (Adjustment Mechanism) বলা হয়। শিশুর কোন আচরণকেই আজকাল আর তার বাহ্যিক লক্ষণ বা স্বরূপের দ্বারা বিচার করা হয় না। তার অন্তর্নিহিত গুপ্ত কারণ বা উদ্দেশ্যটিকে খুঁজে বার করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

২। মনোবিকারের কারণ নির্ণয়

অচেতনের মনোবিজ্ঞান যেমন একদিকে সাধারণ সমস্যামূলক আচরণের ব্যাখ্যা দেয় তেমনই গুরুতর মনোবিকারের কারণেরও সন্ধান দিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকারের কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অচেতনে। লিবিডোর সংবন্ধন, লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি, শৈশবকালীন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা (traumatic experience) ইত্যাদি মানসিক ঘটনাগুলি যে মনোবিকারের প্রকৃত কারণ, এ সত্যের সঙ্গে শিক্ষক আজ পরিচিত হয়েছেন এবং যাতে শিশুর জীবনে এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে সেদিকে তিনি যত্ন নিতে পারেন।

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার অচেতন মনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অচেতনের অধিবাসী অসংখ্য অসামাজিক কামনাবাসনার তৃপ্তির আভ্যন্তরীণ চাপ এবং বাস্তব জগতের অনুশাসন ও দাবীর মধ্যে যতটুকু ও যেভাবে ব্যক্তি সামঞ্জস্য করতে পারে সেইভাবেই তার ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। শিক্ষকের এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু জানা থাকলে তিনি উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

৩। শৈশবের গুরুত্ব

অচেতনের মনোবিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় দান হল শৈশবের উপর অসীম গুরুত্ব স্থাপন। আগে মনে করা হত শৈশবের বিশেষ কোন প্রভাব ব্যক্তির পরিণত জীবনে থাকে না। কিন্তু বর্তমানে অচেতনের বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শৈশবই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল এবং ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার অধিকাংশ সংগঠনটিই প্রস্তুত হয়ে যায় তার জীবনের প্রথম কয় বছরের মধ্যেই। অতএব শিশু তার শৈশবে যাতে কোনরূপ আঘাতাত্মক (traumatic) অভিজ্ঞতা না পায় এবং তার ক্রমবিকাশ স্বাস্থ্যময় ও অভীষ্ট পথ ধরে এগোতে পারে সেটা দেখাই শিক্ষার প্রধান কাজ।

৪। মানসিক নির্ধারণ-বাদ

মনঃসমীক্ষণের দেওয়া মানসিক সংগঠনের পরিকল্পনাটিও শিক্ষায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে অচেতনের পরিকল্পনাটি মানব আচরণের ব্যাখ্যায় যুগান্তর এনেছে। ব্যক্তির আচরণ যে কেবলমাত্র তার সচেতন মনের চিন্তা, ইচ্ছা এবং ধারণা থেকেই জন্মায় না বরং তার প্রত্যেকটি আচরণের চরম নির্ণায়ক ও নির্ধারক হল তার অচেতন মনের অদৃশ্য শক্তিগুলি—এই অভিনব তথ্যটি আজ শিক্ষকের হস্তগত হওয়ায় শিক্ষার পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই তত্ত্বটির নাম দেওয়া হয়েছে মানসিক নির্ধারণবাদ (Theory of Psychic Determinism)। এই নতুন তত্ত্বটির পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর আচরণের স্বরূপ-নির্ণয় ও সংব্যাখ্যান সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে।

৫। মানসিক দ্বৈততা

অচেতনের মনোবিজ্ঞানের আর একটি অবদান হল মানব মনের চিরন্তন দ্বৈততাকে (duality) প্রকাশিত করা। মানুষের মনে বহু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শক্তি পাশাপাশি থেকে মানুষের সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এরস হল জীবন ও

ভালবাসার শক্তি, তার পাশেই রয়েছে থ্যানাটস, ধ্বংস ও মৃত্যুর শক্তি। ইদম্ অন্ধ ও যুক্তিহীন, নগ্ন কামনার প্রতিমূর্তি, তার পাশে থেকে কাজ করছে অহম্—আমাদের বাস্তব-সচেতন মন ও বিচারবুদ্ধির বাহক। অতএব মানুষের আচরণের মধ্যে বৈষম্য ও স্ববিরোধিতা থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এই বিপরীতধর্মী প্রবণতাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ।

৬। শৈশবকালীন যৌনতা

শৈশবকালীন যৌনতার (Infantile sexuality) তত্ত্বটিও অচেতনের মনোবিজ্ঞান থেকে পাওয়া। শৈশবে শিশুর ব্যক্তিসত্তা নির্ণয়ে যৌনশক্তির প্রভাবই যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ মূল্যবান তথ্যটি প্রথম মনঃসমীক্ষণই প্রকাশ করে। অবশ্য ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে মানবের আচরণের সকল স্তরেই যৌনতাই একমাত্র শক্তি। এ মতবাদটি আজ সর্বজনস্বীকৃত না হলেও, মানব আচরণের নির্ণায়ক রূপে যৌনতা যে একটি প্রধান শক্তি এ কথাটি আজকাল সকলেই স্বীকার করে থাকেন। এই জন্যই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর যৌন চাহিদাকে আর অবহেলা করা হয় না এবং নানা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তার তৃপ্তির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই একই কারণে যৌন-শিক্ষাও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে।

৭। আবেগমূলক শক্তি

অচেতনের মনোবিজ্ঞানে প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, অনুভূতি প্রভৃতি শক্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে যুক্তিমূলক ইচ্ছা, অভ্যাস, রিফ্লেক্স প্রভৃতিকেই আচরণের প্রধান উৎস বলে মনে করা হয়। কিন্তু অচেতন বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে ঐগুলির ব্যক্তির প্রকৃত আচরণ-নির্ণয়ে বিশেষ ক্ষমতা নেই এবং বাস্তব ক্ষেত্রে অচেতনে নিহিত আবেগমূলক শক্তিগুলিই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে পরাজিত করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

৮। অচেতন প্রেষণা

আমাদের আচরণের পেছনে যে প্রেষণা বা ইচ্ছা থাকে সেটার প্রকৃত স্বরূপ যে প্রায়ই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে এই তথ্যটি অচেতনের মনোবিজ্ঞানের আর একটি দান। এর অর্থ হল যে আমাদের বহু আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় অচেতন প্রেষণার (unconscious motivation) দ্বারা। যেমন প্রতিক্ষেপণ, অপব্যাখ্যান

প্রভৃতি প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির ক্ষেত্রে আমাদের আচরণের প্রকৃত উৎস নিহিত থাকে আমাদের অচেতনের কোন অজ্ঞাত কামনায়।

৯। অবদমন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব

অবদমনের তথ্যটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক অনুশাসন, মাতাপিতার নিয়ন্ত্রণ, শাস্তির ভয় ইত্যাদি কারণে শিশু তার ইচ্ছাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে অচেতনে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং তার শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এই জন্য সুশিক্ষার প্রথম কর্মসূচী হল শিশুর ইচ্ছাকে যতদূর সম্ভব পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা যাতে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়।

১০। যৌন-শিক্ষা

অচেতনের মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার থেকেই আধুনিককালে যৌনশিক্ষাকে প্রাপ্তযৌবনদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। সব দেশের শিক্ষাবিদেরা উপলব্ধি করেছেন যে যৌনতা শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এবং তার ফলে যৌনমূলক শিক্ষা দেওয়াটা শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন :

1. Write an essay on—Unconscious and its bearing on the child's education.

2. Describe the characteristics of the Unconscious after Freud. How is it related to our conscious mind ?

3. Does the unconscious exert influences upon the conscious life ? Does the knowledge of the Psychology of Unconscious help the teacher to understand some generally unintelligible reactions of his pupils with advantage and to treat them in better way ?

4. Show how the psychology of the unconscious can explain some of the strange behaviours of pupils.

5. Write an eassy on :—The influence of the psycho-analytic school of psychology upon educational practices.

6. How has the psychology of unconscious helped the teacher in understanding the behaviour of the child ?

7. Discuss the nature of the Unconscious as conceived by Freud. What are the contents of the Unconscious ?

কুড়ি

অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conflict)

মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার প্রধানতম লক্ষণ হল অন্তর্দ্বন্দ্ব। মনের বিভিন্ন প্রবণতা ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদির মধ্যে যখন সামঞ্জস্য বজায় থাকে তখন ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি দেখা দেয় না। এই প্রক্ষোভমূলক সমতাই হল মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আর কোন কারণে যদি মনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয় তখনই মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির মধ্যে নানারকম মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব হল এই ধরনের মনের সমতানাশক একটি ঘটনা।

যখন মনের দুটি ইচ্ছা পরস্পরবিরোধী হয়ে ওঠে কিংবা যখন ব্যক্তির ইচ্ছা এবং বাইরের জগতের শক্তিগুলির মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয় তখন ব্যক্তির মনে যে অপ্রীতিকর প্রক্ষোভমূলক মনোভাব সৃষ্টি হয় তাকেই অন্তর্দ্বন্দ্ব বলা হয়ে থাকে। ব্যক্তির মধ্যে যখন দুটি ইচ্ছা পরস্পরবিরোধী হয় তখন দুটি ইচ্ছাকেই একসঙ্গে তৃপ্তি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না এবং তার ফলেই তার মধ্যে স্বভাবত একটি সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যাটির সমাধান করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে ব্যক্তির মনে অপ্রীতিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ না সে এই দুটি ইচ্ছার একটিকে ত্যাগ করতে পারছে ততক্ষণ তার মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং তার মানসিক সমতাও ক্ষুণ্ণ হয়। তেমনি আবার যখন ব্যক্তির ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধিতা দেখা দেয় তখনও ব্যক্তি তার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করতে পারে না এবং তার ফলে তার মধ্যে অতৃপ্তিজনিত অপ্রীতিকর মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষণবাদীদের মতে ব্যক্তির অচেতন মনের চাহিদা-গুলির সঙ্গে তার অহংসত্তার সংঘর্ষ দেখা দেয়। তার ফলে তার অচেতন স্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে এ অন্তর্দ্বন্দ্ব অচেতনেই নিহিত থাকে এবং ব্যক্তি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। কিন্তু এই অচেতন দ্বন্দ্ব যদিও ব্যক্তির সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় না, তবু তার ফল ব্যক্তির সচেতন আচরণ, মনোভাব প্রভৃতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে।

অতএব এদিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বকে আমরা দুশ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

যথা, সচেতন অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conscious Conflict) এবং অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্ব (Unconscious Conflict)। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে সত্যকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব একমাত্র অচেতনেই ঘটে থাকে।

পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টায় প্রতিটি শিশুর মধ্যে এমন কতকগুলি ইচ্ছা জন্মায় যার সবগুলিকে তৃপ্তি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিশু যদি মনে করে যে কোন বিশেষ বাধার (যা সত্যকারের হতে পারে আবার কাল্পনিকও হতে পারে) জন্য তার ইচ্ছাটি পূর্ণ হচ্ছে না তাহলে তার মধ্যে একটি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তার এই ইচ্ছার অতৃপ্তির জন্য সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তাই থেকে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে। এই ধরনের বাস্তবের সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত এবং তার ফলে ইচ্ছার অতৃপ্তি শিশু থেকে সুরু করে বয়স্ক ব্যক্তি সকলের জীবনেই প্রতিনিয়তই ঘটছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে অতি অল্প ক্ষেত্রেই সত্যকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্রতি ব্যক্তিকে প্রায়ই পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার সম্মুখীন হতে হয় এবং তখন সেই দুটি ইচ্ছার মধ্যে একটিকে তাকে বেছে নিতে হয়। ছোট শিশুর ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা বহু ঘটে থাকে। যেমন, মাঠে গিয়ে খেলা বা ঘরে বসে পড়া কোন্‌টা সে করবে কিংবা শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা বা ছবির বই দেখা কোন্ ইচ্ছাটা সে পূর্ণ করবে ইত্যাদি। কিন্তু এই ধরনের পরস্পরবিরোধী সকল ইচ্ছাকেই মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দ্বন্দ্ব বলা হয় না। অন্তর্দ্বন্দ্ব তখনই বলা হবে যখন কোন ইচ্ছার অতৃপ্তির ফলে ব্যক্তির মধ্যে একটা ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বোধ দেখা দেয় এবং তাই থেকে তার মধ্যে প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতা জাগে। প্রত্যেক মানুষকেই দৈনিক বহু সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতেই তাকে কোনও একটি বিশেষ পন্থাকে গ্রহণ আবার কোনটিকে বর্জন করতে হয়। কিন্তু তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না। যখনই ব্যক্তি তার ইচ্ছার অপূর্ণতার জন্য ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ও প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতা অনুভব করে তখনই তার মধ্যে প্রকৃত অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বলা চলে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি শৈশব থেকেই দেখা দেয়। যতদিন শিশুকে নিছক শারীরিক সংগতিবিধান করতে হয় ততদিন তাকে খুব বেশী অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু যে দিন থেকে সে সামাজিক হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য লোকের সংগে তাকে সংগতিবিধান করে চলতে হয় সেদিন থেকেই তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিতে সুরু করে। যে বিশেষ পরিস্থিতির সংগে শিশুকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় সে পরিস্থিতির

বৈচিত্র্য এবং যে সব লোকের সংগে তাকে মানিয়ে চলতে হয় তাদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিমাণ ও প্রকৃতি। যতই সে বড় হয়ে ওঠে ততই তার চাহিদাও সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে বেড়ে ওঠে এবং তখন সে অপরের সংগে নিজের সাফল্যের তুলনা করতে সুরু করে। যদি এই তুলনার ফল অপ্রীতিকর হয় তাহলে সে তার জন্য ব্যক্তিগত ব্যর্থতাকে দায়ী করে এবং তাই থেকেই তার মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব।

অন্তর্দ্বন্দ্বের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Conflict)

প্রকৃতির দিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ১। অভিগমন-পরিহারমূলক (Approach-avoidant) ২। যুগ্ম-অভিগমনমূলক (Double-approach) ৩। যুগ্ম-পরিহারমূলক (Double-avoidant)

অভিগমন-পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব তখনই দেখা দেয় যখন ব্যক্তি একই বস্তুকে একসঙ্গে গ্রহণ এবং বর্জন করার ইচ্ছা বোধ করে। যেমন সামাজিক ও ব্যক্তিগত কারণে ব্যক্তি বিয়ে করার ইচ্ছা বোধ করে আবার সেই সঙ্গে দায়িত্বের কথা স্মরণ করে বিয়েকে পরিহার করার ইচ্ছাও বোধ করে।

যুগ্ম-অভিগমনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে দুই বা তার বেশী বাঞ্ছিত লক্ষ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়। যেমন একদিকে কর্তব্যবোধ, অপর দিকে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কিংবা একদিকে নীতিবোধ অপরদিকে বাসনার তৃপ্তি ইত্যাদি বহু প্রকারের প্রতিযোগিতামূলক লক্ষ্যের মাঝে পড়ে ব্যক্তি অন্তর্দ্বন্দ্বের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

যুগ্ম-পরিহারমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে সেই পরিস্থিতিকে বোঝায় যখন ব্যক্তি দুটি অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছিত শক্তির মধ্যে গিয়ে পড়ে যার একটিকে গ্রহণ করতে সে বাধ্য হয়। যেমন, ব্যক্তিকে হয় বেকার থাকতে হবে নয় কোন অপ্রীতিকর কাজ গ্রহণ করতে হবে, হয় অবিবাহিত থাকতে হবে, নয় মনোমত নয় এমন মেয়ে বিয়ে করতে হবে।

বুদ্ধি এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব

বুদ্ধির সংগে অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। অন্তর্দ্বন্দ্বের সংখ্যা এবং জটিলতা অনেকখানি বুদ্ধির মাত্রার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধিমান শিশু অল্পবুদ্ধি শিশুর চেয়ে তার পরিবেশ সম্পর্কে অধিকতর সংবেদনশীল হয় এবং তার ফলে তার নিজের কামনা এবং পরিতৃপ্তির মধ্যে বৈষম্য সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন হয়ে থাকে।

উন্নত বুদ্ধি থাকার জন্য এই ধরনের শিশুরা তাদের পরিস্থিতিগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং অতি সহজেই নিজেদের ব্যর্থতা বা অসুবিধার কারণ নির্ণয় করতে পারে। এই কারণেই বুদ্ধিমান শিশুরা অল্পবুদ্ধি শিশুদের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বেশী ভোগে।

বুদ্ধিমান শিশুদের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন সংখ্যায় বেশী, তেমনি তারা নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসাও তাড়াতাড়ি করতে পারে। তাদের উন্নত বুদ্ধি, বিচার শক্তি ও পর্যবেক্ষণের ক্ষমতার দ্বারা তারা অতি সত্বর তাদের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধানে পৌঁছতে পারে। এই জন্য বুদ্ধিমান শিশুদের ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের মানসিক শক্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং সেগুলিকে শক্তিমান করে তুলতে সাহায্য করে। এই সব শিশুদের অন্তর্দ্বন্দ্ব নতুন নতুন বিষয়ে তাদের কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে, অধিকতর জ্ঞান অর্জনের উদ্বোধকরূপে কাজ করে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তাকে আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। এই সব কারণে যদিও মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব কাম্য নয় বরং অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করাই মানসিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য তবু কিছুটা পরিমাণ অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুর স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তা গঠনের জন্য অপরিহার্য। সাধারণ স্তরের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি যদি শিশুর মধ্যে দেখা না দেয় তাহলে তার মানসিক সমতা অক্ষুণ্ণ থাকে বটে কিন্তু কৌতূহল, শেখার ইচ্ছা, উচ্চাশা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সৃজনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতি ঈপ্সিত বৈশিষ্ট্যগুলি তার মধ্যে জাগার সুযোগ পায় না।

কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব তখনই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে যখন অনুভূতির দিক দিয়ে দ্বন্দ্বটি অতি তীব্র হয়ে ওঠে এবং শিশুর প্রক্ষোভমূলক সমতাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাছাড়া সময় সময় অন্তর্দ্বন্দ্বটির দ্রুত সমাধান করার চেষ্টায় শিশু অনুচিত ও অবাঞ্ছিত আচরণও সম্পন্ন করে। এ ক্ষেত্রেও অন্তর্দ্বন্দ্বটি শিশুর ব্যক্তিসত্তার পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের বশবর্তী হয়ে শিশু নিজের ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী আচরণ সম্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কোন শিশু হয়ত নিজেকে অন্যান্য শিশুর চেয়ে অক্ষম বা অকর্মণ্য বলে মনে করতে সুরু করে। তার ফলে নিজের প্রকৃত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তার মনে একটা ভুল ধারণা হয় এবং পরে সে একটি আত্মকেন্দ্রিক শিশু হয়ে ওঠে এবং সস্তা ধরনের কৃতিত্ব দেখিয়ে অপরের কাছ থেকে বাহবা পেতে চেষ্টা করে। সময় সময় এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে শিশুরা আক্রমণধর্মীও হয়ে ওঠে এবং কোনরূপ শৃঙ্খলা মানতে চায় না।

যে সব শিশু শারীরিক শক্তি বা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আর সকলের চেয়ে হীন তাদের মধ্যেও এই ধরনের ক্ষতিকর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই সব শিশু স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যবান ছেলেদের খেলাধূলায় যোগ দেয় না বরং নিজেদের হীনতা পূরণ করার জন্য তাদের চেয়ে ছোট বা হীনবল ছেলেমেয়েদের উপর নির্যাতন করে বা এমন সব আচরণ করে যাতে নিজেদের প্রতি অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপযুক্ত শিক্ষাদানের অভাবেই ঘটে থাকে এবং সুবিবেচনার সঙ্গে এই শিশুদের পরিচালনা করলে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর থাকে না।

যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব

যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব শৈশবকালের একটি অতি সাধারণ ঘটনা। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে কোন না কোন রকম যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে। যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ হল যৌনসংক্রান্ত তথ্যাদির বিকৃত পরিবেশন। অতি শৈশব থেকে শিশুর মধ্যে যৌনমূলক তথ্যাদি জানবার জন্য তীব্র কৌতূহল জাগে। পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি শিশুদের এই কৌতূহল কখনও মেটান না এবং প্রায়ই ভুল বা বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। অত্যন্ত বিবেচক পিতামাতা ও শিক্ষকেরাও এত সংক্ষিপ্ত ও ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে থাকেন যে তা থেকে তাদের কৌতূহল তৃপ্ত হওয়া দূরে থাকুক তাদের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই শিশুই যখন আবার ঐ একই ব্যাপার সম্পর্কে অন্য কোন উপায়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তখন তার মধ্যে স্বভাবতই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতির উপর তার একটা স্বাভাবিক বিশ্বাস থাকার জন্য তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে এবং যতই সে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করে ততই তার প্রক্ষোভ আরও সুতীব্র হয়ে ওঠে। সাধারণ সমাজে যৌনশিক্ষা দেবার কোন সুব্যবস্থা না থাকাতে শিশুর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সহজে দূর হয় না এবং দিনের পর দিন বেড়েই চলে।

খুব ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন কৌতূহল দেখা দেয়। বিশেষ করে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে দৈহিক পার্থক্যটা তাদের কাছে একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের এই কৌতূহল মেটাবার কোন রকম সন্তোষজনক পন্থা না থাকায় তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। শিশু যতই বড় হয় বিশেষ করে যখন সে প্রাপ্তযৌবন হয় তখন তার মধ্যে আরও নানারকম যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যৌনঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে প্রত্যেক সমাজেই নানা বিধিনিষেধ ও

অনুশাসন প্রচলিত আছে। এইগুলি অতি ছোট বয়স থেকেই শিশুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে তাদের পরিণত জীবনের যৌনমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি। যৌবনাগমে শিশুর মধ্যে যৌনকৌতূহল এত প্রবল হয়ে ওঠে যে সে নানা বিচিত্র ও অবাঞ্ছিত পন্থায় তার সেই যৌন কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করে এবং তার ফলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অপরাধবোধ দেখা দেয়।

হিতকর অন্তর্দ্বন্দ্ব

অন্তর্দ্বন্দ্বকে সব সময় অস্বাভাবিক এবং অবাঞ্ছিত বলা যায় না। প্রত্যেক শিশুর ক্ষেত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগা একটি অতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুকে অধিকতর সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার উচ্চাশাকে বাড়িয়ে তোলে। অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া কোন ব্যক্তিসত্তাই ভাল করে গড়ে ওঠে না এবং অন্তর্দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি সমস্ত পরিস্থিতিকেই বিনা প্রতিবাদে এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে থাকে।

ব্যক্তির কামনা এবং তার পরিতৃপ্তির মধ্যে যে বৈষম্য বা ব্যবধান দেখা যায় তাই থেকেই অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে। অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকলে ব্যক্তি তার কামনার পরিতৃপ্তির জন্য কোন চেষ্টা করত না এবং তার মধ্যে উদ্যম, উচ্চাশা প্রভৃতিও দেখা দিত না।

অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক মানুষ মাত্রের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং বুদ্ধি, বিচার-বোধ ও ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রয়োজন। যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকে কোন কিছু পেতে বা চেষ্টা করতে প্রবুদ্ধ করে এবং কোন বিশেষ কাজের পেছনে প্রেষণা জোগায় তাকেই আমরা হিতকর অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে পারি। তাছাড়া প্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে যে সব অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সেগুলিকেও আমরা হিতকর অন্তর্দ্বন্দ্বের পর্যায়ে ফেলতে পারি। কেননা সেগুলি ব্যক্তির মধ্যে সৃজনমূলক প্রচেষ্টার উদ্বোধকরূপে কাজ করে থাকে।

যদি কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব তীব্র না হয়ে ওঠে তাহলে সেটি ব্যক্তির কিছু না কিছু উপকার করেই। যেমন হীনমন্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকে অধিকতর প্রচেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার মধ্যে উদ্যম ও উৎসাহ এনে দেয়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে মানুষের সকল রকম কর্মপ্রচেষ্টা ও সাফল্যের মূলেই আছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড এ্যাডলারের মতে মানুষের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রাধান্য অর্জনের ইচ্ছা থেকে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাকেই ভিত্তি করে মানুষের সমস্ত সৃষ্টি ও অগ্রগতি গড়ে উঠেছে।

যে ব্যক্তি নিজেকে অপরের চেয়ে হীন বলে মনে করে সে নিজের দুর্বলতা বা হীনতাকে দূর কররার জন্য দ্বিগুণ তৎপর হয়ে ওঠে। একে আমরা পরিপূরক আচরণ বলতে পারি। এই ধরনের ব্যক্তির হাতের মধ্যে যত রকম উপায় বা সঙ্গতি আছে সে সবেরই সে প্রয়োগ করে থাকে তার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য। যে ব্যক্তি প্রথম খুব ভীরু বা লাজুক থাকে এবং অপরের সঙ্গে ভালভাবে মিশতে পারে না সে পরে তার এই দুর্বলতা দূর করার চেষ্টায় মিশুকে এবং সামাজিক হয়ে ওঠে।

এক কথায় অন্তর্দ্বন্দ্ব মাত্রেই ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে যদি ব্যক্তি অতিরিক্ত মাত্রায় তার প্রক্ষোভের দ্বারা অভিভূত না হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি নিজে নিজে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারে এবং তার প্রকৃত দুর্বলতা এবং অসুবিধা দূর করতে প্রয়াসী হয় তার কাছে অন্তর্দ্বন্দ্ব মঙ্গলকরই হয়ে ওঠে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান (Solution of Conflict)

শিশুর মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের আবির্ভাব একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে শিশু যখন বড় হয়ে গৃহ ও বিদ্যালয়ের সমাজধর্মী পরিবেশে প্রবেশ করে তখন নানা পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছা ও পরিস্থিতির সে সম্মুখীন হয় এবং তার ফলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি সহজে মীমাংসিত না হয় তাহলে শিশুর প্রক্ষোভমূলক সমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব শিক্ষাসূচী মাত্রেরই প্রধানতম লক্ষ্য হল যাতে শিশু তার অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা সুসমাধানে আসতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা। অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানের কয়েকটি পন্থার বর্ণনা দেওয়া হল।

সুবিবেচনা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে শিশুকে পরিচালিত করলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সন্তোষজনক মীমাংসা করা সম্ভব। মনে করা যাক কোন শিশু লেখাপড়ার ক্ষেত্রে নিজের সঙ্গে অপর কোন শিশুর তুলনা করে নিজেকে হেয় বলে মনে করল। তার ফলে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার পন্থারূপে শিশুটি ভাল করে লেখাপড়া সুরু করতে পারে এবং কিছু দিনের মধ্যে অপরের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। কিংবা যদি লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখানো তার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে সে খেলাধূলা, অভিনয়, অঙ্কন বা বিতর্ক ইত্যাদির কোন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ দেখিয়ে নিজের হীনমন্যতা দূর করতে পারে। এ দুয়ের একটি পথও যদি তার পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব না হয় তাহলে সে

অপরের মনোভাব বা মতামতকে অগ্রাহ্য করতে পারে এবং যেমন নিজের পছন্দমত চলছিল সেই রকম চলতে পারে। উপরের তিনটি উপায়েই শিশু তার অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারে। বলা বাহুল্য এই তিনটি পন্থার মধ্যে প্রথম দুটি পন্থা অপেক্ষাকৃত ভালো।

এই ধরনের আচরণগুলিকে পরিপূরক আচরণ বলা হয়। এইভাবে পরিপূরণের দ্বারা অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা যে অনেক সময় শিশুর পক্ষে কাম্য এবং মঙ্গলকর হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিপূরক আচরণের ক্ষেত্রে শিশু অপরের প্রশংসা পাবার জন্য কিংবা নিজের উৎকর্ষ প্রমাণিত করার জন্য তার কোন বিশেষ একটি দুর্বলতা বা ত্রুটিকে দূর করার চেষ্টা করে থাকে। তার ফলে শিশুর অগ্রগতি অধিকতর দ্রুত হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হীনতার পরিপূরণ করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে একটা প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং তার ফলে তার অগ্রগতি হওয়া দূরে থাকুক সে নানা রকম বাধা ও অসুবিধায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

অনেক সময় শিশুরা বিশেষ করে প্রাপ্তযৌবনেরা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর পন্থায় তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করার চেষ্টা করে। শিক্ষকদের এই সব ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ভাল না পারায় শিশুটি এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে যে বিদ্যালয়ের লেখা-পড়ার কোন মূল্যই নেই এবং বিদ্যালয় সংক্রান্ত সব ব্যাপার সম্পর্কেই সে উপহাস বিদ্রূপ করা সুরু করতে পারে। নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য শিশুটি এখানে পরিপূরক আচরণের সাহায্য নিল বটে কিন্তু সেই পরিপূরক আচরণটি কোন দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয় বা হিতকর নয়। অনেক শিশু আবার প্রকৃত ঘটনাটিকে বিকৃত করে নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করার চেষ্টা করে। কিন্তু এর ফলে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে কমলেও ভবিষ্যতে আবার তীব্র হয়ে ওঠে।

ক। পরিস্থিতির বিশ্লেষণ

এইজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার সব চেয়ে নিরাপদ ও কার্যকরী উপায় হল পরিস্থিতির পূর্বপরিকল্পিত বিশ্লেষণ। এর অর্থ হল, যে পরিস্থিতিটির উদ্ভব হওয়াতে ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিটিকে যদি স্থিরমস্তিষ্কে আগে থেকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে পরবর্তী কালের প্রক্ষোভ-মূলক উত্তেজনা ও অস্থিরতা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম থাকে এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বেরও একটা সুষ্ঠু মীমাংসা হয়। ব্যক্তিকে যে সব পরস্পরবিরোধী ঘটনা ও শক্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং তার নিজের ইচ্ছা এবং পরিতৃপ্তির মধ্যে যে সব বৈষম্য

দেখা দেয় সেগুলিকে সে ভালভাবে পরীক্ষা করতে শিখবে। তার পরিতৃপ্তির অভাবের মূলে কোন্ প্রতিকূল ঘটনা বা শক্তি আছে এবং তার সামর্থ্যের অভাবই বা কতখানি তার ব্যর্থতার জন্য দায়ী এই তথ্যগুলি যদি তার পরিষ্কারভাবে জানা থাকে তাহলে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব নিজে নিজেই দূর হয়ে যায়। এই ধরনের মানসিক বিশ্লেষণের দ্বারাই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর।

পিতামাতা শিক্ষক বা অন্যান্য বয়স্কদের উচিত শিশু যাতে নিজের প্রচেষ্টায় তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে শিক্ষা ও সাহায্য দেওয়া। উপযুক্ত আলোচনা ও পরামর্শের সাহায্যে শিশুর মনোভাবকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা সন্তোষজনক সমাধান নিজে থেকেই করতে পারে। যখন শিশুর মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে তার সমস্যাটি নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এ সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হল শিশুর বিশ্বাস অর্জন করা। সাধারণত যে সব শিশু প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতায় ভোগে তাদের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করা খুবই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ যদি শিশুর পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করা না যায় তাহলে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণটিও ঠিক জানা যাবে না এবং সেটিকে দূর করার ব্যবস্থা করাও সম্ভব হবে না।

সাধারণত শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করতে গিয়ে বয়স্করা দুটি ভুল করে বসেন। প্রথমত তাঁরা মনে করেন যে শিশুরা বড় হয়ে উঠলেই তাদের ছেলেবেলার প্রক্ষোভমূলক সমস্যাগুলি নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল। প্রক্ষোভমূলক সমস্যার যদি যথা সময়ে কোন সমাধান না করা হয় তাহলে শিশু যতই বড় হোক না কেন সেগুলি নিজে নিজে কোনদিনই দূর হবে না। পরিণত বয়সেও সেই সমস্যাগুলি ব্যক্তির মধ্যে থেকে যাবে এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করে তুলবে। সেই রকম বয়স্কদের আর একটি ভুল হল যে শিশুদের সঙ্গে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সময় তাঁরা প্রায়ই তাদের দুশ্চিন্তা ও সমস্যাগুলি ভুলে যেতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এটিও একটি ভুল উপদেশ। কোন মানুষই তার প্রক্ষোভজাত সমস্যা কখনই ভোলে না। সব সময়ই তার কিছু না কিছু প্রভাব মনের মধ্যে থেকে যাবেই।

শিশুদের সমস্যা ছোটই হোক আর বড়ই হোক প্রতিটি সমস্যাকেই বিনা দ্বিধায় ও অবিলম্বে সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। কোন সমস্যার বাহ্যিক প্রকাশ দেখে তার গুরুত্ব বিচার করা ভুল। কেননা বাহ্যিক অভিব্যক্তির উপর সব সময়

সমস্যাটির তীব্রতা বা আয়তন নির্ভর করে না। যথা সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান না হলে শিশু হয় সেটিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয় কিংবা অবাস্তব কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সেটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

খ। অবাস্তব কল্পনা ও দিবাস্বপ্ন

এর মধ্যে অবাস্তব কল্পনা এবং দিবাস্বপ্ন অন্তর্দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যাবার সবচেয়ে সহজ পন্থা। শিশু তার কামনার পরিতৃপ্তির চেষ্টায় বাস্তবে যে সব বাধার সম্মুখীন হয় দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সেগুলির অনুপস্থিতি সে কল্পনা করে নেয় এবং এইভাবে নিছক কল্পনার সাহায্যে সে তার যে কোন অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি আনতে পারে। কিন্তু অবাস্তব কল্পনা বা দিবাস্বপ্ন শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থায়ীভাবে মীমাংসা করতে পারে না। কল্পনার রাজ্য ছেড়ে তাকে এক সময় না এক সময় বাস্তবে নামতে হবে এবং তখনই তার মধ্যে ব্যর্থতা দেখা দেবে। তা ছাড়া অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসী হয়ে উঠলে শিশুর মধ্যে অনেক সময় অস্বাভাবিকতাও দেখা দিয়ে থাকে।

গ। অবদমন

অন্তর্দ্বন্দ্বের অবদমন মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অবদমনের ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা ত কোনরকম হয়ই না বরং তার প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতিগুলি মনের মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ তিক্ততা ও তীব্রতা নিয়ে নিহিত থাকে এবং সুযোগ পেলেই শিশুর সচেতন ও স্বাভাবিক আচরণকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের চিকিৎসা (Treatment of Conflict)

সন্তোষজনকভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করার সামর্থ্য নির্ভর করে জীবনে পরাজয়কে মেনে নেবার শক্তির উপর। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সহজে পরাজয়কে মেনে নিতে পারে না। সকলের মধ্যেই অসাধারণ কিছু হবার একটা স্বপ্ন ছেলেবেলা থেকেই থাকে। পরে যখন তারা বড় হয় তাদের এই স্বপ্ন এবং তাদের প্রকৃত সামর্থ্য এই দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান দেখা দেয়। তার ফলে তারা বহুক্ষেত্রেই ব্যর্থতাকে বরণ করতে বাধ্য হয় এবং তাই থেকেই তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নানা রকম প্রক্ষোভঘটিত সমস্যা। এই সব ব্যক্তিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করতে হলে তাদের চাহিদা ও সামর্থ্যের মধ্যে যে ব্যবধান সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের চাহিদাকে পুনর্গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অন্তর্দ্বন্দ্বের চিকিৎসার কয়েকটি পন্থার বর্ণনা দেওয়া হল।

ক। বিদ্যালয় পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ

এ ব্যাপারে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের সম্মিলিত কাজ-কর্মের মধ্যে দিয়ে এমন একটা সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করা যায় যে শিশুরা সেই পরিবেশে একসঙ্গে কাজ করে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে পারে এবং কারও মধ্যেই হীনমন্যতার মনোভাব বা অপরকে দমন করার প্রবণতা গড়ে ওঠে না। এদিক দিয়ে বিদ্যালয়কে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের একটি অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম করে তোলা যায়। শিশুকে যদি বাস্তবের সম্মুখীন হতে শেখান যায় এবং তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানর অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাকে যদি সচেতন করে তোলা যায় তাহলে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিজে নিজেই তার মন থেকে চলে যাবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে শিশুর সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী এমনভাবে পরিকল্পিত করতে হবে যাতে তার অস্বাভাবিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা কোনও দিক দিয়ে ব্যাহত না হয় এবং তার মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব না জাগে।

খ। প্রবোধন ও অনুভাবন (Persuasion and Suggestion)

অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন অতি গভীর ও তীব্র হয়ে দাঁড়ায় তখন শিক্ষক বা পিতামাতার পক্ষে তার চিকিৎসা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন মনশ্চিকিৎসকদের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। মনশ্চিকিৎকগণ অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরাময়ের জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করেন সেগুলির মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি প্রবোধন (Persuasion) এবং দ্বিতীয়টি অনুভাবন (Suggestion)। প্রবোধনের ক্ষেত্রে শিশুকে যুক্তির সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করা হয় যে সে যে সব অসুবিধা বা সমস্যা অনুভব করছে সেগুলির সত্যকারের কোন অস্তিত্ব নেই বা থাকলেও সেগুলিকে সে যতটা গুরুতর মনে করছে সেগুলি ততটা গুরুতর নয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে জাত প্রক্ষোভমূলক সমস্যা যখন খুব তীব্র হয়ে ওঠে তখন প্রবোধনে খুব কাজ হয় না। প্রবোধনের সাফল্য নির্ভর করে যুক্তির সাহায্যে সমস্যাটির বিচার করার উপর। কিন্তু ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রক্ষোভের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে তাহলে তার পক্ষে যুক্তি অনুসরণ করে কোন কিছু বিচার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

অনুভাবনও বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। সাধারণ পরামর্শ বা উপদেশ থেকে সুরু করে কোন বিশেষ ধারণা বা বিশ্বাস ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণত কার্যকরী এবং স্থায়ী অভিভাবন সম্মোহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিকে সম্মোহিত করে বলা হয় যে, সে যে সমস্যা

বা মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে কষ্ট পাচ্ছে, সেই সমস্যা বা মানসিক দ্বন্দ্ব সম্মোহন থেকে জেগে উঠলে তার আর থাকবে না। প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েদের কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মোহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব হলেও ছোট ছেলেমেয়েদের উপর এই প্রক্রিয়াটি কখনও প্রয়োগ করা যায় না। এই প্রক্রিয়াটি বয়স্কদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

গ। মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association)

মনঃসমীক্ষকগণ মনে করেন যে অন্তর্দ্বন্দ্ব মাত্রেই ব্যক্তির অচেতন মনে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং যতক্ষণ না অচেতনে নিহিত সেই অন্তর্দ্বন্দ্বর উৎসটির সন্ধান করতে পারা যাচ্ছে ততক্ষণ অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরাময় করা সম্ভব নয়। এর জন্য তাঁরা যে পদ্ধতিটির অনুসরণ করেন তার নাম মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association)। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে তার মনের সকল কথা বিনা বাধায় বলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তির প্রদত্ত সেই বিবরণ থেকে চিকিৎসক তার অচেতনে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বটির স্বরূপটি উদঘাটিত করেন। মনঃসমীক্ষকদের মতে ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে তার অচেতন থেকে সচেতনে তুলে আনতে পারলেই তার রোগের নিরাময় হয়ে যায়।

ঘ। স্বপ্নবিশ্লেষণ (Dream Analysis)

ফ্রয়েডের মতে অচেতনে পৌছবার রাজপথ হল স্বপ্ন। সেইজন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকগণ অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার জন্য ব্যক্তির স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে থাকেন। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় সেগুলির সাহায্যে তাঁরা ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত সংব্যাখ্যান করতে পারেন।

প্রশ্ন :

1. Wqat is a conflict. How does it develop in the child ? Describe measures for removing the conflict.

2. How does a conflict generate ? What are the ill effects of a conflict ? How can a conflict be solved ?

3. Discuss the role of conflict in the life of the child. How does a conflict help the child ?

একুশ

প্রতিরক্ষণ কৌশল বা সঙ্গতিবিধান কৌশল

(Defence Mechanisms or Adjustment Mechanisms)

মানুষের মনের মধ্যে সর্বদাই পরস্পরবিরোধী কতকগুলি শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। ফ্রয়েড এই শক্তিগুলির নাম দিয়েছেন অহম, ইদম্ ও অধিসত্তা। ইদম্ আমাদের নগ্ন ও অবদমিত কামনার প্রতীক। অধিসত্তা হল আমাদের অন্তরবাসী সমালোচক ও নৈতিক মনের ধারক। আর আমাদের নিজস্ব সত্তাটির নাম অহম্। এই তিনে মিলে মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তিপুঞ্জকে সৃষ্টি করেছে। আর মানুষের বাইরের শক্তি হল বাস্তব বা তার সামাজিক পরিবেশ। মানুষ যত সভ্য হচ্ছে ততই এই বাস্তব জটিল ও স্ফীতকায় হয়ে উঠছে। ফলে দিন দিন বাস্তবের শক্তিগুলিও বহুমুখী, তীব্র ও অদম্য হয়ে উঠছে।

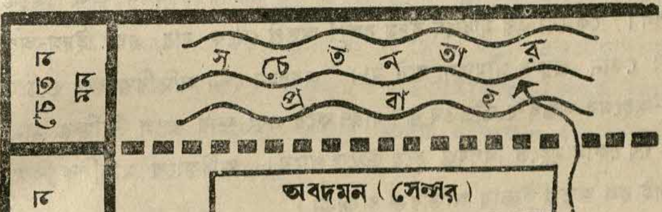
অহংকে তিনটি বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সর্বদাই সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয়, যথা, ইদম্, অধিসত্তা ও বাস্তব। কিন্তু ইদমের অধিকাংশ ইচ্ছাই বাস্তবের বিরোধী এবং অধিসত্তার দ্বারা অননুমোদিত। বাস্তবের চাপে ও অধিসত্তার অনুশাসনে অহম্ ইদমের কামনা বাসনাগুলির তৃপ্তি দিতে পারে না। কিন্তু বস্তুত সে কামনাগুলি অহমের নিজেরই কামনা এবং সেগুলির তৃপ্তিতে আনন্দ ও সন্তোষ পাবে অহম্ই। তার ফলে প্রায়ই এমন একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন অহমের অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। একদিকে সে ইদমের কামনাকে তৃপ্তি না দিয়েও পারে না, আবার অপর পক্ষে বাস্তবেরও বিরাগভাজন হতে পারে না, তখন অহংকে আত্মরক্ষার জন্য তার আচরণের ক্ষেত্রে কতকগুলি কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। এই কৌশলগুলিকে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) বলা হয়।

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু' প্রকারের হতে পারে। প্রথম, অবদমিত ইচ্ছাগুলির অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার প্রয়াস। আর দ্বিতীয় ইদমের ইচ্ছাগুলিকে আংশিক তৃপ্তিদান। বাস্তবের সঙ্গে সন্তোষজনক ভাবে নিজেকে মানিয়ে চলাও এই কৌশলগুলির আর একটি উদ্দেশ্য। এইজন্য এগুলিকে সঙ্গতি-বিধানের কৌশলও (Adjustment Mechanism) নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

অবদমন (Repression)

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় অবদমনের।

ইদমের কামনাগুলি তৃপ্তিলাভের জন্য নিয়তই তাদের আবেদন নিয়ে অহমের কাছে হাজির হয়। কিন্তু তাদের অসামাজিক ও নীতিবিরোধী প্রকৃতির জন্য অহমের পক্ষে সেগুলির তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব হয় না। তখন সেগুলিকে হয় আংশিক বা কৃত্রিম তৃপ্তি দিতে হয় কিংবা সেগুলিকে সম্পূর্ণ দাবিয়ে রাখতে হয়। এই দাবিয়ে রাখার কাজটিকে অবদমন বলে। সময় সময় চেতন মনেও এই ধরনের সমাজ-বিরোধী বা নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছা দেখা দেয়। তখনও অহম্ সেই ইচ্ছাটিকে তার অচেতনে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। অবদমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া এবং যে ইচ্ছা বা চিন্তাকে ব্যক্তি অবদমিত করে তার সম্বন্ধে পরে কোন সচেতনতা তার মধ্যে আর থাকে না। সেই ইচ্ছা বা চিন্তাটি চেতন স্তর থেকে নেমে এসে অচেতনে বাসা বাঁধে এবং তার ফলে ব্যক্তি সেই চিন্তা বা কামনাটি সম্পূর্ণ ভুলে যায়।



[চেতন মনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত কামনাবাসনাগুলি অচেতনে অবদমিত হয় এবং সেখান থেকে সচেতন স্তরে উঠে আসার বার বার চেষ্টা করে। কিন্তু অবদমনের শক্তি তাদের উপরে ওঠার সে প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। অবশ্য কোন অবদমিত কামনা কৌশলে অবদমনকে এড়িয়ে সচেতন স্তরে এসে পৌছয়।]

কিন্তু অচেতনে অবদমিত হলেও এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি তাদের শক্তি বা আবেদন একটুও হারায় না। অনেকটা টাইম বোমার মত সেগুলি অচেতনে

নিষ্ক্রিয় হয়ে অবস্থান করে এবং সময় ও সুযোগ পেলেই বিস্ফোরিত হয়। এই অননুমোদিত এবং বাতিল করা ইচ্ছাগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য অহংকে তাদের উপর একটা বাধা চাপিয়ে দিতে হয়। এই বাধার নাম দেওয়া হয়েছে সেন্সর। সেন্সরের কাজ হল ইদমের তৃপ্তিকামী ইচ্ছাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা। যে ইচ্ছাগুলি সেন্সরের বিচারে তৃপ্তিদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় সেগুলিকে সেন্সর সচেতনস্তরে প্রবেশের অধিকার দেয় এবং যেগুলি তার বিচারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেগুলিকে সে জোর করে দাবিয়ে রাখে। এক কথায় সেন্সর অবদমিত ইচ্ছাগুলির পাহারাদাররূপে কাজ করে।

অবদমনের কাজে অধিসত্তার ভূমিকা প্রচুর। যদিও অধিসত্তা সরাসরি নিজে কোন ইচ্ছাকে অবদমিত করতে পারে না এবং অবদমন করাটা একমাত্র অহমেরই কাজ, তবু অবদমনের প্রকৃতি নির্ধারণে অধিসত্তার অবস্থান সব চেয়ে বেশী। কোন্ ইচ্ছাটি চেতনে স্থান পাবার যোগ্য আর কোন্‌টি নয়, এটির চরম নিয়ন্ত্রক হল অধিসত্তা এবং সেন্সর পরিচালিত হয় অধিসত্তারই অনুশাসন অনুযায়ী।

প্রকৃতির দিক দিয়ে অবদমন হল সঙ্গতিবিধানের চরমতম এবং নিকৃষ্টতম কৌশল। কেননা এর মাধ্যমে ইদম্ সম্পূর্ণ অতৃপ্ত থেকে যায় এবং ইদম্-অহমের দ্বন্দ্বের কোন প্রকৃত মীমাংসা ঘটে না। অবদমন যখন অতিরিক্ত হয়ে ওঠে তখন ইদম্-অহমের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতম রূপ ধারণ করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক স্থৈর্য যে কোন মুহূর্তে বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ মানসিক বিকারের কারণই হল অতৃপ্ত ইচ্ছার অতিরিক্ত অবদমন।

প্রতিক্রিয়া সংগঠন (Reaction Formation)

কখনও কখনও কোন অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য ব্যক্তি সেই ইচ্ছার বিপরীত মনোভাবটি প্রকাশ করে বা প্রত্যাশিত আচরণের বিপরীত আচরণটি সম্পন্ন করে। এই কৌশলটিকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ অবদমিত যৌন-ইচ্ছা যৌন-ভীতির রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। ঈডিপাস কমপ্লেক্স বা কাস্ট্রেশন কমপ্লেকস থেকে জাত পিতার প্রতি বিদ্বেষ প্রতিক্রিয়া-সংগঠনের ফলে পিতার জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

অপব্যাখ্যান (Rationalisation)

যখন ব্যক্তি তার আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণের পরিবর্তে কোন ভুল বা মিথ্যা কারণ উপস্থাপিত করে তখন সেই কৌশলটিকে অপব্যাখ্যান বলা হয়ে থাকে।

এই কৌশলের দ্বারা অহম্ তার আচরণটির সত্যকার উদ্দেশ্য বা কারণটি প্রকাশ করার অবাঞ্ছিত কাজ থেকে রেহাই পায়। অবশ্য প্রকৃত কারণটা গোপন রেখে অন্য একটি কারণ উপস্থাপিত করার এই কাজটি সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই অহমের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে কারিগর তার নিজের অকর্মণ্যতার জন্য তার যন্ত্রপাতির দোষ দেয় বা যে নর্তকী তার নৃত্যকলায় অজ্ঞতার দায়িত্ব উঠোনের উপর চাপায়, সেই কারিগর বা নর্তকী নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অপব্যাখ্যানেরই আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আচরণে আমরা এই ধরনের বহু অপব্যাখ্যানের সাহায্য নিয়ে থাকি।

প্রতিক্ষেপণ (Projection)

প্রতিক্ষেপণ অপব্যাখ্যানের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র। এই কৌশলটিতে ব্যক্তি তার ইদমের অতৃপ্ত কামনাটি বাইরের জগতের উপর প্রতিক্ষিপ্ত করে। যেমন কোন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচেতন মনে নিহিত ঘৃণাটি প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে তার প্রতিই তার স্বামীর আসক্তি নেই বা স্বামীই তাকে ঘৃণা করে। মানসিক বিকৃতির অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগী নিপীড়নের বিভ্রান্তিতে (Delusion of Persecution) ভোগে। অর্থাৎ তার ধারণা হয় যে সকলেই তাকে নির্যাতন করছে। প্রকৃতপক্ষে তার অভ্যন্তরস্থ ধ্বংসাত্মক কামনাটি বা মরণ প্রবৃত্তিটি (Thanatos) বাইরের জগতে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে তার মধ্যে নিপীড়নমূলক বিভ্রান্তির রূপ নিয়েছে।

উন্নীতকরণ (Sublimation)

সঙ্গতিবিধানের কৌশলরূপে উন্নীতকরণই সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা অহমের পক্ষে ইদমের অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়। ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর সকল কামনার লক্ষ্যই যৌনমূলক। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সামাজিক অনুশাসনের চাপে লিবিডোর যৌনমূলক লক্ষ্যটিকে নিরুদ্ধ করে সেটিকে অন্যপথে পরিচালিত করতে বাধ্য হয় এবং এই ভাবে তার ঐ চাহিদাটির আংশিক তৃপ্তি লাভ করে। একেই উন্নীতকরণ প্রক্রিয়া বলে। কোন কামনাকে তার নিম্নশ্রেণীর লক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে কোন উচ্চশ্রেণীর লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল উন্নীতকরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য-নিরুদ্ধ যৌনশক্তি তখন সৃজনমূলক নানা কাজের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তিলাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যৌন-মিলনের ইচ্ছা উন্নীত হয়ে ক্লাব, পার্টি, সহনৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নর-নারীর মধ্যে

অবাধ মেলামেশায় পরিণত হয়েছে আক্রমণাত্মক কামনা, বক্সিং, কুস্তি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার রূপ নিয়েছে। দেখা গেছে যে এইভাবে লক্ষ্য-নিরুদ্ধ লিবিডোর শক্তি শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি, সামাজিক কার্যাবলী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, হবি প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

অবাস্তব কামনা এবং দিবাস্বপ্ন (Fantasy & Day-dreaming)

যে সকল ইচ্ছা বাস্তবে তৃপ্ত হয় না সেগুলিকে কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি আংশিকভাবে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অবদমিত বাসনাকে তৃপ্তিদানের এই কৌশলটি খুবই সহজ এবং সকলেরই আয়ত্তাধীন। অনেক সময় অতৃপ্ত যৌন-কামনাও অযৌন রূপ নিয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

প্রাপ্তযৌবনের ক্ষেত্রে দিবাস্বপ্ন সঙ্গতিবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য অস্ত্র। তাদের নানা কামনা বাস্তবের রূঢ় পরিবেশে ব্যাহত হয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। যে সব ব্যক্তি জীবনযুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে না, তারাও এই ভাবে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতাকে ভোলার চেষ্টা করে। এদিক দিয়ে দিবাস্বপ্নের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না এবং এটি ব্যক্তির অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তির একটি নির্দোষ মাধ্যম রূপে তার সঙ্গতিবিধানে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। অবশ্য অতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন কোনও দিক দিয়েই কাম্য নয়। নিছক নিষ্ক্রিয়ভাবে দিবাস্বপ্নে মগ্ন থাকলে ব্যক্তি তার উদ্যম, প্রেরণা ও কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে।

রূপান্তরকরণ (Conversion)

কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছা কোনও বিশেষ শারীরিক অভিব্যক্তির রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে রূপান্তর-করণ বলা হয়। যেমন রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার (Conversion Hysteria) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোনও শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটেছে। একটি মেয়ে দীর্ঘদিন তার অসুস্থ পিতার সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল। অথচ পিতার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ একটুও কমল না। ফলে জন্ম নিল মানসিক দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে মেয়েটির একটি হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে।

এখানে তার পিতাকে সেবা করার মানসিক অনিচ্ছাটি শারীরিক লক্ষণ নিয়ে তার মধ্যে দিল।

অভেদীকরণ (Identification)

এটিও একটি ইদমের কামনাকে আংশিক তৃপ্তি দেবার পন্থাবিশেষ। এই কৌশলের দ্বারা ব্যক্তি অপরের সঙ্গে বা অপরের কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেকে বা নিজের কৃতিত্বকে অভিন্ন বলে মনে করে তৃপ্তি পায়। শৈশবে শিশু তার পিতার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে তৃপ্তি লাভ করে। আমরাও যে আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করি সেটিও একটি অভেদীকরণের দৃষ্টান্ত।

প্রত্যাবৃত্তি (Regression)

লিবিডো যখন বাস্তবের কোন বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তখন সে বর্তমানকে ত্যাগ করে অতীতের শৈশবে ফিরে যায় এবং শৈশবের যে সকল আচরণে সে আনন্দ পেত সেই সকল আচরণ সম্পন্ন করতে সুরু করে। হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মনোবিকারের ক্ষেত্রে এই রকম লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি প্রায়ই ঘটে থাকে। দেখা গেছে যে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী নিজের হাতে খাবার খেতে পারছে না বা নিজে নিজে পোষাক পরতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির লিবিডো তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে তার শৈশবের আচরণে প্রত্যাবর্তন করেছে।

আসক্তি-সঞ্চালন (Transference)

মনোবিকারের রোগীদের অচেতন বিশ্লেষণ করার সময় মনঃসমীক্ষকগণ প্রায়ই দেখেন যে রোগীদের প্রাথমিক আসক্তির পাত্র থেকে তাদের প্রক্ষোভ বিচ্যুত হয়ে চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের প্রকৃত আসক্তির পাত্রের জায়গায় চিকিৎসককেই তাদের আসক্তির পাত্র করে তুলেছে। যেমন হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর আসক্তির পাত্র হল তার মা বা বাবা। হিষ্টিরিয়া রোগীকে যখন মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে চিকিৎসা করা হয় তখন দেখা যায় যে তার সেই ঈডিপাস কমপ্লেক্স জনিত আসক্তি মা বা বাবাকে ত্যাগ করে চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়েছে। একেই আসক্তি সঞ্চালন বলা হয়।

অবাধ মেলামেশায় পরিণত হয়েছে আক্রমণাত্মক কামনা, বক্সিং, কুস্তি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার রূপ নিয়েছে। দেখা গেছে যে এইভাবে লক্ষ্য-নিরুদ্ধ লিবিডোর শক্তি শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি, সামাজিক কার্যাবলী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, হবি প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

অবাস্তব কামনা এবং দিবাস্বপ্ন

(Fantasy & Day-dreaming)

যে সকল ইচ্ছা বাস্তবে তৃপ্ত হয় না সেগুলিকে কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি আংশিকভাবে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অবদমিত বাসনাকে তৃপ্তিদানের এই কৌশলটি খুবই সহজ এবং সকলেরই আয়ত্তাধীন। অনেক সময় অতৃপ্ত যৌন-কামনাও অযৌন রূপ নিয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

প্রাপ্তযৌবনের ক্ষেত্রে দিবাস্বপ্ন সঙ্গতিবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য অস্ত্র। তাদের নানা কামনা বাস্তবের রূঢ় পরিবেশে ব্যাহত হয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। যে সব ব্যক্তি জীবনযুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে না, তারাও এই ভাবে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতাকে ভোলার চেষ্টা করে। এদিক দিয়ে দিবাস্বপ্নের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না এবং এটি ব্যক্তির অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তির একটি নির্দোষ মাধ্যম রূপে তার সঙ্গতিবিধানে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। অবশ্য অতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন কোনও দিক দিয়েই কাম্য নয়। নিছক নিষ্ক্রিয়ভাবে দিবাস্বপ্নে মগ্ন থাকলে ব্যক্তি তার উদ্যম, প্রেরণা ও কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে।

রূপান্তরকরণ (Conversion)

কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছা কোনও বিশেষ শারীরিক অভিব্যক্তির রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে রূপান্তর-করণ বলা হয়। যেমন রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার (Conversion Hysteria) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোনও শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটেছে। একটি মেয়ে দীর্ঘদিন তার অসুস্থ পিতার সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল। অথচ পিতার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ একটুও কমল না। ফলে জন্ম নিল মানসিক দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে মেয়েটির একটি হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে।

এখানে তার পিতাকে সেবা করার মানসিক অনিচ্ছাটি শারীরিক লক্ষণ নিয়ে তার মধ্যে দিল।

অভেদীকরণ (Identification)

এটিও একটি ইদমের কামনাকে আংশিক তৃপ্তি দেবার পন্থাবিশেষ। এই কৌশলের দ্বারা ব্যক্তি অপরের সঙ্গে বা অপরের কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেকে বা নিজের কৃতিত্বকে অভিন্ন বলে মনে করে তৃপ্তি পায়। শৈশবে শিশু তার পিতার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে তৃপ্তি লাভ করে। আমরাও যে আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করি সেটিও একটি অভেদীকরণের দৃষ্টান্ত।

প্রত্যাবৃত্তি (Regression)

লিবিডো যখন বাস্তবের কোন বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তখন সে বর্তমানকে ত্যাগ করে অতীতের শৈশবে ফিরে যায় এবং শৈশবের যে সকল আচরণে সে আনন্দ পেত সেই সকল আচরণ সম্পন্ন করতে সুরু করে। হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মনোবিকারের ক্ষেত্রে এই রকম লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি প্রায়ই ঘটে থাকে। দেখা গেছে যে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী নিজের হাতে খাবার খেতে পারছে না বা নিজে নিজে পোষাক পরতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির লিবিডো তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে তার শৈশবের আচরণে প্রত্যাবর্তন করেছে।

আসক্তি-সঞ্চালন (Transference)

মনোবিকারের রোগীদের অচেতন বিশ্লেষণ করার সময় মনঃসমীক্ষকগণ প্রায়ই দেখেন যে রোগীদের প্রাথমিক আসক্তির পাত্র থেকে তাদের প্রক্ষোভ বিচ্যুত হয়ে চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের প্রকৃত আসক্তির পাত্রের জায়গায় চিকিৎসককেই তাদের আসক্তির পাত্র করে তুলেছে। যেমন হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর আসক্তির পাত্র হল তার মা বা বাবা। হিষ্টিরিয়া রোগীকে যখন মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে চিকিৎসা করা হয় তখন দেখা যায় যে তার সেই ঈডিপাস কমপ্লেক্স জনিত আসক্তি মা বা বাবাকে ত্যাগ করে চিকিৎসকের উপর সঞ্চালিত হয়েছে। একেই আসক্তি সঞ্চালন বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ

1. What is a Defence Mechanism ? Name a few defence mechanisms with illustrations.

2. Why and when does the individual take to defence mechanisms ? Why are they also known as adjustment mechanisms ?

3. Write notes on :—

Repression, Regression, Rationalisation, Identification, Projection, Reaction Formation, Conversion and Transference.

বাইশ

মানসিক ব্যাহতি বা ক্ষীণবুদ্ধিতা

(Mental Retardation or Feeblemindedness)

প্রত্যেক জনসমাজেই এমন এক দল ব্যক্তি পাওয়া যায় যারা সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের মত মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে না। এদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণী দেখা যায়। কেউ কেউ সাধারণ দৈনন্দিন কাজকর্ম ভাল করে করতে পারে না, কথাবার্তা ভাল করে বুঝতে পারে না এবং ভালমত ধারণা গঠন করতে পারে না। আবার একদল আছে যারা মোটামুটি নিজেদের কাজকর্ম চালাতে পারলেও লেখাপড়ার দিক দিয়ে মোটেই সুবিধা করতে পারে না। এদের মনোবিজ্ঞানে নানারকম নাম দেওয়া হয়ে থাকে যেমন ক্ষীণবুদ্ধি, মানসিক ব্যাহতি-সম্পন্ন, উনমানসিক ইত্যাদি। জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা কত ভাগ মানসিক ব্যাহতি-সম্পন্ন ব্যক্তি থাকে তা নির্ভর করছে আমরা স্বাভাবিক এবং ব্যাহত ব্যক্তির মধ্যে সীমারেখাটা কোথায় স্থাপন করি তার উপর। সাধারণত I. Q. বা বুদ্ধ্যঙ্কের মানের দ্বারাই বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে ৭০'র নীচে I. Q. হলে তাকে মানসিক ব্যাহতিসম্পন্নের শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। ৭০'র বেশী অথচ ১০০'র কম I. Q. সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বুদ্ধিতে কম হলেও তাদের মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তির পর্যায়ে ফেলা হয় না। কারণ তারা মোটামুটিভাবে স্বল্পমাত্রার সাফল্যের সঙ্গে তাদের সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে। এদের আমরা নির্বোধ (Dull) বা সীমারেখাবর্তী (Borderline) বলে বর্ণনা করতে পারি।

মানসিক ব্যাহতির শ্রেণীবিভাগ

যারা প্রকৃতপক্ষে মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন অর্থাৎ যাদের I. Q. ৭০'র নীচে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে যথা—মোরোন (Moron) বা স্বল্পব্যাহতিসম্পন্ন, যাদের I. Q. ৫০ থেকে ৭০, ইমবেসাইল (Imbecile) বা মধ্যমব্যাহতিসম্পন্ন, যাদের I. Q. ৩৫ থেকে ৫০ এবং জড় বা ইডিয়ট (Idiot) বা গুরুতর ব্যাহতিসম্পন্ন, যাদের I.Q. ৩৫'র নীচে।

মোরোন (Moron)

ব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মোরোন বা স্বল্প মাত্রার ব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এরা মানসিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে আনুমানিক ৮ থেকে ১১ বছরের শিশুর সমতুল্য জ্ঞানমূলক স্তরে বড় জোর পৌছতে পারে।

ইমবেসাইল (Imbecile)

ইমবেসাইল বা মধ্যম ব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু কিছু দৈহিক অসঙ্গতিও দেখা যায়। ৪ থেকে ৯ বছরের শিশুদের সমতুল্য সামাজিক পরিণতির চেয়ে উচ্চতর স্তরে তারা পৌছতে পারে না। তারা অবশ্য কথাবার্তা বলতে শেখে এবং নিজেদের চাহিদা বাক্যে প্রকাশ করতে পারে কিন্তু লেখাপড়া কিছুই করতে পারে না। তারা সাধারণ বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারলেও কোনও জটিল পরিস্থিতিতে পড়লে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। খুব সাধারণ ও বাস্তবধর্মী কাজ কিছু কিছু তারা করতে পারে। নিজেদের প্রয়োজন তারা নিজেরা মেটাতে পারে না এবং এ দিক দিয়ে তারা একান্তভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল। এদের চিকিৎসাগারে রাখা বাঞ্ছনীয় হলেও অপরিহার্য নয়।

ইডিয়ট (Idiot)

জড় বা গুরুতর মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসাগারে রাখা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তাদের মনের পরিণতি একেবারে প্রাথমিক স্তরে থাকে এবং তাদের মধ্যে তীব্রমাত্রায় ইন্দ্রিয়ঘটিত ও সঞ্চালনমূলক ব্যাহতি, দৈহিক অসঙ্গতি এবং গুরুতর মাত্রার ব্যাধিপ্রবণতা দেখা যায়। এরা নিজেদের সাধারণ চাহিদা তৃপ্তি করার দায়িত্বও নিতে পারে না, এমন কি সাধারণ বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পর্যন্ত পারে না।

চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক দিয়ে আবার মানসিক ব্যাহতি দু'শ্রেণীর হতে পারে। সহজাত মানসিক উনতা (Primary Mental Deficiency) এবং অর্জিত মানসিক উনতা (Secondary Mental Deficiency)।

সহজাত মানসিক উনতা (Primary Mental Deficiency)

সহজাত মানসিক উনতার শ্রেণীতে পড়ে পরিবারগত মানসিক উনতা (Familial Mental Deficiency), স্নায়ুগত পারিবারিক বুদ্ধিহীনতা (Amaurotic Family Idiocy) এবং ফেনিলপিরুভিক অলিগোফ্রেনিয়া (Phenylpyruvic Oligophrenia)।

এই তিন ধরনের মানসিক ব্যাহতির কারণই জন্মের সময় থেকেই জননকোষের মধ্যে কিংবা জননকোষের পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকে এবং সেই জন্য এগুলিকে সহজাত শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। এগুলির মধ্যে পরিবারগত মানসিক উনতাই বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায়। দেখা গেছে যে পরিবারের মধ্যে মানসিক ব্যাহতি থাকলে সেই পরিবারের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে কোনও অঙ্গগত বা পারিবেশিক কারণ ছাড়াই মানসিক ব্যাহতি দেখা দেয়। এ্যামোরটিক ফ্যামিলি ইডিয়সির ক্ষেত্রে জননকোষের সুপ্ত থাকা কালীন অবস্থায় কোন প্রক্রিয়ার ফলে স্নায়ুগত রোগ দেখা দেয় এবং তা থেকে স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার হঠাৎ অবনতি ঘটে এবং মানসিক ব্যাহতির সৃষ্টি হয়। ফেনিলপিরুভিক অলিগোফ্রেনিয়ায় কোনও বংশধারাগত দোষের জন্য স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

অর্জিত মানসিক উনতা (Secondary Mental Deficiency)

অর্জিত মানসিক উনতাও নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন মোঙ্গলত্ব বা মোঙ্গলিজম্ (Mongolism), ক্রেটিনত্ব বা ক্রেটিনিজম (Cretinism), ক্ষুদ্রমস্তকত্ব বা মাইক্রোসেফালি (Microcephaly), বৃহৎমস্তকত্ব বা ম্যাক্রোসেফালি (Macrocephaly), জলমস্তিকত্ব বা হাইড্রোসেফালি (Hydrocephaly)। এই সব মানসিক উনতার ক্ষেত্রগুলি ভূমিষ্ঠ হবার আগে শিশুর মধ্যে দেখা দেয়।

মোঙ্গলত্ব (Mongolism)

মোঙ্গল জাতীয় লোকেদের মত চোখ বাঁকা থাকে বলে এই মানসিক ব্যাহতির শ্রেণীকে মোঙ্গলিজম্ বা মোঙ্গলত্ব নাম দেওয়া হয়েছে। এরা সাধারণত মধ্যমাত্রার মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন বা ইমবেসাইল শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। এদের মানসিক পরিণতি পাঁচ বছর বয়সেই সীমাবদ্ধ থাকে। মোঙ্গলয়েডরা সাধারণত স্নেহশীল প্রকৃতির হয় এবং আশপাশের সকলের আচরণের অনুকরণ করে। মায়ের কোন গ্রন্থিগত ত্রুটির জন্য শিশুর মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় বলে চিকিৎসকেরা মনে ক'রে থাকেন। সাধারণত এদের আয়ু দশ বৎসর পর্যন্ত হয়ে থাকে, তবে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির সাহায্যে এদের আয়ু বাড়ান সম্ভব হয়েছে।

ক্রেটিনত্ব (Cretinism)

সাধারণত থাইরয়েড গ্রন্থির ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য ক্রেটিনত্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে মায়ের খাদ্যে আয়োডিন কম হলে শিশুর মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ক্রেটিনদের কতকগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন, বামনাকৃতি

দেহ, পুরু চোখের পাতা, শুকনো গায়ের চামড়া, প্রচুর কালো চুল এবং বহিরুদ্গত উদরপ্রদেশ ইত্যাদি। ইডিয়ট বা ইমবেসাইল উভয় শ্রেণীর ক্ষীণবুদ্ধিই ক্রেটিনদের মধ্যে দেখা যায়। এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক স্তরে যদি থাইরয়েড চিকিৎসা করা যায় তাহলে ক্রেটিনত্ব সেরে যেতে পারে।

ক্ষুদ্রমস্তকত্ব (Microcephaly)

এই ধরনের ক্ষীণবুদ্ধিদের মাথার গঠন স্বাভাবিক আকৃতির চেয়ে ছোট হয়ে থাকে বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। মাথার খুলির আকৃতি ছোট হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের তন্তুগুলি ভাল করে বিকাশ লাভ করতে পারে না। ক্ষুদ্রমস্তকত্ব ঘটার কারণ এখনও সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় নি। এরা সাধারণত হয় ইডিয়ট, নয় ইমবেসাইলের শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। এরা কোনও কোনও হাতের কাজ শিখলেও ভাষামূলক কোন দক্ষতা এদের মধ্যে জন্মায় না। ডাক্তারী চিকিৎসায় এদের ক্ষেত্রে কোনও ফল পাওয়া যায় না।

বৃহৎমস্তকত্ব (Macrocephlay)

গ্লিয়া নামক কোষের (Glia cell) অস্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকে এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এই কোষগুলির মধ্যে কোনও স্নায়ু-উত্তেজনা থাকে না। এদের কাজ হল নিছক শরীরের বিভিন্ন কাঠামোগুলিকে খাড়া থাকতে সাহায্য করা। এগুলির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে মস্তিষ্কের কাঠামোটি বেড়ে যায়। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কোনও কারণ জানা যায় নি। তবে ডাক্তারী চিকিৎসায় কোনও ফল হয় না।

জলমস্তকত্ব (Hydrocephaly)

মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকুলার প্রণালীতে বাধার সৃষ্টির ফলে মাথার খুলির মধ্যে অস্বাভাবিক পরিমাণে সেরিব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইড জমে যায়। তার ফলে মস্তিষ্কের তন্তুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মাথার আকৃতি স্ফীত হয়ে ওঠে। তাই থেকে মানসিক ব্যাহতি দেখা দেয়।

জলমস্তকসম্পন্ন রোগীরা স্নেহশীল ও সংযত প্রকৃতির হয়ে থাকে। আধুনিক শল্যচিকিৎসার সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে জলমস্তকত্ব দূর করাও সম্ভব হয়েছে।

জন্মকালীন আঘাত (Birth Trauma)

উপরের মানসিক ব্যাহতির ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও জন্মোত্তর আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে মানসিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। যেমন, দেখা গেছে যে হাসপাতালে মানসিক ঊনতার যতগুলি ক্ষেত্র আসে সেগুলির মধ্যে শতকরা ৬ থেকে ১০ জনের মানসিক ব্যাহতি সৃষ্টির কারণ হল জন্মকালীন আঘাতপ্রাপ্তি।

কষ্টকর প্রসব, দুর্ঘটনা, কিংবা নবজাতকের প্রতি ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি কারণ থেকে মস্তিষ্কে রক্তপাত হয়ে মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া প্রসবকালে এমন সব ত্রুটি বা অসঙ্গতি ঘটতে পারে যা থেকেও শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত লাগতে পারে বা তার মধ্যে কোনও স্থায়ী ত্রুটি থেকে যেতে পারে। তাই আঘাতপ্রাপ্ত শিশুর মানসিক ব্যাহতির মাত্রা নির্ভর করবে কি পরিমাণে তার মস্তিষ্ক আঘাত পেয়েছে তার উপর।

জন্মোত্তর মস্তিষ্কের আঘাত (Postnatal Head Injury)

জন্মের পর মস্তিষ্কের আঘাত থেকে মানসিক ব্যাহতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্র খুব বেশী পাওয়া যায় না। সাধারণত প্রতি হাজার মানসিক ব্যাহতিসম্পন্নের ক্ষেত্রের মধ্যে ১৫ জনের বেশী মস্তিষ্কের আঘাত থেকে জাত ক্ষেত্র দেখা যায় না। মস্তিষ্কের আঘাতজাত মানসিক ব্যাহতির ক্ষেত্রে শিশু অস্থির ও অতি-উত্তেজনাসম্পন্ন হয় এবং সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সাধারণত প্রত্যক্ষণমূলক অসুবিধা দেখা যায় এবং অমূর্ত চিন্তার সম্পাদনে তারা অক্ষমতা বোধ করে। তাদের শিখন ক্ষমতা বিশেষ হ্রাস পায় না তবে বিভিন্ন মানসিক কাজ সম্পাদনে তারা স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে পেছিয়ে থাকে। মস্তিষ্কের আঘাতজাত মানসিক ব্যাহতির ক্ষেত্রগুলিকে প্রকৃত মানসিক উনতার ক্ষেত্র বলে মনে করা ঠিক হবে না। কেননা এদের মধ্যে যে মানসিক ব্যাহতি বা অক্ষমতা দেখা যায় তা ইন্দ্রিয়মূলক বা সঞ্চালনমূলক ত্রুটি থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, সত্যকারের মানসিক অক্ষমতা থেকে সৃষ্টি হয় না।

জন্মোত্তর সংক্রামক ব্যাধি (Postnatal Infectious Diseases)

সেরিব্রো-স্পাইনাল মেনিনজাইটিস, এনসেফালাইটিস প্রভৃতি গুরুতর ধরনের শৈশবকালীন সংক্রামক ব্যাধি থেকে মানসিক ব্যাহতি দেখা দেয়। শেষের ব্যাধি থেকে সময় সময় ব্যক্তিসত্তার বিপর্যয়ও দেখা যায়। সাম্প্রতিক কোন কোন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে হুপিংকাশি, হাম, মাম্প্স, জলবসন্ত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকেও শিশুর মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং তার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে।

মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা

মানসিক ব্যাহতির কোনও কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে এ ধরনের ব্যক্তির সঙ্গতি-

বিধানের মানকে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে যদি ব্যাহতির প্রকৃতি ধরা না যায় তাহলে কোনও প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগে সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।

তবে বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা দিয়ে তাদের অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন করার চেষ্টা বর্তমানে প্রগতিশীল দেশ মাত্রেই চলেছে। এখন প্রশ্ন হল মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কি না এবং সম্ভব হলে কোন মান পর্যন্ত তাদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

স্বল্পবুদ্ধি ও সীমারেখাবর্তীদের শিক্ষা
(Education of the Dull and the Borderline)

বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাপের দিক দিয়ে আমরা দেখেছি যে ৯০ থেকে ১১০ I. Q. সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্নের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। এদের ঠিক নীচে যারা তাদের স্বল্পবুদ্ধি (dull) বলা হয়। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০। এর নীচে আছে সীমারেখাবর্তীরা (Borderline), এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ থেকে ৮০। স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্নদের নিম্ন স্তরের এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিদের যে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও উচ্চ শিক্ষা লাভ করা এদের সামর্থ্যের বাইরে তবু বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পৌছান বা সাফল্যের সঙ্গে তা অতিক্রম করা এদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। ইর্তাদ (Itrad) ও সেগুঁই'র (Seguin) বিশদ পরীক্ষণ থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই সীমারেখাবর্তী ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ভাল ভাবেই পাশ করতে পারে। আজকাল আধুনিক সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই স্বল্পবুদ্ধি ও সীমারেখাবর্তী ছেলেমেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র ও বিশেষধর্মী শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে তাদের একসঙ্গে রেখে লেখা পড়া শেখানর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ত্রি-ধারা পদ্ধতি (Three Stream Method) এই ধরনের একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে মেধাবী, সাধারণ এবং স্বল্প-বুদ্ধিদের একই বিদ্যালয়ে রেখে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে প্রতি শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের তাদের মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী তিনটি ধারা বা প্রবাহে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি ধারা বা প্রবাহে স্বতন্ত্র শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। এর ফলে স্বল্পবুদ্ধিদের মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর হয়। এমন কি প্রয়োজন হলে সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনাটিকেও তাদের প্রয়োজন

মত পুনর্গঠিত করা যেতে পারে। এদের জন্য অনেকে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেন। কিন্তু তার দুটি অসুবিধা আছে। প্রথমত স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে এদের পড়ার ব্যবস্থা করলে এদের মধ্যে যে হীনমন্যতার সৃষ্টি হবে তার মনোবৈজ্ঞানিক গুরুত্ব অবহেলনীয় নয়। তাদের যদি মনে মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে তারা সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে হেয় তাহলে এই মনোভাব তাদের সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে অবাঞ্ছিত ভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং তার ফলে বিশেষ বিদ্যালয় গঠনের দ্বারা শিক্ষার দিক দিয়ে যে সুফল পাওয়া যাবে প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক দিক দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী কুফলের সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত, একাধিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে ৭০ থেকে ৯০ বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগের মত। অতএব এই ধরনের মানসিক সামর্থ্য সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সংখ্যা কম হবে না। এদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে সে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম দাঁড়াবে না। আর্থিক সংগতি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা প্রভৃতির দিক দিয়ে এদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা সাধারণ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না।

প্রকৃত পক্ষে বিশেষজ্ঞেরা স্বল্পবুদ্ধি বা সীমারেখাবর্তীদের মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন শিশুদের পর্যায়ে ফেলেন না। সত্যকারের মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন বলতে তাদেরই বোঝায় যাদের আমরা ইতিপূর্বে ক্ষীণবুদ্ধি বলে বর্ণনা করেছি এবং যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক উপরের দিকে সবচেয়ে বেশী হল ৭০ এবং নীচের দিকে ৩৫'রও কম হতে পারে।

বস্তুত শিক্ষার সত্যকারের সমস্যা এদেরই নিয়ে। এদের স্বাভাবিক বুদ্ধি-সম্পন্নদের সংগে একই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। এরা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন বা ঈষৎ ব্যাহতিসম্পন্নদের চেয়ে মানসিক যোগ্যতার দিক দিয়ে এতই পেছিয়ে থাকে যে এদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

শিক্ষার যোগ্যতার দিক দিয়ে বিচার করে বিশেষজ্ঞেরা ক্ষীণবুদ্ধিদের তিন-শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন।

প্রথম, যে সব ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানে রাখা অপরিহার্য।

দ্বিতীয়, যে সব ক্ষীণবুদ্ধিদের বাড়ীতে রেখেই শিক্ষা দেওয়া যায়।

তৃতীয়, যে সব ক্ষীণবুদ্ধিদের বিশেষ ভাবে পরিচালিত বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

জড়বুদ্ধিদের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষা
(Institutionalised Education of the Idiots)

যে সব শিশুর মানসিক ব্যাহতির মাত্রা বেশ গুরুতর অর্থাৎ যাদের জড় বলে আমরা বর্ণনা করেছি (৩৫'র নীচে **I. Q.**) তাদের প্রায়ই বিশেষ প্রতিষ্ঠানে রেখে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তবে আজকাল ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে বিশেষজ্ঞেরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে গুরুতর মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন শিশুদের অনেককেই বিশেষ প্রতিষ্ঠানে না রেখেও শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে। তবে যে সব শিশুর ক্ষেত্রে মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক যত্ন নেওয়া বা ডাক্তারী চিকিৎসারও প্রয়োজন থাকে তাদের এই সব প্রতিষ্ঠানে না রেখে উপায় নেই। তাছাড়া বাড়ীর পরিবেশ যদি সম্পূর্ণ অনুকূল না হয় বা পিতামাতা যদি শিশুর দেখাশোনার ভার নিতে অক্ষম হন তাহলে সেক্ষেত্রেও শিশুকে প্রতিষ্ঠানে রাখতে হয়।

এই ধরনের ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর সঙ্গতিবিধানের স্তর যতটা সম্ভব উন্নত করে তোলা। এই জড়বুদ্ধিদের কোনও উচ্চ-স্তরের চিন্তাধর্মী শিক্ষা দেওয়া যে সম্ভব নয় তা বলা বাহুল্য। এদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল যতটা এদের সঞ্চালনমূলক ও জ্ঞানমূলক সামর্থ্যের উৎকর্ষসাধন করা সম্ভব তার চেষ্টা করা। সাধারণত জড়বুদ্ধিদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকে এবং তাদের জন্য শারীরিক যত্ন ও সময় মত সুচিকিৎসার আয়োজন করা এদের শিক্ষাসূচীর একটি প্রধান অঙ্গ।

এই শ্রেণীর মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন শিশুরা শিক্ষণযোগ্যের স্তরে পড়ে না বা এদের এমন কোনও রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় যা লাভ করে এরা পরে সমাজে নিজস্ব জীবনযাপন করতে পারে। এরা চিরকালই পরনির্ভর হয়ে থাকে। তবে সুপরিকল্পিত শিক্ষার সাহায্যে এদের কিছুটা স্বাবলম্বী করে তোলা যেতে পারে।

জড়বুদ্ধিদের জন্য বিশেষ প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে নীচের বিষয়গুলি প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে। যেমন—

১। ভাষার বিকাশ ২। সঞ্চালনমূলক বিকাশ ৩। স্বাবলম্বন শিক্ষা ৪। স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তার নিয়মকানুন শিক্ষা, ৫। মানসিক বিকাশ। ৬। শিল্প ও কলার অনুশীলন। ৭। নাট্যাভিনয়।

উন্নয়নযোগ্য ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা
(Education of the Trainable Mentally Retarded)

এই পর্যায়ে পড়ে সেই সব ক্ষীণবুদ্ধি যারা সত্যকারের শিক্ষণযোগ্যের স্তরে না পড়লেও নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিশেষ করে বিভিন্ন শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করার সামর্থ্য রাখে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণত ৩৫ থেকে ৫০'র মধ্যে থাকে। এদের কোনও জ্ঞানমূলক বা চিন্তামূলক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে জড়বুদ্ধিদের মত এদের প্রতিষ্ঠানভুক্ত করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না। এরা বাড়ীতে থেকে এবং নিয়মিত দিবাকালীন বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে কিছু কিছু শিল্পে দক্ষতা লাভ করতে পারে। তবে আবাসিক শিক্ষায়তনে এদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই সব চেয়ে ভাল।

এদের শিক্ষার কর্মসূচীর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সেগুলি হল—

(১) ভাষার বিকাশ (২) সঞ্চালনমূলক বিকাশ (৩) মানসিক বিকাশ (৪) ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষসাধন (৫) সঙ্গীত (৬) স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তা (৭) সমাজবিদ্যা (৮) স্বাবলম্বন (৯) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (১০) সামাজিকীকরণ (১১) শিল্প ও কলা (১২) নাট্যাভিনয় এবং (১৩) বৈজ্ঞানিক ধারণার সৃষ্টি।

এগুলির মধ্যে সবচেয়ে জোর দেওয়া হয় ভাষার বিকাশের উপর। প্রায় ক্ষেত্রেই ক্ষীণবুদ্ধিদের ভাষার দুর্বলতা বিশেষ গুরুতর প্রকৃতির হতে দেখা যায়। বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে যাতে তাদের ভাষাকথনের উন্নতিসাধন করা যায় তার চেষ্টা করা হয়। তার পরে আসে তাদের দৈহিক সঞ্চালনের বিকাশ। গুরুতর মানসিক ব্যাহতির ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক সঞ্চালনের প্রক্রিয়ার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকে। এই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করে যাতে সে স্বাভাবিকভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করতে পারে তার জন্য তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। মানসিক বিকাশের কর্মসূচীতে তার ব্যাহত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক পথে যাতে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য সুচিন্তিত পন্থার অবলম্বন করা হয়। চিন্তন, কল্পন, তুলনাকরণ, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক কাজগুলির ছোট ছোট সমস্যা দিয়ে তাকে তার মানসিক বিকাশের ব্যাহতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা হয়। এর সঙ্গে থাকে সঙ্গীত চর্চা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তার নিয়মাবলী পালন করা, সমাজবিদ্যার অনুশীলন, স্বাবলম্বী হবার অভ্যাস,

ব্যক্তিগত শিক্ষা, সামাজিকীকরণ, শিল্প ও কলার চর্চা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যাবলী।

উন্নয়নযোগ্য ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য যে সব আধুনিক শিক্ষায়তন তৈরী হয়েছে সেগুলিতে এই ধরনের পাঠ্যসূচী অনুসরণ করায় খুবই আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই স্তরের ক্ষীণবুদ্ধিরা এমনই অগ্রগতি দেখিয়েছে যে তাদের উন্নততর শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষণযোগ্য ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা
(Education of the Educable Mentally Retarded)

এই স্তরের ক্ষীণবুদ্ধিদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ থেকে ৭০'র মধ্যে। এদের মোটামুটিভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, যদিও কোনও অমূর্তধর্মী বা উন্নত চিন্তামূলক শিক্ষা এদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের দরকার হয় না। সাধারণ প্রচলিত বিদ্যালয়েতেই বিশেষভাবে পরিকল্পিত ক্লাসের মাধ্যমে এদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সহজ প্রকৃতির চিহ্নাদি পড়া, গণনা করা প্রভৃতি মৌলিক দক্ষতাগুলি এরা আয়ত্ত করতে পারে। এদের মধ্যে যারা উন্নত ধরনের তারা সহজ ধরনের বৃত্তির অনুসরণ করতে পারে এবং কিছু পরিমাণে আত্মনির্ভরতাও আহরণ করতে সমর্থ হয়।

পাঠক্রমের প্রধান উপাদান

শিক্ষণযোগ্য ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত ক্লাশে সাধারণত যে সব কাজকে ভিত্তি করে পাঠক্রমটি পরিকল্পিত হয় সেগুলির একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

১। মৌখিক এবং লিখিত যোগাযোগ
২। আন্তর্গোষ্ঠী সম্পর্ক
৩। টাকাকড়ির হিসাব রাখা
৪। পরিমাপ করা
৫। প্রকৃতিকে বোঝা
৬। সমাজকে বোঝা
৭। জীবিকা অর্জন করা
৮। গৃহস্থলীর কাজকর্ম শেখা
৯। বেড়ানো
১০। অবসর সময় যাপন করা
১১। নিরাপদে বাস করা
১২। ব্যক্তিগত পর্যাপ্তবোধ গঠন করা
১৩। সৌন্দর্য উপভোগ ও উপলব্ধি করা

এই সব কাজকে ভিত্তি করে শিক্ষণযোগ্য ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির একটি তালিকা দেওয়া হল।

১। যোগাযোগমূলক শিল্প (Communicative Arts)

২। বাস্তবভিত্তিক শিল্প (Practical Arts)

৩। অবসরবিনোদনমূলক শিল্প (Leisure Time Arts)

৪। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science)

৫। সমাজ বিজ্ঞান (Social Science)

৬। গৃহবিকাশমূলক শিল্প (Domestic Arts)

৭। গণনামূলক বিজ্ঞান (Computational Science)

যে সব শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ থেকে ৭০, বিশেষ করে যাদের ৬০ থেকে ৭০'র মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে উপরের পাঠক্রম অনুসরণ করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে।

অনেক বিদ্যালয়ে ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষণীয় বিষয় ও দক্ষতাগুলিকে চারটি ব্যাপকধর্মী শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—১। পরিবারগত, সামাজিক ও নাগরিক দক্ষতা, ২। কাজের সু-অভ্যাস ও দক্ষতা ৩। অতি-প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক দক্ষতা এবং ৪। ব্যক্তিগত ও সমাজগত সঙ্গতিবিধান।

১। পরিবারগত, সামাজিক ও নাগরিক দক্ষতা

ক্ষীণবুদ্ধিদের এই সব বিশেষ ক্লাশে প্রায় অর্ধেকের মত মেয়ে থাকে। তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য কাজগুলি শেখা খুব দরকার। ছেলেদের মধ্যে যারা অবিবাহিত থাকবে তাদেরও রান্না করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, জিনিষপত্র মেরামত করা, বাজার করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি শেখা খুব দরকার। তাছাড়া ক্ষীণবুদ্ধিদের প্রত্যেকেরই নাগরিকোচিত অধিকার এবং দায়িত্ব শেখাও খুব দরকার। সেই সঙ্গে সামাজিক সংগঠন সম্পর্কেও তাদের মোটামুটি জ্ঞানের আয়োজন করাও শিক্ষাসূচীর অন্তর্গত।

২। কাজের সু-অভ্যাস ও দক্ষতা

কাজের দক্ষতা ও সু-অভ্যাস অর্জন করাও ক্ষীণবুদ্ধিদের পাঠক্রমের আর একটি প্রধান অঙ্গ। শিক্ষার শেষে পরিণত জীবনে যাতে ক্ষীণবুদ্ধিরা কার্যকরীভাবে কোনও বৃত্তিতে নিযুক্ত হতে পারে তার জন্য তাদের মধ্যে কাজের সু-অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং বিশেষ দক্ষতা সৃষ্টির আয়োজন করতে হবে। এর জন্য ক্ষীণবুদ্ধিদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং তাদের কর্মদক্ষতার মান যাতে উন্নত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন হস্তশিল্পের মধ্যে দিয়ে

কর্মদক্ষতার উন্নত মান সৃষ্টি করা যেতে পারে। তবে কয়েকটি বিশেষ শিল্প শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষকদের কাজ হবে না, এই শিল্পগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের উপকরণ হয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। অতি-প্রয়োজনীয় জ্ঞানমূলক দক্ষতা

বৃত্তিমূলক দক্ষতার মতই প্রয়োজনীয় হল জ্ঞানমূলক দক্ষতা। কতকগুলি জ্ঞানমূলক দক্ষতা সভ্য ও সার্থক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। শিক্ষণযোগ্য ক্ষীণবুদ্ধিরা মোটামুটিভাবে তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার মানে পৌছতে পারে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০ বা ৬০'র উপরে তারা সাক্ষর বয়স্কের স্তরে গিয়ে পৌছানর ক্ষমতা রাখে। এদের জ্ঞানমূলক দক্ষতার পাঠক্রমের প্রধান উপাদান হল যোগাযোগমূলক কৌশলগুলি। প্রাক্‌শিক্ষার স্তরে এই সব শিশুদের কথা বলা, কথা শোনা, অপরের কথা বোঝা, নিজের বক্তব্য অপরকে বোঝান প্রভৃতি সামাজিক যোগাযোগের পন্থাগুলি শেখান হয়। প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের পাঠদানের আগে এই প্রক্রিয়াগুলি যাতে তারা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশ থেকে শিশুরা যাতে সুসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পটভূমিকা গঠন করতে পারে সে দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

এই ভাবে ক্ষীণবুদ্ধিদের মানসিক সামর্থ্য পর্যাপ্তভাবে গড়ে উঠলে (অনেকের মতে মানসিক বয়স অন্তত ৬½ হলে) তাদের সুনিয়মিতভাবে প্রত্যক্ষ শিক্ষণ দেওয়া সুরু করতে হবে। পঠন, বানান শিখন এবং লিখন হবে এই প্রত্যক্ষ শিক্ষণের প্রধান পাঠক্রম। গণনামূলক বিজ্ঞান বলতে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পাটিগণিতকেই প্রধানত বোঝায়। তার সঙ্গে টাকাকড়ির ব্যবহার করা, ঘড়ি দেখতে শেখা, সাধারণ মাপজোপ করা প্রভৃতি বাস্তব সমস্যাগুলিও অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষার্থীর চারপাশে যে প্রাকৃতিক এবং জৈবিক জগৎ আছে তার সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞানলাভ করা দরকার। গাছপালা, জীবজন্তু, আবহাওয়া এবং বিদ্যুৎ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিও যাতে তারা জানতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এদের মধ্যে যারা উন্নত মানসিক সামর্থ্যের অধিকারী তারা যাতে বিদেশী মানুষ, বিদেশের ভাষা, জটিলতর গাণিতিক বিষয় এবং অন্যান্য জ্ঞানমূলক দক্ষতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

৪। ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধান

সমাজে সার্থক ও কার্যকরী জীবন যাপন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুষ্ঠু ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধান। কিন্তু সাধারণ সব সমাজেই ব্যক্তির মানসিক সামর্থ্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অবশ্যম্ভাবী-ভাবেই অপরের উপহাস ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে দিন কাটায়। সেইজন্য যাতে তারা নিজেদের বুঝতে ও মেনে নিতে, সমাজের অপরের সমর্থন পেতে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা গড়ে তুলতে পারে তার জন্য বিদ্যালয়ে তাদের বিশেষভাবে সাহায্য দিতে হবে। আর একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। সাধারণত ক্ষীণবুদ্ধিরা অতি সহজেই সমাজবিরোধী কাজের দিকে ঝোঁকে। সেইজন্য তাদের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা গঠনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। ক্ষীণবুদ্ধিদের অমূর্ত ব্যাপার বুঝতে স্বাভাবিকভাবেই অসুবিধা হয়। আর ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য একটি বেশ জটিল বিষয়। এই পার্থক্য নির্ণয় করতে তাদের কষ্ট হওয়া খুবই সম্ভব। এই জন্য বিদ্যালয়েই দৈনন্দিন জীবন-যাপনের একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় তাদের অভ্যস্ত করে তুলতে হবে যাতে তারা সহজে তা থেকে ভ্রষ্ট না হয়। এই সঙ্গে তাদের মধ্যে মানবীয় মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে একটা বোধ গড়ে তুলতে হবে, সমাজ অনুমোদিত আচরণ ধারা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের সীমিত সামর্থ্যের উপযোগী পূর্ণ ও সার্থক জীবনের একটি পরিকল্পনা তাদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। বিশেষ যত্ন নিতে হবে যাতে ক্ষীণবুদ্ধিরা অবসর বিনোদনের উপযোগী শিল্পকলা আয়ত্ত করতে পারে, ছবি শিখতে পারে এবং সমাজের নানা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। তারাও যাতে জনকল্যাণমূলক সামাজিক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করার আনন্দ লাভ করতে পারে তার সুযোগ তাদের দিতে হবে।

প্রশ্ন :

1. Who are mentally retarded ? What should be the methods of teaching them ?

2. Discuss the different types of the mentally deficient ? How for are they educable ?

3. Give a brief account of the different modes of teaching the mentally deficient.

তেইশ

শিক্ষায় অনগ্রসরতা (Educational Backwardness)

শিক্ষার বহু সমস্যার মধ্যে অনগ্রসরতার সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই দেখা যায় যে নিয়মিত যোগদান সত্ত্বেও কোন কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে সমর্থ হয় না। এই সব ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তারা তাদের সহপাঠীদের চেয়ে লেখাপড়ায় আগে থেকেই পশ্চাৎপদ হয়ে আছে এবং যখন ক্লাসের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা উপযুক্ত চেষ্টা সত্ত্বেও অকৃতকার্য হয়ে একই ক্লাসে পড়ে থাকছে। কেউ কেউ দু এক বছর চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এই সব ছেলেমেয়েদের অনগ্রসরতার বিশেষ গুরুতর কারণ থাকতে পারে। তাদের সমস্যা বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সমস্যার সঙ্গে এক করে ফেলা উচিত নয়। আর তাদের সমস্যাগুলির যথোচিত ব্যবস্থা না করতে পারলে এই সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবন ত বটেই সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ও ক্ষীণবুদ্ধিতা

যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় তারা লেখাপড়ায় যে অনগ্রসর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষীণবুদ্ধি ছেলে তার বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য লেখাপড়ায় প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারে না। তাদের অনগ্রসরতা কোন সাময়িক বা অস্বাভাবিক কারণ থেকে জন্মায় না। বিশেষ পন্থার সাহায্যে ক্ষীণবুদ্ধিদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করা হলেও তাদের অনগ্রসরতা পুরোপুরি কখনই দূর করা যায় না এবং স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের তুলনায় তারা সব সময়ই অনগ্রসর থাকে। ক্ষীণবুদ্ধিজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা এবং অস্বাভাবিক কারণজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা[১] দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি তাদের অনগ্রসরতার সমস্যা এই আলোচনার বিষয়বস্তু

১। মানসিক ব্যাহতিসম্পন্ন বা ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা। পৃঃ ২৭৭ দ্রষ্টব্য।

অনগ্রসরতার প্রকৃতি

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা দু-শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম সর্বাত্মক, দ্বিতীয় বিষয়মূলক। যখন শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় সব কটি বিষয়েতেই অন্যান্য ছেলেমেয়ের তুলনায় পশ্চাৎপদ থাকে তখন তাকে সর্বাত্মক অনগ্রসরতা বলা যায়। আর যখন একটি বা একাধিক বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয়, তখন তাকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা যায়। সর্বাত্মক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে সব কটি বিষয়তেই শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ থাকে কিন্তু বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি বা দুটি বিষয়েতে শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ হয়। যেমন, ইংরাজীতে কিংবা অঙ্কে কিংবা অন্য কোন পাঠ্য বিষয়ে ক্লাশের অন্য সকলের চেয়ে শিক্ষার্থী পেছিয়ে থাকতে পারে।

অনগ্রসরতার কারণ (Causes af Backwardness)

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা নানা কারণে দেখা দিতে পারে। আমরা দেখেছি যে ক্ষীণবুদ্ধিতার জন্য শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা দেখা দেয়। সেজন্য যখনই কোন অনগ্রসরতার ক্ষেত্র দেখা যাবে তখনই প্রথমে দেখতে হবে তার মূলে ক্ষীণবুদ্ধিতা আছে কিনা। ক্ষীণবুদ্ধিতা থাকলে তার জন্য স্বতন্ত্র বিশেষধর্মী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু ক্ষীণবুদ্ধিতা ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে অনগ্রসরতা দেখা দেয় তবে তা দূর করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। সর্বাত্মক অনগ্রসরতা কতকগুলি সাধারণ ঘটনা বা কারণ থেকে জন্মায়। নীচে সর্বাত্মক অনগ্রসরতার প্রধান কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হল।

সর্বাত্মক অনগ্রসরতার কারণ

(Causes of General Backwardness)

(ক) দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য শিশু অনেক সময় লেখাপড়ায় অনগ্রসর হতে পারে। স্বাস্থ্য দুর্বল হলে শিশু প্রয়োজন মত পর্যাপ্ত পরিশ্রম করতে পারে না এবং এজন্য সে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়াশোনায় পেছিয়ে পড়তে পারে।

(খ) অনেক সময় চোখ বা কানের অসুখের জন্য শিশু ক্লাসে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। চোখে কম দেখলে শিশু ভাল করে বোর্ড দেখতে পায় না এবং কানে কম শুনলে শিক্ষকের পড়া ভালো করে শুনতে পায় না। ফলে ক্লাশের অগ্রগতির সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারে না। এই দোষগুলি যথাসময়ে দূর না করলে শিশুর লেখাপড়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

(গ) প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ অনগ্রসরতার একটি বড় কারণ। কোন বিশেষ ঘটনা, আচরণ, ব্যক্তি বা পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ দেখা দিতে পারে। তার ফলে তার পড়াশোনা স্বাভাবিক পথে এগোয় না এবং স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ফলও পাওয়া যায় না।

(ঘ) অনেক সময়ে কোন স্থায়ী বা প্রলম্বিত রোগের জন্য শিশুর মধ্যে অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে। বহুদিন কোন রোগে ভুগলে নানা কারণে লেখাপড়া ঠিকমত হয়ে ওঠে না এবং শিশু আর সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে।

(ঙ) কোন বিশেষ কারণে বিদ্যালয়ে বহুদিন অনুপস্থিত থাকলে শিশু ক্লাশের পড়ায় আর সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে। একবার বেশ খানিকটা পেছিয়ে পড়লে তার পক্ষে সেই অপঠিত অংশগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় না। তার ফলে তার মধ্যে স্থায়ী অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(চ) শিশুর পক্ষে অনুপযোগী পাঠক্রম অনগ্রসরতার আর একটি কারণ। পাঠক্রমটি যদি শিক্ষার্থীর সামর্থ্যাতীত হয় বা তার বিশেষ চাহিদা মেটাতে সেটি সক্ষম না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা প্রক্রিয়াটিই দুরূহ হয়ে ওঠে এবং তার ফলে অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(ছ) প্রতিকূল পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে অনেক সময় অনগ্রসরতা দেখা দেয়। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যদি শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল না হয় তাহলে সে শিক্ষা শিশুর কাছে বিরক্তিকর ও আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। যে সব বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা অত্যন্ত নিপীড়নমূলক এবং শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্রিক সেখানে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে।

(জ) অনুপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি অনগ্রসরতার আর একটি বড় কারণ। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষক যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেন সেটি মনোবিজ্ঞানের বিচারে নানাদিক দিয়ে খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার্থীরা সে শিক্ষা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষাগ্রহণ কার্যকরী হয় না এবং পরীক্ষাতেও তারা ভালো ফল দেখাতে পারে না।

(ঝ) প্রতিকূল গৃহপরিবেশকে অনগ্রসরতার একটা বড় কারণ বলে ধরতে হবে। শিশু যে গৃহে মানুষ হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশে সে বড় হয় এবং যে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে মেলামেশা করে, ঐ শিশুর ব্যক্তিসত্তার উপর তাদের অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। মা, বাবা, ভাই বোন, বাইরের সঙ্গী সঙ্গিনী

প্রতিবেশী প্রভৃতির প্রভাব যদি শিক্ষার অনুকূল না হয় তাহলে শিশু লেখাপড়ায় অনগ্রসর হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার কারণ

(Causes of Subject Backwardness)

কোন বিশেষ একটি বিষয়ে যখন শিশু পশ্চাদ্‌পদ হয়ে পড়ে তখন তাকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা হয়। যেমন, দেখা গেল যে শিশু আর সব বিষয়ে ভাল কিন্তু ইংরাজী বা অঙ্কে কাঁচা। সাধারণত বিষয়মূলক অনগ্রসরতা কতকগুলি বিশেষধর্মী কারণের জন্য দেখা দেয়। নীচে তার কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

(ক) বিষয়টির উপর কোন বিশেষ কারণবশত শিশুর প্রথম থেকেই বিরাগ থাকতে পারে বা বিষয়টি শিশুর পছন্দমত না হতে পারে। সমস্ত শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে প্রক্ষোভমূলক সমতার উপর। যদি কোন কারণে বিষয়টির উপর শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিরূপতার সৃষ্টি হয়, তাহলে ঐ বিষয়টির প্রতি শিশুর প্রতিকূল মনোভাব দেখা দেবে এবং কালক্রমে সে ঐ বিষয়টিতে অনগ্রসর হয়ে উঠবে। এই ধরনের বিষয়মূলক বিরাগ নানা কারণে দেখা দিতে পারে। পিতামাতা-শিক্ষকের মনোভাব, পরিবেশের প্রভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি বস্তুগুলি কোনও বিশেষ পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনোভাবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

(খ) শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটির জন্য বহুক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিশু অনগ্রসর হয়ে ওঠে। অনেক সময় প্রচলিত শিক্ষণপদ্ধতি নানা দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক প্রথায় পদ্ধতিমূলক গবেষণা খুবই সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত হয়েছে। এতদিন যে সব পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে এসেছে সেগুলির মধ্যে বর্তমানে বহু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির জন্য বহু শিশুর ক্ষেত্রে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ইংরাজী ও অঙ্কে বহু ছেলেমেয়ে অনগ্রসর হবার একটা বড় কারণ হল যে এ বিষয় দুটিতে প্রায়ই অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

(গ) অনেক সময় শিক্ষকের আচরণ বা মনোভাবের জন্য ঐ শিক্ষক যে বিষয়টি পড়ান সেই বিষয়টির উপর শিক্ষার্থীর বিরাগ সৃষ্টি হতে পারে। কোনও বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক যদি অনুপযোগী এবং অবিচক্ষণ হন তাহলে শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়টির

প্রতি প্রতিকূল-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(ঘ) বিদ্যালয় পরিবেশের জন্যও শিশুদের মধ্যে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে। অসামাজিক আবহাওয়া, অতিরিক্ত শৃঙ্খলামূলক নিয়মকানুন প্রভৃতি কারণে শিশু কোনও কোনও বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়ে।

(ঙ) বিষয়মূলক অনগ্রসরতা সৃষ্টির একটা বড় কারণ হল প্রতিকূলধর্মী অনুবর্তনের সৃষ্টি। অর্থাৎ কোনও কারণে শিশুর মধ্যে ঐ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে বিরক্তি বা বিরাগ অনুবর্তিত হয়ে পড়তে পারে। এই অনুবর্তনের মূলে কোন ব্যক্তির অনুদার আচরণ বা কোন বিশেষ আঘাতাত্মক ঘটনা বা বিদ্যালয় পরিবেশের কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।

(চ) বিশেষ কোন বিষয়ের ক্লাশে বহুদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয়ে উঠতে পারে।

অনগ্রসরতা দূর করার উপায়

অনগ্রসরতা দূর করতে হলে নীচের প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

নিরাময়মূলক পন্থা (Curative Measures)

প্রথমত, দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত কারণটি কি এবং সেই কারণটি দূর করার যথাযথ আয়োজন করতে হবে। যেমন, যদি দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতা বা ইন্দ্রিয়জনিত কোন দুর্বলতা বা প্রলম্বিত ব্যাধির জন্য শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়েছে তাহলে ঐ বিশেষ কারণটি দূর করলেই তার অনগ্রসরতাও দূর হয়ে যাবে। যদি কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অনুপযোগী পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনগ্রসরতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে পদ্ধতির উন্নয়ন করলেই তার অনগ্রসরতাও দূর হয়ে যাবে। সেই রকম যদি অনুপযোগী পাঠক্রম, প্রতিকূল পরিবেশ বা কোন ঘটনাজনিত বিরাগ প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীর মধ্যে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে ঐ কারণটি দূর করাই অনগ্রসরতা নিরাকরণের একমাত্র উপায়।

যে সব ক্ষেত্রে প্রক্ষোভজনিত প্রতিরোধ থেকে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয় সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মন থেকে ঐ প্রতিরোধ দূর করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধের প্রকৃত কারণটি বার করতে হবে এবং সেই কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থীর মন থেকে প্রক্ষোভমূলক বিরূপতাও দূর হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন শিশুর বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষকমণ্ডলী কিংবা লেখাপড়ার প্রতি মনে ঘৃণা বা ভয় বা বিরাগের সৃষ্টি হয় তাহলে তার মন থেকে এই বিরূপ প্রক্ষোভটি দূর করতে পারলে শিক্ষার প্রতি তার অনুকূল মনোভাব দেখা দেবে।

প্রতিষেধমূলক পন্থা (Preventive Measures)

সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা যাতে লেখাপড়ায় অনগ্রসর না হয়ে ওঠে তার জন্য নীচের প্রতিষেধমূলক পন্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

(ক) শিশু যে গৃহে বড় হয় সেই গৃহ পরিবেশকে সমুন্নত করা উচিত। শিশুর শিক্ষা তার গৃহ পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তার প্রক্ষোভমূলক সমতা তার গৃহের আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গৃহ পরিবেশ উন্নত হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকবে এবং শিশুর মধ্যে অনগ্রসরতা কম দেখা দেবে। যে গৃহ কলহ, বিবাদ, দারিদ্র্য, অনাচার প্রভৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত সে গৃহে শিশুর শিক্ষাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(খ) শিক্ষায় অনগ্রসরতা দূর করতে হলে শিক্ষণপদ্ধতিটিকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। অধিকাংশ অনগ্রসরতাই ভুল শিক্ষণপদ্ধতির জন্য দেখা দিয়ে থাকে। অতএব শিক্ষার পদ্ধতিকে আধুনিক গবেষণাভিত্তিক ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত করা অনগ্রসরতা রোধ করার প্রধানতম পন্থা।

(গ) পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী করে গড়ে তোলা অনগ্রসরতা দূর করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

(ঘ) বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করা এবং অন্তর্জাত শৃঙ্খলার প্রয়োগ করা অনগ্রসরতা দূর করার আর একটি কার্যকরী উপায়।

(ঙ) শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে প্রক্ষোভমূলক সমতা বজায় থাকে তার আয়োজন করা অনগ্রসরতা দূর করার প্রধান উপায়।

(চ) শিক্ষার অগ্রগতি দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সেজন্য শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষণের আয়োজন রাখা বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

(ছ) কোন শারীরিক বা ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটি থাকলে অবিলম্বে তার চিকিৎসা করা এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার।

(জ) দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়লে

তার অপঠিত অংশ পূরণের জন্য তাকে বিশেষ ও স্বতন্ত্রভাবে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি শিশুর বিরাগ থাকলে সেই বিরাগের কারণ খুঁজে বার করা ও ঐ কারণটি দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার।

বিষয়মূলক অনগ্রসরতা ও ত্রুটি নির্ণায়ক অভীক্ষা
(Subject Backwardness and Diagnostic Test)

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার চিকিৎসা করতে হলে কোন বিশেষ বিষয়ের কোন্ কোন্ অংশে বা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্‌পদ সেটি প্রথমে খুঁজে বার করা দরকার। যেমন মনে করা যাক শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে কাঁচা হয় তাহলে দেখতে হবে যে সে ইংরাজীর কোন্ ক্ষেত্রটিতে কাঁচা। অর্থাৎ দেখতে হবে যে সে বানানে কাঁচা, না ব্যাকরণে কাঁচা, না বাক্যগঠনে কাঁচা, না শব্দাবলীর বিশেষ প্রয়োগবিধিতে কাঁচা ইত্যাদি। হয়তো ইংরাজীর এই বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে কতকগুলিতে সে ভালই কিন্তু আর কতকগুলিতে দুর্বল হওয়ার জন্য সে ইংরাজীতে সামগ্রিকভাবে ভাল ফল দেখাতে পারে না। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত চিকিৎসা করার জন্য সে বিষয়টির ঠিক কোন্‌ক্ষেত্রটিতে কাঁচা সেটি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রটির চিকিৎসা করা উচিত। নইলে শ্রম ও সময়ের অযথা অপচয় হবে।

এই সব বিশেষধর্মী ত্রুটি বা দুর্বলতা ধরার জন্য আজকাল এক নতুন ধরনের অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিকে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic Test) বলে। এই অভীক্ষার সাহায্যে কোন বিশেষ বিষয়ের ঠিক কোন্ অংশে বা কোন্ ক্ষেত্রটিতে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা তা ধরা যায় এবং সেই মত তার সংশোধন বা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য এই পন্থাতেই অনগ্রসরতার প্রকৃত স্বরূপটি চিকিৎসকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং সেটিকে সুনিশ্চিত এবং কার্যকরীভাবে দূর করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া একপ্রকার অপরিহার্য। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনগ্রসরতা দূর করার উপকরণরূপে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন হয়েছে। পঠন, গণিত, ইংরাজী, অঙ্ক প্রভৃতি যে সব

বিষয়গুলিতে অনগ্রসরতা বিশেষ করে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলির উপর সুপরীক্ষিত ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা গঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন :

1. What is educational backwardness ? How is it caused ?
2. Discuss the causes and remedies of educational backwardness.
3. What is diagnostic test ? How does it help the cure of educational backwardness ?